আগস্টের একরাত

সেলিনা হোসেন

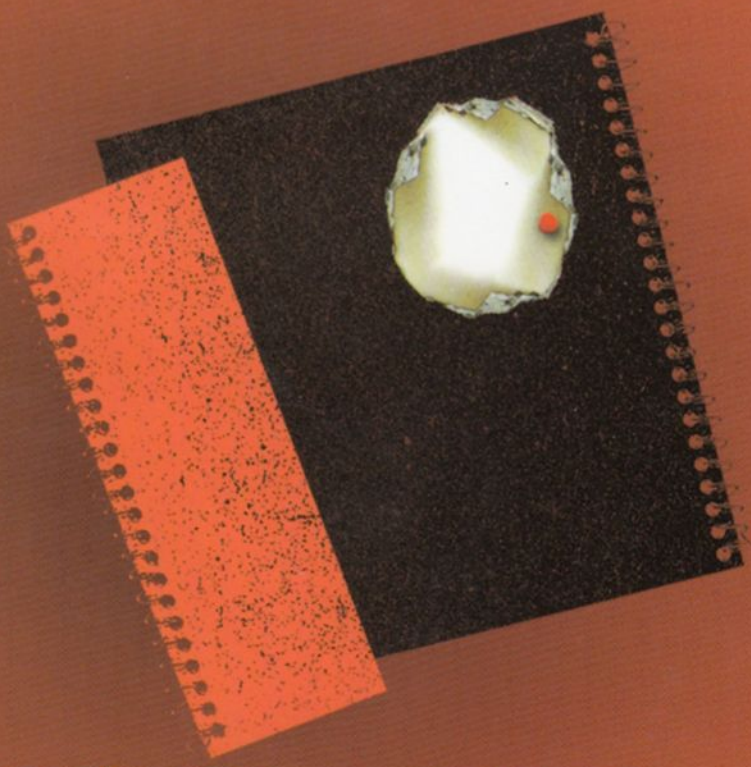

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগাস্টাস একবার • সেলিনা হোসেন

সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের ঘটনা শুধু ইতিহাসে সীমাবদ্ধ থাকে না। সেইসব ঘটনা ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে গভীর মানবিক উপাখ্যানে পরিণত হয়। 'আগস্টের একরাত' মানবিক উপাখ্যানের চিরায়ত গল্পকথা, যেখানে জীবন-মৃত্যুর পাশাপাশি মানুষের নৃশংসতাও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক গভীর সত্য।

'আগস্টের একরাত' বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের হত্যাকান্ডের পটভূমিতে রচিত হিউম্যান ট্রাজেডির উপাখ্যান। হত্যাকান্ডের বিচারে ৬১ জন সাক্ষী আদালতে জবানবন্দি দিয়েছিলেন। সাক্ষীদের এইসব জবানবন্দি কাহিনীর প্রয়োজনে উপন্যাসজুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে। লেখক একদিকে গল্প বানিয়েছেন অন্যদিকে জবানবন্দি উপস্থাপন করে ঘটনার বিবরণ সংযুক্ত করেছেন। ফলে উপন্যাসে সাধু ও চলিত ভাষার ব্যবহার অনিবার্য ছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায় ভাষার এই দুই ধারা উপন্যাসের আঙ্গিকে ভিন্নতা এনেছে।

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্ররা মৃত। ভিন্নধর্মী আঙ্গিকের কারণে উপন্যাসের পৃষ্ঠাজুড়ে তাদের উপস্থিতি ছিল। এই উপন্যাসে সময় উথালপাথাল চরিত্র। কাহিনী নির্মাণের প্রয়োজনে সময়ের ধারাবাহিকতার আগপিছ করা হয়েছে। এই আগপিছ উপন্যাসের আঙ্গিক-বিন্যাস।

শিল্পের সাধনা পাঠকের নান্দনিক বোধের তৃষ্ণা মেটায়। যে কোনো ধরণের প্রচেষ্টা শিল্পের সুষমাকে প্রাণবন্ত করে। লেখকের অন্তহীন চেষ্টা এই সুষমার প্রথম শর্ত।

প্রচ্ছদ ▪ ধ্রুব এষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিনা হোসেনের জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭। রাজশাহী শহর। ষাটের দশকের মধ্যভাগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে লেখালেখির সূচনা। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে।

রাজশাহীতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বিভাগীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ স্বর্ণপদক পান। ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক (১৯৬৯); বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০); আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮১); অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৪); শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার (১৯৯৬ ও ১৯৯৭); দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যে 'রামকৃষ্ণ জয়দয়াল হারমোনি অ্যাওয়ার্ডস', দিল্লি (২০০৬); জাতীয় পুরস্কার একুশে পদক (২০০৯); দিল্লির ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানিং এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থেকে 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০১০); ঢাকা লেডিস ক্লাব কর্তৃক লায়লা সামাদ স্বর্ণপদক (২০১১); রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা থেকে ডিলিট উপাধি (Honoris Causa) ২০১০; 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' উপন্যাসের জন্য আইআইপিএম, দিল্লি কর্তৃক রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার ২০১০। দিল্লির সাহিত্য আকাদেমী থেকে প্রেমচাঁদ ফেলোশিপ লাভ ২০০৯।

'নীল ময়ূরের যৌবন' ও 'যাপিত জীবন' উপন্যাস রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ পত্রে পাঠ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতায় গল্প পাঠ্য। 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', 'নীল ময়ূরের যৌবন' ও 'হাঙর নদী গ্রেনেড' আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ৩টি উপন্যাস নিয়ে এমফিল থিসিস সম্পন্ন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের ওকটন কমিউনিটি কলেজে ২০০৬ সালের দুই সেমিস্টারের পাঠ্য ছিল 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন ও জেন্ডার স্টাডিস ডিপার্টমেন্টে 'কালকেতু ও ফুল্লরা' উপন্যাস পাঠ্য।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, রুশ, মালে, ফরাসি, জাপানি, উর্দু, মালয়েলাম্, কোরিয়ান, ফিনিস, আরবি প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প এবং উপন্যাস। ইংরেজিতে অনূদিত গল্পের সংখ্যা ৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগস্টের একরাত

সেলিনা হোসেন

সময় প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুকথা

একটি রাতের গল্প লেখার জন্য কয়েক বছর ধরে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। তথ্য সংগ্রহের কাজও করছিলাম। কিন্তু লেখার কাজ শুরু করতে পারছিলাম না। আর এটা তো সত্যি, যে কোনো বিষয় লেখকের মনোজগতে তৈরি না হলে তাকে কাহিনীতে নিয়ে আসা কঠিন। তাই পনেরোই আগস্টের রাতকে পটভূমি করে উপন্যাস লেখার স্বপ্ন আমার ভেতরে ঘুণপোকার মতো কাটে।

তারপর একদিনের ঘটনা।

২০০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর একটি অনুষ্ঠানে আমার দেখা হয়েছিল এটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম সাহেবের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে আমি আর আনোয়ার এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তিনি কাছে এসে বললেন, আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে। একটি উপন্যাস লেখার জন্য কিছু উপাদান আমি আপনাকে দিতে চাই। আপনি সময় করে হাইকোর্টে আমার অফিসে আসবেন।

কিছুদিন পরে আমি আর আনোয়ার একদিন হাইকোর্টে এটর্নী জেনারেল সাহেবের অফিসে গেলাম। তিনি রুমে ছিলেন না। অফিসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, স্যার এজলাসে। আপনারা বসুন, উনি ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে আসবেন। অল্পক্ষণেই তিনি এলেন। আমাকে দেখে তিনি তাঁর লোককে বললেন, ওনার জন্য যে ফাইলটা রেখেছি ওটা নিয়ে এসো।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে একটি বড়সড় ফাইল নিয়ে এলো। তিনি বললেন, এই ফাইলটি হলো বঙ্গবন্ধু হত্যা মামালার সাক্ষীদের জবানবন্দি। ১৫ আগস্ট রাতে কি ঘটেছিল তার বিবরণ এখানে পাবেন।

ফাইলের উপরে লেখা আছে Additional Paper Books of Death

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Reference No. 30 of 1998 বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট In The Supreme Court of Bangladesh আপীল বিভাগ (Appellate Division)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯৫। ৬১ জন সাক্ষীর জবানবন্দি। পুরো ফাইল পড়তে যেমন সময় লেগেছে, তেমন চোখ জলে ভরেছে। পড়তে কষ্ট হয়েছে।

এটর্নী জেনারেল সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ যে আমি শেষ পর্যন্ত এই উপন্যাসটি লিখতে পেরেছি।

উপন্যাসের শেষের ইংরেজি গানটি সংগ্রহ করেছি বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খানের কাছ থেকে। এই গানের চারটি লাইন বঙ্গবন্ধুর ডায়রিতে লেখা ছিল। অনুমেয় যে এটি তাঁর একটি প্রিয় গান। প্রিয় বলেই গানটি তাঁর ডায়রির পাতায় নিজ হাতে লেখা ছিল। গানটি ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি প্রকাশের জন্য সময় প্রকাশনের ফরিদ আহমেদকে ধন্যবাদ।

সেলিনা হোসেন
১/১/২০১৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

শেখ হাসিনা শেখ রেহানা
অবিশ্বাস্য অমৃতের সরোবরে
প্রিয়জনের অবগাহন
মৃত্যুরও অধিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১.

রাতের শেষ প্রহর।

বাইরে প্রবল গুলির শব্দ। চৌচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে দিনের প্রথম প্রহর।

সেই শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় বঙ্গবন্ধুর। তিনি বিছানা থেকে নেমে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে জানালার পর্দা একটু সরিয়ে দেখেন বাড়ির সামনের রাস্তায় আর্মির গাড়ি এবং ট্যাংক। বাড়ির দক্ষিণ দিকেই রাস্তা আছে। বাকি তিন দিকেই অন্যদের বাড়ি। রাস্তার পাশে আছে ধানমন্ডি লেক। রাতের শেষ প্রহরে ওরা পুরা রাস্তা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বোঝা যায়।

তিনি একমুহূর্ত ভাবেন।

আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধুর করোটিতে ফুলের সুবাস ছড়াতে থাকে। করোটির কোষে কোষে সুবাসের তীব্রতা বাড়ে। তাঁর মনে হয় টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির শিউলি গাছটি অজস্র ফুলে ভরে আছে। এই মুহূর্তে ওই গাছে একটিও পাতা নেই। শুধুই ফুল। সাদা পাপড়ির সঙ্গে লেগে আছে কমলা রঙের বোঁটা। টুপটাপ ঝরছে শিউলি। টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির চারপাশে শুধু নয়, গ্রামজুড়ে ফুলের গন্ধ ম-ম করছে। এক মুহূর্ত আগে তাঁর শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। পর মুহূর্তে শ্বাস ফেললেন। শ্বাস টানতে গিয়ে টের পেলেন বুকের ভেতর শিউলি ফুলের গন্ধ। আশ্চর্য! এখন তো শিউলি ফোটার সময় নয়। তবে চারদিকে এত গন্ধ কেন?

ডাকলেন, রেণু।

এই ডাকের উত্তর কোথাও থেকে আসে না।

রেণু।

রেণু স্তব্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর পৃথিবী তোলপাড় করছে। পাশে দাঁড়িয়ে যে মানুষটি তাঁকে ডাকছেন তার উত্তর দেয়ার জন্য ভাষা খুঁজছেন রেণ। তিনি কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। প্রতিটি গুলির শব্দ শিরা-উপশিরায় ঝনঝন শব্দ তুলছে। কোন ছোটবেলায় মুখে ভাষা ফুটেছিল তা ভুলে গেলেন তিনি। কি ভাষা শিখেছিলেন তাও মনে পড়ছে না।

বঙ্গবন্ধু আবার ডাকেন রেণু।

তিনি সাড়া দেন না। নিজেকেই বলেন, এই তো আমি তোমার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে আছি।

কথা বলছ না যে?

সেই তিন বছর বয়স থেকে আমি তো তোমার সঙ্গেই কথা বলছি। অনেক কথা, অনেক। সেজন্য এখন আমি যা কিছু বলছি তা তুমি শুনতে পাচ্ছ না। কারণ, আমাদের চারদিকে শুধুই গুলির শব্দ। আমরা আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

তখন বেজে ওঠে টেলিফোন। সেই শব্দে দুজনে চমকে ওঠেন। বঙ্গবন্ধু বাম হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার ওঠান।

হ্যালো।

আমি সেরনিয়াবাত। আমার বাসা দুস্কৃতিকারীরা আক্রমন করেছে। বাড়ির চারদিক থেকে গোলাগুলির শব্দ পাচ্ছি। আর্মির গাড়ি এসে থেমেছে বাড়ির গেইটে।

লাইন কেটে যায়।

তিনি ফোন করেন বাড়ির নিচতলায় রিসেপশনিস্ট মহিতুল ইসলামকে। ফোন ধরে টেলিফোন মিস্ত্রি আবদুল মতিন।

হ্যালো।

স্যার, আমি মতিন।

মহিতুল কোথায়?

তার ঘরে স্যার। ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ডাক।

আবদুল মতিন দ্রুত গিয়ে মহিতুলকে ঘুম থেকে ওঠানোর জন্য গায়ে ধাক্কা দেয়। তিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেন, কি হয়েছে?

প্রেসিডেন্ট আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

মহিতুল টেলিফোন ধরে।

স্যার, আমি মহিতুল।

জলদ গম্ভীর স্বরে তিনি দ্রুতকণ্ঠে বলেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুস্কৃতিকারীরা আক্রমন করেছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগা।

কথা বলে তিনি রিসিভার রেখে দেন।

রেণুর উদ্বেগ কণ্ঠ ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু কি বলেছেন তা তিনি শুনেছেন। তারপরও জিজ্ঞেস করেন, পুলিশ সময়মতো পৌঁছাতে পারবে তো?

বঙ্গবন্ধু নিশ্চুপ থাকেন। ভাবেন, ঠিকমতো পৌঁছালে বাড়িটা ছোটখাটো রণক্ষেত্র হয়ে না যায়। আর কি করবেন তিনি? দেখা দরকার মহিতুল পুলিশ লাইনে কথা বলতে পেরেছে কিনা। তিনি একমুহূর্ত ভাবেন। তারপর দরজা খোলার জন্য সিটকিনিতে হাত দেন।

রেণু আঁতকে উঠে কাছে এসে বলেন, দরজা খুলছো কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে যাব।

না। না, যাবে না। এত গুলির মধ্যে বের হওয়া ঠিক হবে না।

যেতে আমাকে হবেই। কি হচ্ছে দেখব না?

না। দোহাই লাগে বের হবে না।

ওরা যদি আমাকে মারতেই আসে তাহলে এই ঘরের দরজা ভেঙেই ওরা আমাকে মারবে। তার আগে আমাকে জানতে হবে ওরা কি চায়। কেন এসেছে।

রেণু শব্দ করে কেঁদে ওঠেন।

বঙ্গবন্ধু মৃদু স্বরে বলেন, চোখের জল মোছ রেণু। কত অজস্রবারইতো নিজের আঁচলে এই জল মুছেছো। আজও মোছ। চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে আমরাতো এত বছর একসঙ্গে কাটালাম। আমাদের পথ তো ফুলে বিছানো ছিল না রেণু। আমরা কাঁটা পায়ে মাড়িয়েছি। ধুলোয় হেঁটেছি। আবার পথের ধারে ফুল আর জোনাকির আলোও দেখেছি।

রেণুর কান্না থামে না।

তিনি শুনতে পান রেণু ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। তিনি রেণুর মাথায় হাত রাখেন। কতদিন কতবার এই মাথায় হাত রেখেছেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু এই মুহূর্তের মতো কোনোদিন লাগেনি। কান্নায় রেণুর শরীর স্পন্দিত হচ্ছে। ভয়ে-আতঙ্কে কাঁপছে থরথর করে। কি হচ্ছে বাইরে তা তাঁরা জানতে পারছেন না। মাথায় হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে যায় বঙ্গবন্ধুর শরীর। মুহূর্তে তিনি ভাবেন, আর কি রেণুর মাথায় হাত রাখার সময় পাবেন? একটু আগে তিনি তাঁকে চোখ মুছতে বলেছেন। আর বলবেন না বলে ভাবলেন।

তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে যান তিনি। পরনে লুঙ্গি আর স্যান্ডো গেঞ্জি। রেণু ভাবলেন, নিচে গিয়ে কার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! কারা এসেছে তাতো বোঝা যাচ্ছে না। তাঁকে পাঞ্জাবি পাঠানো দরকার। চশমাও লাগবে। কিছু পড়তে হলে চশমা ছাড়াতো পড়তে পারবেন না। রেণু আলনা থেকে পাঞ্জাবি হাতে নেন, টেবিলের উপর থেকে চশমা। কাজটি করতে গিয়ে বুঝলেন চোখের জল মুছে ফেলা কঠিন। চোখ ভরা জল নিয়ে সেলিমকে ডাকলেন। বললেন, পাঞ্জাবি আর চশমা দিয়ে আয়। তুই দাঁড়িয়ে থেকে পরতে বলবি।

বলতে হবে না আম্মা। স্যার, পাঞ্জাবি আর চশমা পরে ফেলবেন।

রেণু সেলিমকে পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এখন বাংলা কি মাস রে সেলিম? আমার কিছু মনে পড়ছেনা। আমি মনে করতে পারছি না।

শ্রাবণ মাস আম্মা। মাসের কথা জিজ্ঞেস করায় সেলিম অবাক হয়। কিন্তু আম্মাকে জিজ্ঞেস করার সাহস নেই। ও এই বাড়ির কাজের ছেলে।

রেণু ভাবলেন, শ্রাবণ বৃষ্টির মাস। টুঙ্গিপাড়ায় থাকতে বৃষ্টিতে ভিজতেন।

রেণু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। একবার ভাবেন নিচে যাবেন। পরক্ষণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবেন, না থাক। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে স্বামীর অপেক্ষা করেন।

তখন অদৃশ্যে ভেসে বেড়ায় দুজনের কণ্ঠস্বর।

রেণু তুমি বলেছিলে, তুমি আমার সঙ্গে অনেক কথা বলেছ। সেই তিন বছর বয়স থেকে।

বলেছিতো। আমার জীবনতো তোমার সঙ্গে তখন থেকে শুরু হয়েছে।

গভীর নিশ্বাস ফেলে বঙ্গবন্ধু বলেন, না তুমি আমার সঙ্গে অনেক কথা বলতে পারনি। আমি তো বেশিরভাগ সময় জেলে ছিলাম। যখন আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেত তখন তুমি কেঁদে বুক ভাসাতে। এখন মনে হয় তোমার হাসি মুখের চেয়ে জলভরা চোখই আমি বেশি দেখেছি। পার্টির কাজে আমাকে ঘুরতে হয়েছে নানা জায়গায়। বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থেকেছি। মফস্বলে, গ্রামে গঞ্জে–মানুষের কাছে–দুঃখী মানুষ। তারা আমাকে ভালোবাসা দিয়েছে। কাছে টেনেছে। রেণু এই দেশের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি তো তোমাকে বলেছি, আমার সাধারণ মানুষের কাছে বারবার বলেছি, আমি বন্দুকের নলের ক্ষমতায় বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি ক্ষমতার উৎস বাংলার জনগণ। এটাই আমার রাজনীতির দর্শন। আমি এ দেশের সাতকোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে চাই না। আমি মানুষের ভালোবাসায় ডুবে থাকতে চাই। রেণু তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ?

রেণুর কণ্ঠ শোনা যায় না। বুকের ভেতর শব্দরাজি গড়াগড়ি করে। শব্দগুলো বুকের পাটাতনে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু বাইরে আসে না।

স্তব্ধ হয়ে যায় সময়। এই বাড়িতে এখন এক একটি মুহূর্ত অনন্তকাল। দুজন মানুষ এখন তেমন সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।

রেণু দরজায় দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেন ঘুমিয়ে আছে রাসেল। কোল বালিশটা বুকে জড়িয়ে নিয়েছে, যেন ওটা ওর মায়ের বুক। এই বুকে পরম মমতায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকা যায়। এই বাড়িতে রাসেলের জন্ম; ভাবতে ভাবতে রেণু সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ান। এই বাড়ির যে ঘরটিতে হাসিনা থাকতো সেদিন সেই ঘরটি আঁতুড়ঘর হয়েছিল। ওর জন্ম হয়েছিল বেশ রাতে। বছর দশেক আগের ঘটনা মাত্র। তিনি সিঁড়ির উপরে এক পা দিয়ে আবার থামলেন। একটু একটু করে অনেকদিন ধরে এই সিঁড়িটি করা হয়েছে। প্লাস্টার করার আগে এবড়ো-থেবড়ো ছিল এই সিঁড়ি। অনেক সময় লেগেছিল প্লাস্টারের কাজটি শেষ করতে। তিনি আবার ঘরের ভেতরে ফিরে আসেন। দুজন মানুষের নিশ্বাস দ্রুত ওঠানামা শেষে রাতের প্রহরকে ঘনীভূত করে রাখে।

আমার মনে হয় ওরা তোমাকে আর কোথাও থাকতে দেবে না। বাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরেও না। বাইরেও না। তোমাকে ওরা অন্য জগতে নিয়ে যাবে।

রেণু ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কাঁদতেই থাকেন। কখনো গুলির শব্দ ছাপিয়ে কান্নার শব্দ প্রবল হয়। কখনো গুলির শব্দ। রেণু দরজায় মাথা ঠেকিয়ে ডাইনিং স্পেস এবং পাশের করিডোরের দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয় তাঁর চোখের সামনে সিঁড়িটা প্রবল ঘূর্ণির মতো টলছে, যেন ভেঙে পড়বে, নাকি উড়ে যাবে– নাকি অন্যকিছুর জন্য অপেক্ষায় আছে এই সিঁড়ি? রেণু কিছু একটা ধরার জন্য শূন্যে হাত বাড়ান। হাত ফিরে আসে নিজের বুকে। দেখেন যে বুকে রাসেল ঘুমায় সেখানে রাসেল নেই। কোথায় গেল ও? কোথায় খুঁজবেন ওকে? এই বাড়ির অন্য কোনো ঘরে কিংবা আঙ্গিনায় কিংবা বাগানে বা ছাদে? হায় আল্লাহ, কি হচ্ছে চারদিকে? নিচ থেকে উঠে আসছেন না কেন তিনি? কত অনন্তকাল তাঁর জন্য আমার অপেক্ষা করতে হবে?

তুমি কি আমাকে কিছু বলছো রেণু?

রেণু বুঝতে পারেন তিনি কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

সাত বছর বয়সে তুমি যখন আমার মায়ের কাছে এলে তখন দেখেছি কোঁচড় ভরে শিউলি কুড়োতে তুমি খুব ভালোবাসতে রেণু।

রেণু কোনো কথাই বলতে পারছেন না।

ঝাঁক ঝাঁক গুলি বৃষ্টির মতো পড়ছে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের ছয়শ সাতাত্তর নম্বর বাড়ির ওপরে।

নত হয়ে আসে আকাশ। আসে প্রায় পৃথিবীর কাছাকাছি। নক্ষত্ররাজি আলো বিকিরণ করতে পারছে না। মুখ লুকিয়েছে অদৃশ্যলোকে। বাতাস নেই কোথাও। সবটুকু মমতায় আগলে রাখতে চায় হিউম্যান ট্র্যাজেডির অনন্ত ক্ষণ। যেন একজন চার্লস ডিকেন্স ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিতে লেখা তাঁর উপন্যাস থেকে বলে যাচ্ছেন, ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অব টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওর্স্ট অব টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য এজ অব উইসডম, ইট ওয়াজ দ্য এজ অব ফুলিশনেস, ইট ওয়াজ দ্য এপক অব বিলিফ, ইট ওয়াজ দ্য এপক অব ইনক্রিডুলিটি, ইট ওয়াজ দ্য সিজন অব লাইট, ইট ওয়াজ দ্য সিজন অব ডার্কনেস..... ইট ওয়াজ দ্য স্প্রিং অব হোপ, ইট ওয়াজ দ্য উইন্টার অব ডিসপেয়ার, উই হ্যাড এভরিথিং বিফোর আস, উই হ্যাড নাথিং বিফোর আস, উই ওয়ার অল গোয়িং ডিরেক্ট টু হেভেন, উই ওয়ার অল গোইং ডিরেক্ট দ্য আদার ওয়ে.....

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শূন্যতা হা-হা করে। শুধু রাতের শেষ প্রহরের অন্ধকারকে মুছে দিয়ে জেগে থাকে টুঙ্গিপাড়ার আলো। যে আলো পঞ্চান্ন বছর ধরে জড়িয়ে রেখেছিল তাঁর প্রিয় ভূমিপুত্রকে। তাই গোটা দেশ অন্ধকার হয়ে থাকলে শুধু সেখানেই জ্বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো। সময় এখন মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। এই সময়কে আবার ফিনিক্সের মতো পাখা গজিয়ে উঠতে হবে। উঠবেই সময়।

যে সময়ের মানুষেরা বলবে আমাদের সৌভাগ্য যে ইতিহাসের নিকৃষ্টতম হত্যাকাণ্ডের সময় আমরা জন্মগ্রহণ করিনি। সেই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের কথা আমাদের শুনতে হয়নি। আমরা সেইসব হিংস্র দানবদের চেহারা দেখিনি যারা শিশুকে খুন করতে ছাড়েনি। আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা একটি নিকৃষ্টতম সময়ের সাক্ষী হইনি।

আমরা সেদিনের মেঘরাজিকে জিজ্ঞেস করব না যে, এমন শূন্যতা কেন তোমাদের বুকে? আমরা কোটি কণ্ঠের উদাত্ত সুরে বলব : বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু/বাংলার ফল/পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান॥ বাংলার ঘর, বাংলার হাট/বাংলার বন, বাংলার মাঠ/পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান/বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হইক হে ভগবান॥ বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন/এক হউক, এক হউক এক হউক হে ভগবান॥

একই সঙ্গে আমাদের বুকে আছে ধ্রুবজ্যোতির অবিনাশী কণ্ঠের উচ্চারণ: ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময়ও বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলা আমার দেশ।

তখন অনাগত কালের মানুষেরা ভাববে, সে এক আশ্চর্য জ্যোৎস্না রাত ছিল আমাদের জীবনে– আমরা মৃত্যু দেখিনি, জীবন দেখেছি শুধু। জীবনের ছায়া আমাদের জীবনে উজ্জ্বল স্মৃতির বিস্তার ঘটিয়েছিল। কখনোই তা বিস্মৃত হবার নয়। আকাশে মেঘ ছিল। ঘরে বেড়াল ছিল। বাতাসে ধুলো ছিল। ফুলের সুবাসের জন্য শ্বাস টেনে দেখবে আশ্চর্য সৌরভ চারদিকে।

ঘরের বেড়ালটি খাটের নিচে থেকে বেরিয়ে আসে। ডাকে, মিউ। চোখে ধূসর ছায়া নিয়ে সামনে তাকায়। দেখতে পায় পুরো বাড়ি খালি। রক্ত এবং মৃত্যুতে মাখামাখি ঘরদোর তো কারও গেরস্থি হতে পারে না।

বেড়ালটি নিচে নেমে আসে। দেখে বাগানে শুকনো পাতা গড়ায়। ক্ষুদে পোকারা চিৎ হয়ে আছে। কোথাও শব্দ নাই।

গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলছেন, আমি প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী হওয়ার জন্য রাজনীতি করিনি। আপনারা দেখেছেন, একদিকে ছিল আমার প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসন, অন্যদিকে ছিল ফাঁসির মঞ্চ। আমি বাংলার জনগণকে মাথা নত করতে দিতে পারি না বলেই ফাঁসির মঞ্চ বেছে নিয়েছিলাম। আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো নৌকায় কিংবা অন্য কোনো যানবাহনে। আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। এই মাটি আর মানুষকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা আমার সবচেয়ে বড় কাজ। তাই গলা উঁচু করে বলতে চাই, শুধু সামরিক বাহিনী দিয়ে দেশ রক্ষা হয় না। দেশরক্ষা হয় জনগণকে দিয়ে।

এই গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁকে অনেকবার বক্তৃতা করতে হয়েছে। বাড়ির সামনের রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকতো শত শত মানুষ। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতো। আজ তিনি একা।

তখন গুলির শব্দ প্রকম্পিত করে চারদিক। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম দিগন্ত রেখায় উড়ে যায় বারুদের ধোঁয়া।

তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন এতসব কিছুর মাঝে।

এখন আমরা সৌভাগ্যবান যে জেগে-ওঠা সময়ের সন্তান আমরা। দেখতে পাই তাঁর নামের ওপর লক্ষ-কোটি শিউলি ফুল ঝরিয়ে দিচ্ছে শরৎ ঋতু।

আমরা সৌভাগ্যবান যে বর্ষার বৃষ্টির মতো দুঃখী মানুষের ভালোবাসা স্মরণের স্নিগ্ধতায় অবিরাম স্নাত করে তাঁকে।

আমরা সৌভাগ্যবান যে বসন্তের পুষ্পরাজির মতো প্রস্ফুটিত হয় তাঁকে নিয়ে রচিত শব্দমালা।

আমরা সৌভাগ্যবান যে তাঁর দ্রোহের শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়তে পারি গ্রীষ্মের বৈশাখী ঝড়ের মতো।

আমরা সৌভাগ্যবান যে কুয়াশা মাথায় নিয়ে শীতের দিনগুলোতে আগুন জ্বালানোর ধূম পড়ে বাংলার কেটে নেয়া ধানের ক্ষেতে।

আমরা সৌভাগ্যবান যে তাঁর করতলে ঝরে পড়ে হেমন্তের শস্যদানা। তাঁর নামে পালিত হয় নবান্নের উৎসব।

আমরা সৌভাগ্যবান যে তাঁর নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অস্তিত্বের মানচিত্র আঁকতে ভুল করি না। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন দেখতে পাই রক্তের অক্ষরে বুকের ওপর লেখা–আমি বাঙালি। বাংলা আমার ভাষা।

২.

বঙ্গবন্ধু মহিতুল, মহিতুল ডেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছেন। আমি মহিতুল বলছি।

আজকের এই ঘটনার সত্যাসত্য জন সমক্ষে তুলে ধরার জন্য আমি বেঁচে থাকব কিনা জানিনা। তবে বেঁচে থাকলে কোনো একদিন এই সত্য সবার সামনে প্রকাশ করব। মনে মনে এই অঙ্গীকার করছিলাম। যখন সুযোগ আসে প্রথমে আমি থানায় গিয়ে এজাহার দাখিল করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ আমার সামনে সুযোগ এসেছে সাক্ষী দেয়ার মাধ্যমে ঘটনার বিবরণ তুলে ধরার। আমি এখন জেলা ও দায়রা জজ আদালতের সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

1. A.F.M. Mohitul Islam
P. W. -1
জবানবন্দি লিখিবার ধারা

আন্দাজি- ৪৫ বয়স্ক, আঃ ফঃ মঃ মহিতুল ইসলাম- এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ৬/৭ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম- এ. এফ. এম মহিতুল ইসলাম, আমার পিতার নাম- মরহুম এ. ওয়াই. এম. নূরুল ইসলাম, জেলা- যশোহর, আমি জাতিতে মুসলিম, পুলিশ স্টেশন- ঝিকরগাছা, আমার বর্তমান বাসস্থান- বিল্ডিং নং-১, ফ্লাট নং- ২৬, মিরপুর- ১৪, জেলা- ঢাকা।

আমি এই মামলার এজাহারকারী। গত ২-১০-৯৬ ইং তারিখে আমি এই মামলার এজাহার দিয়াছি। বর্তমানে আমি সরকারি চাকুরি করি। আমি ১৯৭২ সনের ১৩ই ডিসেম্বর সরকারি চাকুরিতে যোগদান করিয়া প্রথমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে অফিস সহকারি হিসাবে যোগদান করি। ১৯৭৪ সনে Resident PA হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং রোডে ৬৭৭ নং বাড়িতে কাজ করি। আমরা তাঁহার বাড়িতে ৪ জন রিসেপশনিস্ট ছিলাম। পর্যায়ক্রমে আমাদের ডিউটি করিতে হইত। এই মামলার ঘটনা সংঘটিত হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে ভোর ৪:৩০-৫টার মধ্যে। ১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে রাত ৮টা হইতে পরের দিন সকাল ৮টা পর্যন্ত আমার ডিউটি ছিল। আমি ঐ দিন যথাসময়ে অর্থাৎ রাত ৮টায় ডিউটিতে আসি। আমি ঐ বাড়িতে ডিউটিতে আসার পর ঐ বাড়ির টেলিফোন মিস্ত্রি আব্দুল মতিন, ঐ বাড়ির গরুর রাখাল আবদুল আজিজ ও একজন কাজের বেটিকে নিচতলায় দেখি। উপর তলায়/দোতলায় কাজের ছেলে আবদুল ওরফে সেলিম রহমান ওরফে আবদুর রহমান ছিল। তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর ৩ ছেলে যথাক্রমে শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল এবং শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল, শেখ জামালের স্ত্রী রোজী জামাল ও বেগম মুজিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। তাছাড়া ঐ বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরও ছিলেন। রাতে ঐ বাড়ির নিরাপত্তা ডিউটিতে পুলিশের ডি.এস.পি. জনাব নূরুল ইসলাম খান, Inspector খোরশেদ আলম, S.B-এর একজন অফিসার ও পুলিশের অন্যান্য পদের লোক ছিল। পুলিশ ছাড়া নিরাপত্তা ডিউটিতে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য ছিল। রাত আনুমানিক ৮-৯টার মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাহির হইতে বাড়িতে (ঐ বাড়িতে) আসেন। সঙ্গে সিকিউরিটি ও অন্যান্যরা রাষ্ট্রপতিকে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। তাহারা চলিয়া যাইবার পর গেটে পাহারারত আর্মি এবং পুলিশের সাথে আমি গল্প করিতে ছিলাম। রাত ১টার দিকে আমাদের জন্য নির্ধারিত বিছানায় শুইতে গেলাম। কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম খেয়াল নাই। হঠাৎ টেলিফোন মিস্ত্রি আবদুল মতিন আমাকে ধাক্কা দিয়া ঘুম হইতে উঠায় এবং বলেন রাষ্ট্রপতি আপনাকে টেলিফোনে ডাকিতেছেন। তখন ভোর আনুমানিক ৪:৩০-৫টা হইবে। চারদিকে ফর্সা হইয়া গিয়াছে। তখন ঐ বাড়ির চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোও জ্বলিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি গিয়া টেলিফোন ধরি। রাষ্ট্রপতি উপর/দোতলা হইতে টেলিফোনে বলিলেন, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করিয়াছে। জলদি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগা। আমি পুলিশ কন্ট্রোল রুমে টেলিফোন লাগানোর চেষ্টা করি, কিন্তু লাইন পাইতেছিলাম না। তারপর গণভবন এক্সচেঞ্জে লাইন লাগানোর চেষ্টা করি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু দোতলা হইতে নামিয়া নিচে আমার অফিস কক্ষে আসেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে লাগাতে বললাম লাগালি না? আমি তখন বলি, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে চেষ্টা করিতেছি। পাইতেছি না। আমি গণভবন এক্সচেঞ্জে ধরিয়াছি, কিন্তু কথার কোনো উত্তর দিতেছে না। আমি তখন Hello-Hello বলিয়া চিৎকার করিতেছিলাম, তখন বঙ্গবন্ধু আমার হাত হইতে টেলিফোনের রিসিভার নেন এবং বলেন– আমি প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব বলছি, ঠিক তখনই এক ঝাঁক গুলি আমাদের অফিস কক্ষের দক্ষিণ দিকের জানালার গ্লাস ভাঙ্গিয়া অফিস কক্ষের দেওয়ালে লাগে।

অন্য টেলিফোনে চিফ সিকিউরিটি অফিসার মি. মহিউদ্দিন টেলিফোন করেন। আমি ঐ টেলিফোন ধরি। তখন জানালার একটি ভাঙ্গা গ্লাসে আমার ডান হাতের কনুই কাটে। ফলে কনুই হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। এই সময় দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়া অনর্গল গুলি আসিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু আমার টেবিলের পাশে শুইয়া পড়েন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হাত ধরিয়া টানিয়া শুইতে বলেন। আমিও শুইয়া পড়ি। কিছুক্ষণ পর গুলি বন্ধ হইয়া যায়। তখন বঙ্গবন্ধু উঠিয়া দাঁড়ান। আমিও উঠিয়া পড়ি। কাজের ছেলে আবদুল ওরফে সেলিম উপর থেকে (দোতলা) বঙ্গবন্ধুর পাঞ্জাবি ও চশমা নিয়া আসে। বঙ্গবন্ধু আমার কক্ষে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবি ও চশমা পরিলেন। তারপর বারান্দায় আসিয়া বলিলেন, আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি, এত গুলি হইতেছে তোমরা কি কর।

এই বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

৩.

উপরে ওঠার জন্য সিঁড়িতে পা রাখলেন বঙ্গবন্ধু। পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ ঝলক বয়ে গেল। তিনি একমুহূর্ত দাঁড়ালেন। ভাবলেন, কেন এমন লাগছে? কত বছর ধরে কত অসংখ্যবার এই সিঁড়িতে ওঠানামা করেছেন। কখনও তো এমন হয়নি? তবে আজ কেন?

তিনি একটি একটি করে সিঁড়ি ভাঙলেন। করিডোর পার হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন রেণু কাঁদছেন। পরক্ষণে মনে হলো রেণুকে বেশিক্ষণ কাঁদতে হবে না। কত ধরণের সংকটের মধ্য দিয়ে রেণু জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু নিজের সাহস আর বুদ্ধি তার কখনো হারায়নি। আজও হারাবে না। অল্পক্ষণেই রেণু পাহাড়ের মতো অটল হয়ে উঠবে। তাঁকে তো উঠতেই হবে।

তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। দেখতে পান রাসেলের ঘুম ভেঙে গেছে।

ও মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করছে, মা কাঁদছেন কেন? মা কি হয়েছে?

মায়ের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে ও আবার জিজ্ঞেস করে, বড় আপু ছোট আপু বাড়িতে নাই সেজন্য আপনি কাঁদছেন মা? বড় আপু ছোট আপু না থাকলে কি হবে, আমিতো আছি। আপনার সোনামানিক।

রেণু ছেলের কথায় চমকে ওর দিকে তাকান, এই সময়ে মেয়েরা দেশে নাই। ওরা টুঙ্গিপাড়ায় নাই। ওরা এই বাড়িতে নাই।

রেণু রাসেলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ওর মাথার ওপর নিজের থুতনি রাখেন। মুহূর্ত মাত্র, আবার সোজা হয় মাথা।

রেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার মেয়েরা আজকে এই বাড়িতে নাই। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর যে আজকে ওরা আমাদের কাছে নাই। মাত্র পনেরো দিন আগে ওরা বিদেশে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু দু'হাতে মুখ ঢেকে বিড়বিড় করলেন, আমার মেয়েরা–মেয়েরা–ওরা এখানে নাই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী।

তখন রেণু আবার চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন। একসময় কান্না ফুরোয়। আঁচলে চোখ মোছেন রেণু। চোখ তুলে বলেন, তুমি আপা দুলাভাইয়ের বাসায় ফোন করো। না জানি তাঁরা কেমন আছেন? আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না।

তিনি মাথা নাড়লেন। বললেন, ফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছে না।

তারপরও বঙ্গবন্ধু রিসিভার উঠিয়ে নাম্বার ডায়াল করলেন। কোনো সাড়া নেই।

তখন প্রবল গুলির শব্দ ঝনঝন করে চারদিকে।

তিনি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, সেরনিয়াবাত শুধু তাঁর সেজো বোনের স্বামী নন, তাঁর রাজনীতির বন্ধুও। তিনি সত্তরের নির্বাচনে এম. এন. এ. হয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে এক আশ্চর্য বিজয় ঘটিয়েছিল এ দেশবাসী। বাঙালির ওই বিজয় পাকিস্তান সরকারের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আরো বড় করে বলা যায় যে, পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-আচরণের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে যে আন্দোলন করেছিলেন এ দেশের মানুষ তার পক্ষে রায় দেয়ার সুযোগ পেয়েছিল। আমরা গণতান্ত্রিক উপায়ে বাঙালির অধিকার আদায়ের লড়াই করেছিলাম।

সেই বিজয়ের ফলাফলের পরে তিনি মিষ্টি নিয়ে এসেছিলেন বাসায়। বলেছিলেন, এ এক ঐতিহাসিক বিজয়। আপনার জীবন ধন্য। মিয়াভাই আমি খুব খুশি হয়েছি।

এইরকম খুশি হওয়ার কথা তিনি আর একবার বলেছিলেন সাতচল্লিশ সালে। তখন তিনি বিএ পরীক্ষার আগে বেকার হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছিলেন। উঠেছিলেন তাঁর বাসায়। আবদুর রব সেরনিয়াবাত কলকাতার পার্ক সার্কাসে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু আবার ভাবলেন, ওই বাড়িতে বাস করা ছিল তাঁর জীবনের আর একটি অধ্যায়। হোস্টেলে থাকলে তো রেণু তাঁর কাছে আসতে পারতেন না। কলকাতা শহর দেখা হতো না রেণুর। তিনি রেণুকে কলকাতার নানাকিছু দেখিয়েছিলেন। তিনি সেরনিয়াবাতের বাড়িতে ওঠার কিছুদিন পরে রেণু গিয়েছিলেন কলকাতায়। মৃদু হেসে তাঁকে বলেছিলেন, আমি তোমার কাছে থাকলে তুমি পরীক্ষায় পাস করবে। তোমার আর বছর নষ্ট হবে না। তুমি পড়াশোনার চেয়ে রাজনীতি বেশি করো। রাজনীতি করে বছর নষ্ট করো। আমার মন খারাপ হয়। আমি তোমার কাছে কিছু দিন থাকবো, যেন পরীক্ষাটা ঠিকমতো দিতে পারো।

রেণুর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, কি জ্বলজ্বল করছে রেণুর চোখ। নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ভেবেছিলাম যে, ও আমার যোগ্য সঙ্গী। আমাকে বোঝে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তৈরি হয়ে ওঠা ওর স্বপ্ন। সে বছর আমি বিএ পাস করেছিলাম। সেরনিয়াবাত এক প্যাকেট মিষ্টি এনে হাতে দিয়ে বলেছিলেন, মিয়াভাই আমি খুব খুশি হয়েছি।

রাসেল বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, আব্বা মা এত কাঁদছেন কেন? আব্বা মাকে কাঁদতে মানা করেন।

তোমার মাকে কাঁদতে দাও বাবা। আজ আর তাকে কাঁদতে নিষেধ করবো না। তিনি তাঁর স্মৃতিকে স্মরণ করে কাঁদছেন। তাঁর কান্না আমিও শুনতে চাই। আমিও স্মৃতি স্মরণ করতে চাই। আমরা জানিনা ওই বাড়িতে এখন কি হচ্ছে, জানি না ওরা কেমন আছে।

রাসেল বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে, আব্বা আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

বঙ্গবন্ধু রাসেলের হাত নিজের মুঠিতে চেপে ধরে বলেন, আমি বুঝতে পারছি তোমার মা বুক উজাড় করে কাঁদছেন। কখনো কান্না মানুষকে শান্তি দেয় রে বাবা।

আব্বা আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। আপনি আমার দিকে তাকান। বাইরে এত শব্দ কেন আব্বা? কিসের শব্দ? গুলির শব্দ? কারা এত গুলি করছে আব্বা? আপনি ওদেরকে গুলি বন্ধ করতে বলেন।

এই বাড়িতে সময় এখন স্তব্ধ

AMARBOI.COM

৪.

সেই রাতের ঘটনার বিবরণ কখনো দিতে পারবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন আমি ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

25. Naik Md. Yeasin (Rtd.)
P. W. -25

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৪৫ বয়স্ক নায়েক মোঃ ইয়াসিন (অবঃ)র জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৯/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– নায়েক মোঃ ইয়াসিন (অবঃ), আমার পিতার নাম– মরহুম মোঃ মনছুর আলী ব্যাপারী, গ্রাম– গুণী দূর্গাপুর। আমার বর্তমান বাসস্থান– থানা ফরিদগঞ্জ, জেলা– চাঁদপুর।

আমি একজন আর্মির অবসরপ্রাপ্ত নায়েক। ১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে আমি টু-ফিল্ড আর্টিলারির একজন সৈনিক ছিলাম। তখন আমার পোস্টিং ঢাকা সেনানিবাসে ছিল। আমাদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর খন্দকার আবদুর রশিদ। আমাদের ৪টি ব্যাটারির মধ্যে কিউবেক ব্যাটারিতে ছিলাম।

আমাদের ব্যাটারি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন জোবায়ের সিদ্দিকী। H.Q. ব্যাটারিতে ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তফা, পাপা ব্যাটারিতে ছিলেন মেজর মুহিউদ্দিন, রোমিও ব্যাটারির কমান্ডারের নাম স্মরণ নাই।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট রোজ বৃহস্পতিবার আমাদের নাইট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ছিল। ঐ দিন সন্ধ্যায় আমরা নিজ মেজর খন্দকার আবদুর রশিদের নির্দেশে MT পার্কে ফল-ইন হই।

আমাদের সি. ও. খন্দকার আবদুর রশিদ সাহেব প্যারেড মার্চের নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুসারে আমাদেরকে বিভিন্ন সেকশনে ভাগ করা হয়। আমার সেকশনের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন মোস্তফা সাহেব। উনার অধীনে আমরা মার্চ করা শুরু করি। মার্চ করিয়া নিউ এয়ারপোর্টে পৌঁছি। আমাদের প্রত্যেকের কাছে নিজ নিজ হাতিয়ার ছিল। আমার কাছে ছিল একটা S. L. R.। ঐ সময় নাইট মার্চে এমিউনিশন নিবার নিয়ম ছিল না। ঐ দিন মার্চে এমিউনেশন নিই নাই। অনুমান ৩/৩-৩০ টার দিকে ক্যাপ্টেন মোস্তফা সাহেবের নির্দেশে ফল-ইন হই। অতঃপর তাহার নির্দেশে মার্চ করিয়া একসময় ট্যাংক বাহিনীর একটি খোলামেলা জায়গায় পৌঁছি। সেখানে ট্যাংক বাহিনীর সৈনিকদের দেখিতে পাই।

আমাদেরকে সেখানে ৬টি সেকশনে ভাগ করা হয়। আমাদের সি. ও. মেজর খন্দকার আবদুর রশীদ এবং ট্যাংক বাহিনীর সি. ও. মেজর ফারুক রহমান সাহেব আমাদেরকে ব্রিফ করেন। তাহাদের সাথে মেজর রাশেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন মোস্তফা, মেজর ডালিম, ক্যাপ্টেন মাজেদসহ আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন। মেজর ডালিম সাহেব আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। মেজর ফারুক রহমান, মেজর রশীদ ও মেজর ডালিম বলেন, "বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক জানমালের বিনিময়ে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই দেশ স্বাধীন করিয়াছি, এই সরকার মা-বোনদের ইজ্জত রাখতে পারছে না। মানুষ না খাইয়া মরছে, এই সরকারকে উৎখাত করিতে হইবে। তোমরা আমাদের সাথে থাকিবা।"

মেজর রশিদ, মেজর ফারুক রহমান, মেজর ডালিম সাহেব পর্যায়ক্রমে আমাদেরকে আরো অনেক কথা বলেন যাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তারপর আমাদিগকে এমিউনিশন নেওয়ার নির্দেশ দেন। মেজর ফারুক রহমান সাহেব তাহার ইউনিট হইতে এমিউনিশন নিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ অনুসারে আমি ২০ রাউন্ড গুলি নেই। তারপর আমাদের ৬টি সেকশনকে ৬টা গাড়িতে উঠার নির্দেশ দিলে আমরা গাড়িতে উঠি। অতঃপর ৬টি ট্রাক MES-এর পাশ দিয়া মহাখালী হইয়া ফার্মগেইট পৌছে। আমার ট্রাকে মেজর রাশেদ চৌধুরী উঠেন। ফার্মগেইট পৌঁছার পরে ৪টি ট্রাক ডান দিকে চলিয়া যায়। আমাদের ট্রাকটিসহ অপর ট্রাক ফার্মগেইট হইতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল বর্তমানে শেরাটন হোটেলের দিকে অগ্রসর হইয়া শেরাটন হোটেলের সামনে দিয়া পূর্বদিকে কিছুদূর যাইয়া একটি বাড়ির পাশে থামে। পরে জানিতে পারি ঐ বাড়িটি তৎকালীন মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সরকারি বাড়ি ছিল। মেজর রাশেদ চৌধুরীর নির্দেশে আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির ভিতর ঢুকি। মেজর রাশেদ চৌধুরী-সহ অন্যান্য অফিসারগণ ফায়ার করিতে করিতে বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। নির্দেশ অনুসারে আমরাও আগাইলাম।

এক পর্যায়ে ট্যাংক বাহিনীর সৈনিকরা দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। কিছু সংখ্যক সৈনিক দোতলায় উঠিয়া সেরনিয়াবাত ও তাহার স্ত্রীকে নিচতলায় নিয়া আসে। বাসভবনের দরজা ভাঙ্গিয়া ঢুকিতে ডান দিকে যে রুমটি সেখানে কিছু আসবাবপত্র ছিল। সেই রুমে সেরনিয়াবাত ও তাহার পরিবারবর্গকে দাঁড়াইতে হুকুম দেয়। সেরনিয়াবাতের সাথে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিল। মেজর রাশেদ চৌধুরী তাহার স্টেনগান দিয়া সেরনিয়াবাত যেখানে ছিল সেখানে একবার ডানদিক হইতে আবার বাম দিক হইতে ব্রাশ ফায়ার করে। সাথে অন্য অফিসাররা ফায়ার করে। সেরনিয়াবাতের পাশে ৮/১০ বৎসরের একটি ছেলেও গুলিবিদ্ধ হয়। বাম দিক হইতে একজন মহিলা ঐ ছেলেটিকে বাবা বাবা বলিয়া জড়াইয়া ধরে। সাথের অফিসাররা আবারও গুলি করে। ইহার পর মেজর রাশেদ চৌধুরীর নির্দেশে আমরা বাড়ির ভিতর হইতে রাস্তায় চলিয়া আসি। সেখানে ক্যাপ্টেন মোস্তফা সাহেবসহ আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর রাশেদ চৌধুরীর নির্দেশে আমরা গাড়িতে উঠি। গাড়ি একসময় রেডিও সেন্টারে গিয়া পৌঁছে। সেখানে আমাদেরকে বিভিন্ন পোস্টে ডিউটি বন্টন করিয়া দেওয়া হয়।

আমার নাম শিহাবউদ্দিন। জেলা দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

29. Naik Shehab Uddin (Rtd.)
P. W. -29

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং–৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৪৫ বয়স্ক নায়েক (অবঃ) শিহাব উদ্দিন-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৩/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– নায়েক (অবঃ) শিহাব উদ্দিন, আমার পিতার নাম– আবদুল মোতালেব শিকদার, গ্রাম– বল্লাহাটি, থানা– কালিয়া, জেলা– নড়াইল।

আমি একজন আর্মির অবসরপ্রাপ্ত নায়েক।

১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে আমি টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে সিপাই হিসাবে ঢাকা ক্যান্টমেন্টে কর্মরত ছিলাম।

আমার সিও ছিলেন মেজর আবদুর রশিদ। আমাদের রেজিমেন্ট পাপা, কিউবেক, রোমিও, হেডকোয়ার্টার– চারটি ব্যাটারি ছিল।

আমি হেডকোয়ার্টার ব্যাটারিতে ছিলাম। আমাদের ব্যাটারি কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মোস্তফা। পাপা ব্যাটারির কমান্ডার ছিলেন মুহিউদ্দিন সাহেব। অন্য দুই ব্যাটারির কমান্ডারের নাম বলিতে পারিব না।

১৪ আগস্ট সন্ধ্যাবেলার প্যারেড অনুষ্ঠান আগে হইতে নির্ধারিত ছিল না। আমাদের MT পার্ক মাঠে আমরা সন্ধ্যার পর ফল-ইন হই।

আমি ব্যক্তিগত হাতিয়ার SLR নিয়া নাইট প্যারেডে অংশগ্রহণ করি। মেজর রশিদ সাহেবের নির্দেশে প্যারেড মার্চ করে। আমরা রোড

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ করিয়া নিউ এয়ারপোর্টে পৌঁছাইয়া সেইখানেই অবস্থান করিতেছিলাম।

রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটার সময় আমাদেরকে ক্লোজ করিয়া একটি গাড়িতে উঠায়। পরে গাড়ি দিয়া আমাদেরকে বালুরঘাট ল্যান্সার ইউনিটে লইয়া যায়। সেখানে গিয়া দেখি অনেক সৈনিক গোলাবারুদ নিতেছে। আমাদরেকে গাড়ি হইতে নামাইয়া গোলাবারুদ নিতে বলিলে আমরা গোলাবারুদ নেই। আমি দশ রাউন্ড এসএলআর-এর গুলি নেই। মেজর রাশেদ চৌধুরী আমাদরেকে একটা গাড়িতে উঠিতে বলেন। আমরা ওই গাড়িতে উঠি। আমাদের সাথে ছিলেন ওই গাড়িতেই মেজর রাশেদ চৌধুরী, একজন নায়েক সুবেদার হাবিলদার মোজাফফর। ১৫ই আগস্ট ভোর আনুমানিক ৪-৩০ টার দিকে মেজর রাশেদ চৌধুরী গাড়ি লইয়া শহরের দিকে রওনা হন।

মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সরকারি বাসভবনের পাশে আসিয়া গাড়ি থামায়। আমাদের পিছনে আরেকটা গাড়ি আসিয়া সেখানে থামে।

মেজর রাশেদ চৌধুরী আমাদেরকে গাড়ি হইতে নামিতে বলিলে আমরা গাড়ি হইতে নামি। তখন আমাদেরকে দৌড়াইয়া সেরনিয়াবাতের বাসভবনের ভেতরে ঢুকিতে বলেন। মেজর রাশেদ চৌধুরী ও অন্যান্য অফিসাররা গুলি করিতে করিতে দ্রুত গতিতে বাসভবনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। আমরাও পিছন পিছন অগ্রসর হইতে থাকি। বাসভবনের ভেতরে ঢুকিয়ো আমি ও অন্যান্যদেরকে বাসভবনের চারিদিকে ডিউটি করিতে বলেন। আমি পশ্চিম-দক্ষিণ কর্নারে দেওয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া ডিউটি করিতে থাকি। অন্যান্যরা বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াইয়া ডিউটি করিতে থাকে। মেজর রাশেদ চৌধুরী ও আরো কয়েকজন অফিসার কয়েকজন সৈনিকসহ বাসভবনের দরজা ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে।

একটু পরেই ব্রাশ ফায়ার ও চিৎকারের আওয়াজ শুনিতে পাই। মেজর রাশেদ চৌধুরী ও অন্যান্যরা ভবনের বাহিরে আসিয়া আমাদেরকে ক্লোজ করিয়া একটি গাড়িতে উঠায়। তারপর শাহবাগ রেডিও স্টেশনে নিয়া আসে। আমাদেরকে রেডিও স্টেশনের চারিদিকে ডিউটি করিতে বলেন। আমি এবং অন্যান্যরা ডিউটি করিতে থাকি। আমি রেডিও স্টেশনের পূর্ব-উত্তর কর্নারে ডিউটি করিতেছিলাম।

আমাদের সিও মেজর খন্দকার রশিদ সাহেবকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনিতাম। নিয়মানুযায়ী এ্যামুনিশন সেন্টারের রেজিস্টারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখাইয়া এ্যামুনিশন নিতে হয়। আমি ১০ রাউন্ড গুলি নিয়াছিলাম। আমি ১০ রাউন্ড গুলি খরচ করি নাই। পরে টু-ফিল্ড এ্যামুনিশন স্টোরের অফিসার কামরুল সাহেবের কাছে জমা দেই। কত তারিখে জমা দিয়াছি স্মরণ নাই। জমা না দিবার আগে গুলি আমার কাছেই ছিল।

মন্ত্রী সেরনিয়াবাতের বাসায় আমার অফিসাররা গুলি চালানোর ঘটনা আমি দেখিয়াছি, বাড়ির ভিতর মানুষ মারার সময় চিৎকার, আর্তনাদ শুনিতেছিলাম।

এই ঘটনার আগে আমি কখনও কোনো মন্ত্রীর বাসায় যাই নাই। মন্ত্রীর বাড়িতে ঢুকার সময় আমরা অফিসারদের পিছনে ছিলাম। মিলিটারিতে বিনা বাধায় ফাঁকা গুলি হয় না। তবে ঘটনার রাত্রিতে হইয়াছিল।

ওই বাড়ি হইতে কোনো পাল্টা গুলির আওয়াজ আসে নাই।

আমি সহিদুর রহমান ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জবানবন্দি দিবার জন্য সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়াছি।

19. Dafadar Shaidur Rahaman (Ex.)
P. W. -19

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং–৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

AMARBOI.COM

আন্দাজি– ৪৭ বয়স্ক, দফাদার সহিদুর রহমান (অবঃ)-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ৬/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম - দফাদার সহিদুর রহমান (অবঃ), বয়স- ৪৭ বৎসর, আমার পিতার নাম- মৌলভী ইদ্রিস আলী মন্ডল, গ্রাম- চুনিয়া পাড়া, থানা- ধুনট, জেলা- বগুড়া।

আমি বরখাস্তকৃত দফাদার, সহিদুর রহমান। ১৯৬৯ সনে আরমার কোরে সিপাই পদে যোগদান করি। পাকিস্তানে ট্রেনিং করিয়া সেখানেই চাকুরি করি। ১৯৭১ সনে দেশে আসিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট আমার কোরে এ, A স্কোয়াড্রনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন সদস্য ছিলাম। আমাদের সি.ও. ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোমিন সাহেব এবং টু-আই.সি. ছিলেন মেজর ফারুক রহমান।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট আমাদের সি.ও. সাহেব ছুটিতে থাকার কারণে টু-আই.সি. ফারুক সাহেব চার্জে ছিলেন। এই দিন বৃহস্পতিবার ছিল। আমি একজন খেলোয়াড় ছিলাম আবার তাবলিগও করিতাম। ঐ রাতে ১০টা পর্যন্ত কাকরাইল মসজিদে থাকিয়া ক্যান্টনমেন্টে ফেরৎ যাই। ব্যারাকে গিয়া খানা খাই। খানা খাইবার পর আমাদের S.D.M. [স্কোয়াড্রন দফাদার মেজর] আমাকে বলিলেন জিপ রেডি করিয়া তুমি প্রস্তুত থাক। আমি জিপ রেডি করে সেইভাবে প্রস্তুত থাকি। রাত্রি আনুমানিক ৪টার দিকে ইউনিফরম পরা মেজর ডালিম সেন্টনগান হাতে আমার গাড়ির কাছে আসে এবং গাড়ি স্টার্ট দিতে বলে। মেজর ডালিম গাড়িতে উঠিয়া আমাকে অ্যাডভান্সের নির্দেশ দেন।

আমার গাড়ির সামনে তখন একটি ট্রাক ছিল। ট্রাকটি পার হইয়া চলিতে থাকি, ট্রাকটি আমার গাড়ি অনুসরণ করিতে থাকে। আমরা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন হইয়া মহাখালী হইয়া মগবাজার চৌরাস্তা অতিক্রম করিলে মেজর ডালিম সাহেব গাড়ি থামানোর নির্দেশ দেন। গাড়ি থামাইলে তিনি স্টেনগানসহ গাড়ি হইতে নামিয়া আমাদের পিছনে থাকা ট্রাক হইতে আর্মি ফোর্স নামান, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ির চারিদিকে ফোর্স মোতায়েন করেন। অনুমান ১০/১৫ মিনিট পর ফিরিয়া আসিয়া গাড়িতে উঠেন এবং জিপে উঠিয়া জিপ চালাইতে বলেন। নির্দেশ মোতাবেক সেরনিয়াবাতের বাড়ির উত্তর পার্শ্বের রাস্তা দিয়া বর্তমান শেরাটন হোটেলের দিকে যাইতে থাকি। শেরাটন হোটেলের পূর্ব দিকে গোলচক্করের নিকট পৌঁছিলে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে গুলির শব্দ শুনিতে পাই। তখন ডালিম সাহেব জিপ থামাইতে বলেন। গাড়ি থামাইয়া পুনরায় সেরনিয়াবাতের বাড়ির দিকে আসি। সেরনিয়াবাতের বাড়ি অতিক্রম করিলে মেজর ডালিম সাহেব গাড়ি থামাইতে বলেন। গাড়ি থামাইলে স্টেনগানসহ তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া যান এবং সেরনিয়াবাতের বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণায় রাস্তার উপর দাঁড়ায়। তখন আমি গাড়িতে বসা অবস্থায় ২ রাকাত ফজরের নামাজ পড়িয়া নিলাম। কিছুক্ষণ পরে ডালিম সাহেব আবার আসিয়া জিপে উঠেন এবং রেডিও স্টেশনে যাইতে নির্দেশ দেন। রেডিও স্টেশনে পৌঁছিলে মেজর ডালিম সাহেব জিপ হইতে নামিয়া স্টেনগানসহ রেডিও স্টেশনের দিকে যাইতে থাকে। এই সময় আর একজন আর্মি অফিসার সশস্ত্র অবস্থায় আসেন। দুইজন কথা বলিতে বলিতে রেডিও স্টেশনের ভিতর চলিয়া যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ পরে মেজর ডালিম সাহেব রেডিও স্টেশন হইতে বাহিরে আসিয়া আমার জিপে উঠিয়া ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাইতে বলে। আমাদের পিছনে খোলা জিপে সশস্ত্র আর্মি ছিল। আমি ৩২ নম্বর রোডের মাথায় গেলে আমাকে জিপ থামাইতে নির্দেশ দেন। জিপ থামাইলে তিনি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যান। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জিপে উঠেন এবং আর্মি হেডকোয়ার্টারে যাইবার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মোতাবেক আমি হেডকোয়ার্টারে যাই। সেখানে তিনি স্টেগানসহ নামিয়া উগ্র ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সশস্ত্র অবস্থায় আর্মি হেডকোয়ার্টারে ঢুকিয়া পড়েন।

৫.

স্তব্ধ সময় কখনো গতি পায়। ধীর গতি। ধীর গতির মুহূর্তে রেণু আবার জলভরা চোখে মিনতির স্বরে বলেন, দুলাভাইয়ের একটা খোঁজ নাও। গতকাল বিকেলে রাসেলকে নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। সবার সঙ্গে কত আনন্দে সময় কাটিয়ে এসেছি। আরিফের সঙ্গে সবুজ মাঠে ছুটোছুটি করেছে রাসেল।

বঙ্গবন্ধু ফোন ঘোরান। অপর প্রান্তে শব্দ নাই। ফোনের রিসিভার ক্রেডেলের ওপর রাখেন। রেণুকে বলেন, ফোন কেউ ধরছে না।

তাহলে? তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে?

জানি না। বঙ্গবন্ধুর বেদনার্ত স্বরে দু'টি শব্দ বলে থেমে যান।

দুলাভাইয়ের বাড়িতে বরিশাল থেকে গানের দল এসেছে। বেশ কয়েকজন ছেলে আছে ওই বাড়িতে। ওদেরই বা কি হলো কে জানে!

বঙ্গবন্ধু গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, কারো কোনো কিছুর খোঁজ নেয়ার সুযোগ এখন আমাদের সামনে নেই।

ফুফুর বাড়িতে সেদিন একজন আমাদেরকে একটি গান শুনিয়েছিল মা।

ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন দুজনে। কেউ কথা বলেন না। রাসেল দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে। ওর চোখে পানি। কেউ ওর সঙ্গে কথা বলছে না এটাই ওর অভিমান।

রেণু চোখ মুছে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকান। বলেন, গ্রেফতার করলে তাঁকে তো একাই করবে তাই না? আপা তো আর রাজনীতি করেন না। আর ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত দেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি যদি একবার ওই বাড়িতে যেতে পারতাম। তারপরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার ভাগ্য ভালো যে আমার মেয়েরা দেশে নাই। আমার মেয়েদের সঙ্গে যদি একবার কথা বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতাম। ওগো, ওদেরকে একবার ফোন করে দেখো।

বঙ্গবন্ধু রেণুর দিকে তাকান না। কথাও বলেন না। দৃষ্টিকে ছাদ ছুঁতে দেন কিংবা দেয়াল।

রাসেল মায়ের হাত ঝাঁকিয়ে বলে মা, আমি পানি খাব।

রাসেলের কথায় রেণু চমকে ওঠেন। কেন যে এমন হচ্ছে। তিনি টেবিলে রাখা জগ থেকে ছেলেকে এক গ্লাস পানি দেন। রাসেল এক চুমুকে গ্লাসের পানি শেষ করলে তিনি আবার চমকে ওঠেন। যেন মধুমতী নদীর সবটুকু জল তাঁর বালক-পুত্রটির দরকার ছিল।

তিনি ভয়ে কাঠ হয়ে যান। বুঝতে পারেন রক্তের মধুমতী কোথাও বয়ে যাচ্ছে।

যে ছেলেগুলো বরিশাল থেকে গান গাইতে এসেছিল তাদের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে তাঁর কানে। ওরা রিহার্সেল করছিল। কি দারুণ গলা ছিল ওদের। ওরা গাইছিল 'গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা'– কেন ঘুরেফিরে নদীর কথা মনে আসছে তাঁর। ওই ছেলেগুলোর গানের দলের নাম ছিল 'ক্রিডেন্স'। ওরা অনুষ্ঠান শেষ করে ওই বাড়িতে গেছে? ভালো আছে তো ছেলেরা? নাকি ওদেরকেও বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে?

রেণুর মনে হয় তিনি শুনতে পাচ্ছেন ওদের কারো কণ্ঠস্বর– জিপ এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। সশস্ত্র সেনারা লাফ দিয়ে জিপ থেকে নামে। শুরু হয় অবিরাম গুলি। আরও জিপ আসতে থাকে, একইভাবে অস্ত্র নিয়ে জিপ থেকে নামে সেনারা, বাড়ির চারদিক ঘিরে ফেলে। বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে তারা দাঁড়িয়ে যায়। মন্ত্রীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। মন্ত্রী ফোন ঘোরাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে। বুঝতে পারেন ওই বাড়িতেও আক্রমণ হয়েছে। এরই মাঝে সেনা সদস্যরা ঘিরে ফেলেন পরিবারের সবাইকে।

নিচু তলায় গানের শিল্পীদের মারধোর করে লাইনে দাঁড়াতে বলে। চিৎকার করে বলে, হ্যান্ডস আপ। সবাই হ্যান্ডস আপ করে দাঁড়াতেই দেখতে পান দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে পরিবারের সবাইকে। ড্রইংরুমে সবাইকে দাঁড় করানো হয়। মন্ত্রী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের হাই কমান্ড কে?

মুখে উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই তাদের। গর্জে ওঠে সাব মেশিন কার্বাইন। ম্যাগাজিনের সব গুলি শেষ করে ফেলা হয়। আবদুর রব সেরনিয়াবাত মাঝখানের টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে যান। তখনও প্রাণ বায়ু নিঃশেষ হয়নি। তিনি দোয়া পড়েন। অজস্র গুলির ফলে ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেলে অস্ত্রটি ফেরত দিল পেছনে দাঁড়ানো আর একজনের কাছে। তার পেছনে আর একজন ছিল একই সাব মেশিন কার্বাইন নিয়ে। প্রথম সেনা তার হাতে সেই অস্ত্র নিয়ে গুলির স্রোত বইয়ে দিল। উড়ে গেল শিশু সুকান্তের মাথার খুলি। অসংখ্য বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যরা। কেউ আহত হলেন, কেউ নিথর হয়ে গেলেন। ঘরের অ্যাকুরিয়ামটি ভেঙে গেলে পানি গড়ায় মেঝেতে। রক্ত আর পানি নদীর মতো বইতে থাকে। কোথায় যাবে স্রোত? কতদূর গড়াবে? বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত কি?

রেণু তখন বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলেন, মনে হয় সিঁড়ি দিয়ে কেউ নেমে যাচ্ছে। আমার ছেলেদের কেউ। তুমি কি ওকে নামতে না করবে?

না। কাউকে কিছুই বলবো না। এই গুলির মুখে খালি হাতে কিছু করার নেই রেণু।

দুলাভাইয়ের বাড়িতে একটা রক্তের নদী তৈরি হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি। হায় আল্লাহ–

মা, মাগো রাসেল দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মাকে। মা বুকে টেনে নেয় ছেলেকে। দু'জনেই মাত্র গত বিকেলে দেখে এসেছে ওই পরিবারের সবাইকে। আর একটি বিকেল এখনো আসেনি। সেই বিকেল পেরিয়ে, রাত পেরিয়ে এখন আর একটি দিনের প্রথম প্রহর। দিনের প্রথম আলো ভালোভাবে ফোটেনি তখনও। আলো-আঁধারীর ফ্যাকাশে ভাব চারদিকে।

কতটুকু সময় মাত্র। মহাকালের সময় থেকে কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র কেটে যায়। আর এগোয় না। এই বাড়িতে সময় এখন স্তব্ধ।

AMARBOI.COM

৬.

আমার নাম আবদুর রহমান, রমা নামে সবাই ডাকে। আমি এখন জেলা দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

2. Abdur Rahaman SK. (Rama).
P. W. -2

জবানবন্দি লিখিবার ধারা

আন্দাজি– ৩৮ বয়স্ক, আবদুর রহমান শেখ (রমা)-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৪/৭ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– আবদুর রহমান শেখ (রমা), আমার পিতার নাম– আব্দুল মন্নাফ শেখ, আমি জাতিতে মুসলমান, সাং ও পুলিশ স্টেশন– টুঙ্গিপাড়া, জেলা– গোপালগঞ্জ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ১৯৬৯ সনে কাজের লোক হিসাবে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসি। ঐ দিন অর্থাৎ ঘটনার দিন রাতে আমি এবং সেলিম দোতলায় বঙ্গবন্ধুর বেডরুমের সামনের বারান্দায় ঘুমাইয়াছিলাম। আনুমানিক ভোর ৫টার দিকে হঠাৎ বেগম মুজিব দরজা খুলিয়া বাহিরে আসেন এবং বলেন যে, সেরনিয়াবাতের বাসায় দুস্কৃতিকারীরা আক্রমণ করিয়াছে। ঐ দিন তিনতলায় শেখ কামাল এবং তাহার স্ত্রী সুলতানা ঘুমাইয়াছিল। ঐ দিন শেখ জামাল ও তাহার স্ত্রী রোজী এবং ভাই শেখ নাসের দোতলায় ঘুমাইয়াছিল। বঙ্গবন্ধু ও তাহার স্ত্রী এবং তাঁদের ছোট ছেলে শেখ রাসেল দোতলায় একই রুমে ঘুমাইয়াছিল। নিচতলায় PA মহিতুল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মচারী ছিল।

বেগম মুজিবের কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি লেকের পাড়ে যাইয়া দেখি কিছু আর্মি গুলি করিতে করিতে আমাদের বাড়ির দিকে আসিতেছে। তখন আমি আবার বাসায় ঢুকি এবং দেখি P.A/Reception রুমে বঙ্গবন্ধু তাহার সাথে কথা বলিতেছেন। আমি পিছনের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় আসিয়া দেখি বেগম মুজিব দোতলায় ছুটাছুটি করিতেছেন। আমি সাথে সাথে তিনতলায় যাই এবং আমাদের বাসা আর্মি আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া কামাল ভাইকে উঠাই। কামাল ভাই তাড়াতাড়ি একটা প্যান্ট ও শার্ট পরিয়া নিচের দিকে যায়। আমি তাহার স্ত্রী সুলতানাকে লইয়া দোতলায় আসি। দোতলায় গিয়া একইভাবে আমাদের বাসা আর্মিরা আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া জামাল ভাইকে উঠাই। তিনিও তাড়াতাড়ি প্যান্ট ও শার্ট পরিয়া তাহার মার রুমে যায়। সাথে তাহার স্ত্রীও যায়। এই সময়ও খুব গোলাগুলি হইতেছিল।

আমি, মহিতুল তখনও নিচতলায়। বঙ্গবন্ধু উপরে উঠে যাওয়ার পরে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হতভম্ব। কি করব বুঝতে পারি না। টেলিফোনে যোগাযোগের আর কোনো উপায় আমার সামনে নাই। তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাই। বুঝতে পারি পায়ের এই শব্দ কামাল ভাইয়ের। বেশ কিছুদিন ধরে শোনার ফলে তার পায়ের শব্দের ধারণা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

৭.

আমার নাম নূরুল ইসলাম খান। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার। বর্তমানে আমার বয়স ৬৯ বৎসর। আমার পিতার নাম মরহুম আবদুল মুন্নাফ খান। আমার বাসস্থান– গ্রাম– রাহুতহাটি, থানা–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবাবগঞ্জ, জেলা– ঢাকা'। বর্তমান ঠিকানা ১৫০বি, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, নওমহল, কোতয়ালী, ময়মনসিংহ। বর্তমানে আমি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি। আমি P. W. -50 নম্বর সাক্ষী।

১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট দিবাগত রাতে ডি.এস. বি'র প্রটেকশন ফোর্স হিসাবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নং বাড়িতে হাউস গার্ডদের চার্জে কর্মরত ছিলাম। আমার সাথে পুলিশ ইন্সপেক্টর খোরশেদ আলী হাউস গার্ড তদারকের দায়িত্বে ছিল। পুলিশের একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং একজন হেড কনস্টেবল হাউস গার্ড বদলের দায়িত্বে ছিলেন তাহাদের নাম মনে নাই।

এছাড়া কুমিল্লা হইতে আগত ২০/২৫ জন আর্মি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সর্বদা হাউজ গার্ডের দায়িত্বে ছিল। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল পুলিশ এবং আর্মি দ্বৈতভাবে। এছাড়া এস.বি.-এর একজন ইন্সপেক্টর সিদ্দিকুর রহমান বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন।

১৪ আগস্ট দিবাগত রাত অনুমান ১টার সময় আমি এবং একজন পুলিশ সার্জেন্ট (নাম মনে নাই) বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নিচের তলার বৈঠকখানায় বিশ্রাম নিতেছিলাম। ঐ সময় বঙ্গবন্ধুর পি. এ. কাম রিশেপসনিস্ট মহিতুল ইসলামও সেখানে ছিল। ভোর অনুমান পৌনে ৫টার সময় দোতলা হইতে বঙ্গবন্ধুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাই এবং তিনি তাড়াতাড়ি নিচে আসিতেছেন অনুমান করিতে পারি। এই ভাবিয়া আমি এবং পুলিশ সার্জেন্ট তাড়াতাড়ি জুতা ঠিক করিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াই। বঙ্গবন্ধু দোতলা হইতে নিচে নামিয়া রিশেপসনিস্টের রুমে গিয়া টেলিফোনে আলাপ করার চেষ্টা করেন। এমন সময় হঠাৎ পূর্ব-দক্ষিণ হইতে এক ঝাঁক গুলি রিসেপসনিস্টের রুমে আসিয়া জানালার কাঁচ ভাঙিয়া ফেলে। আমি সেন্ট্রিকে বলি এত গুলি কিসের। সেন্ট্রি বলে, বাহির হইতে হামলা হইয়াছে। তখন আমি বলি, তোমরা ফায়ারিং চালাও–তখনও বাহির হইতে হেভী ফায়ারিং হইতেছিল একই সময় ৪/৫টা কামানের গোলার শব্দ শুনিলাম। ইহাতে বিল্ডিং কাঁপিয়া উঠিল। অনুমান ৫ মিনিট বাহির হইতে গুলি হইবার পর গুলি বন্ধ হয়। তখন বঙ্গবন্ধু রিশেপসনিস্টের রুম হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বারান্দায় দাঁড়ান। আমি, সার্জেন্ট বঙ্গবন্ধুর পাশে গিয়া দাঁড়াই। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ফায়ারিং কিসের। আমি বলিলাম, বাহির হইতে হামলা হইয়াছে।

তিনি নিজেও জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্মি সেন্ট্রি, পুলিশ সেন্ট্রি এত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফায়ারিং কিসের, তখন গেইটের বাহিরে থাকা একজন আর্মি সিপাই উত্তর দিল বাহির হইতে হামলা হইয়াছে।

ইহার পর বঙ্গবন্ধু এবং আমি দেখিতে পাইলাম, কালো এবং খাকি পোশাকধারী কিছু আর্মি পূর্ব-দক্ষিণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণ দিক হইতে ক্রলিং করিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে আসিতেছে। এটা দেখিয়া বঙ্গবন্ধু দোতলায় চলিয়া যান।

৮.

স্তব্ধ সময় নড়ে ওঠে। সময় থেমে থাকে না। সময় এগোয়।

ক্ষণিক মুহূর্ত কখনো দীর্ঘ হয়, কখনো হ্রস্ব। এখনকার সময় মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়ার ঘটনার একটি গোলকপিণ্ড। উল্কার বেগে ছুটছে এবং দাউদাউ পুড়ছে। সময়ের পুড়ে যাওয়া ভস্ম ইতহাসের পৃষ্ঠা ভরে রাখে। সময়ের ভস্ম বাতাসে উড়ে যায় না। সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার সাক্ষী হয়ে থাকে। নীরব সাক্ষী। কিন্তু নীরবতা সাক্ষীর ঘটনার মুখর দৃশ্য। কথা বলে হাজার কণ্ঠে। কথা বলে অজস্র দিন ধরে। ইতিহাসের নদী বয়ে যায় সঙ্গে নিয়ে অযুত দৃশ্য। কালের এবং অকালের।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মহিতুল বলেন : এরপর শেখ কামাল উপর হইতে নিচে নামিয়া আসেন এবং বারান্দায় আসিয়া বলেন, আর্মি ও পুলিশ ভাই, আপনারা আমার সাথে আসেন। তখনই তিন-চার জন খাকি ও কালো পোশাকধারী আর্মির লোক অস্ত্রসহ সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি ও পুলিশের ডি.এস.পি জনাব নূরুল ইসলাম শেখ কামালের পিছনে দাঁড়াইয়াছিলাম। ডি.এস.পি নূরুল ইসলাম সাহেব আমাকে পিছন দিক হইতে টানিয়া অফিস কক্ষে লইয়া যায়। আমি ঐখানে হইতে দাঁড়াইয়া বাহিরের অবস্থা দেখার চেষ্টা করি। আগত আর্মিদের মধ্যে থেকে খাকি পোশাক পরিহিত মেজর বজলুল হুদা শেখ কামালের পায়ে গুলি করে। তখনই বুঝতে পারি শেখ কামাল সেখানে গুলি খাইয়া মারা যায়।

এরমধ্যে তারা দেখতে পান খাকি পোশাকধারী চার-পাঁচজন আর্মি সদস্য ফাঁকা গুলি করতে করতে দোতলায় উঠছে। যে আর্মি কামালকে গুলি করেছিল সে রিসেপশন রুমে গিয়ে শেখ কামালকে আর একটি গুলি করে। এ সময় দেখা যায় কালো ও খাকি পোশাকধারী আরও কুড়ি-পঁচিশ জন আর্মি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেন্ট্রি বক্সে সেন্ট্রিদের রাইফেলগুলি সীজ করে নিয়ে যায় এবং তাদেরকে বাসার পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে লাইন করে দাঁড় করায়।

নূরুল ইসলাম পেছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে মহিতুল ইসলাম ও আর একজনকে। দরজার কাছে আসতেই আর্মির মেজর বজলুল হুদা তাদের চুল ধরে টেনে তোলে। তার সাথে আর্মির আরও অস্ত্রধারী লোক আছে। পেছন থেকে একজন সেনা চিৎকার করে বলে, রুমে যারা আছ সবাই বাইরে আস। অন্যথায় ব্রাশ ফায়ার করে সবাইকে মেরে ফেলব। সবাই বের হয়ে আসে। বজলুল হুদা প্রধান গেটের সামনে তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করায়। ওরা দেখতে পায় আগে যাদের দাঁড় করানো হয়েছিল সেখানেই তাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে। মহিতুল ইসলামের পাশে এসবির অফিসার দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ একজন অস্ত্রধারী এসবি অফিসারকে গুলি করে। গুলি খেয়ে তিনি পড়ে যান। একজন সেনা নূরুল ইসলামকে লক্ষ্য করে বলে, তুমি গুলি করার হুকুম দিয়েছো। চলো, তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলব। অস্ত্রধারী সেনা নূরুল ইসলামকে গেটের বাইরে নিয়ে যায়। সেখানে একটি আর্মির গাড়িতে বসা একজন অফিসারকে বলে, স্যার এ লোকটি গুলি করার জন্য হুকুম দিয়েছিল। তাকে গুলি করি?

গাড়িতে বসে থাকা অফিসার নূরুল ইসলামের নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করে তাঁকে চলে যেতে বলে। নূরুল ইসলাম চলে যেতে থাকলে অস্ত্রধারী সেনা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন তিনি কালো পোশাকধারী আর্মিসহ একটি ট্যাংক দাঁড়ানো দেখেছিলেন। এরপর বাড়ির কাজের বুয়া ও রাখালকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করায়।

নূরুল ইসলামের অফিসই ঘটনার বাড়িতে পুলিশ সিকিউরিটি অফিস ছিল। অফিসটি ছিল বাড়ির নিচতলায়। তাঁর কোনো মুন্সী ছিল না। কোনো টেলিফোনও ছিল না। তিনি দরকার হলে রিসেপশনের ফোন ব্যবহার করতেন। ঘটনার রাতে তাঁর কর্তৃপক্ষ পুলিশ সুপারের সাথে তার কোনো যোগাযোগ হয়নি। প্রেসিডেন্টের বাড়ি থেকে তখন লালবাগ থানাই নিকটতম থানা ছিল। টেলিফোন বিকল থাকায় থানায় যোগাযোগ করা হয়নি।

নূরুল ইসলাম প্রেসিডেন্টের বাড়িতে পুলিশ গার্ডদের দায়িত্বে ছিলেন। ঘটনার সময় তিনিসহ বারো জন পুলিশ হাউজ গার্ড ঘটনার বাড়িতে কর্তব্যরত ছিল। ঘটনার বাড়িতে ৭টি সেন্ট্রি পোস্ট ছিল। চারটি পোস্টে পুলিশ এবং তিনটি পোস্টে আর্মি সেন্ট্রি ছিল। প্রত্যেকটি সেন্ট্রি পোস্টে একজন ডিউটি করত। ইন্সপেক্টর এবং সাব-ইন্সপেক্টর নূরুল ইসলামের সঙ্গে একরুমে বসতেন। ঘটনার সময় হাবিলদারসহ তাঁরা বাসভবনের ভেতরে ছিলেন। অন্যান্য পুলিশও বাসভবনে কর্মরত ছিল। তিন জন আর্মি তিনটি সেন্ট্রি পোস্টে ডিউটিরত ছিল। ঘটনার সময় বাদবাকী আর্মির লোক বাসভবনের দক্ষিণ শেডে ছিল। ওই শেডে তিনি কখনও যাননি। ওই শেড থেকে উত্তরে বঙ্গবন্ধুর বাড়িসহ চারদিকে আশেপাশের সব দেখা যায়। নূরুল ইসলাম বলেন যে, প্রেসিডেন্টের বাসভবনে বাইর থেকে আক্রমণ হলে তা প্রতিহত করা হাউজ গার্ডদের দায়িত্ব। সে অনুযায়ী তিনি পাহারারত পুলিশদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলি করার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা গুলি করেছিল কিনা তা তিনি খেয়াল করেননি।

তিনি বলেন যে, শেখ কামালকে গুলি করার পরে কালো পোশাকধারী আর্মি স্টেনগান দিয়ে তাঁকে গুলি করে। গুলি তাঁর ডান পায়ের হাঁটু বিদ্ধ করে। অপর গুলিটি ডান পায়ের জুতো ভেদ করে পায়ের কনিষ্ঠ আঙুল বিদ্ধ করে। প্রচুর রক্তপাত হয়।

রক্ত গড়াতে থাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নিচতলায়। নিহত এবং আহতদের রক্ত।

লাইনে দাঁড়িয়ে নূরুল ইসলাম আর মহিতুল পরস্পরের হাত ধরে রাখে। তাদের দুজনের হাঁটু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাদের সামনে আছে গুলিবিদ্ধ লাশ। রক্ত একতলার ঘর থেকে প্রাঙ্গণে আসে। দুজনের রক্তাক্ত পা ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি। এই বাড়িতে এখন মানুষের কোলাহল নেই।

তখন একদল সেনা অফিসার দোতলার সিঁড়িতে পা রাখে।

এ বাড়িতে সময় আবার স্তব্ধ হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

৯.

আমি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

45. Major General (Rtd.) Shafiullah
P. W. -45

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং–৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৬৩ বয়স্ক, মেজর জেনারেল (অবঃ.) শফিউল্লাহ'র জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৮ সালের ১৩/১ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– মেজর জেনারেল (অবঃ.)শফিউল্লাহ, বয়স– ৬৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৎসর, আমার পিতার নাম– কাজী মৌঃ আবদুল হামিদ, গ্রাম– রূপগঞ্জ, থানা– রূপগঞ্জ, জেলা– নারায়ণগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা বাড়ি নং– ১ ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

আমি মেজর জেনারেল এর সেনা প্রধান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত।

আমি ১৯৭০ সনের ২৪শে আগস্ট অবসর গ্রহণ করি। আমি ১৯৫৫ সনে আর্মিতে কমিশন লাভ করি। ১৯৭০ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত আমি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত থাকাকালীন আমাকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের টু-আই. সি. হিসাবে পোস্টিং দেওয়া হয় যাহার অবস্থান জয়দেবপুরে ছিল। তখন আমি মেজর ছিলাম।

১৯৭৫ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ আর্মির ৫টা ইনফ্রেটেড ব্রিগেড ছিল। তম্মধ্যে ঢাকায় ৪৬ ব্রিগেড ছিল। কর্নেল সাফায়েত জামিল তখন ৪৬ ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিল। এই ব্রিগেডের অধীনে ১১৫ এবং ২৬ ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়ন ছিল এবং টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট নামে একটা আর্টিলারি রেজিমেন্ট ছিল। মেজর খন্দকার রশিদ এই আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিল। তখন আর্মি হেড কোয়াটারের অধীনে সি.জি.এস.এর তত্ত্বাবধানে ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার নামে একটি ট্যাংক রেজিমেন্ট ছিল। ১৯৭৫ সনে এই ট্যাংক রেজিমেন্টের কমান্ডার ছিল কর্নেল মোমেন এবং টু-আই. সি. ছিল মেজর ফারুক রহমান। আর্মিতে প্রতি মাসে দুইবার বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নাইট ট্রেনিংয়ের প্রচলন ছিল। ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের জন্য হেলিকপ্টারের প্রয়োজন ছিল বলিয়া এবং আমাদের হেলিকপ্টার না থাকার কারণে ভারত আমাদেরকে দুইটা হেলিকপ্টার লোন দেয়। এই হেলিকপ্টার মেইনটেন্যান্স সার্ভিসের জন্য কলিকাতা যাইতে হইত। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট সেই এক মেইনটেন্যান্সের জন্য কলিকাতা যাইবার পথে ফেনীতে বিধ্বংস হয় এবং সকল যাত্রী মারা যায়। এই মৃত ব্যক্তিদের মৃতদেহ আনিয়া ডিসপোসাল করিতে রাত্র ২-২.৩০টা বাজিয়া যায়। তাছাড়া পরের দিন ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে যাইবার কথা ছিল। সেইজন্য যে মঞ্চ করা হয় উহার আশেপাশে কিছু বিস্ফোরক লুকানো হয়। পুলিশের কাছে তখন বিস্ফোরক প্রতিরক্ষামূলক কোনো সরঞ্জাম না থাকায় আইজিপি নূরুল ইসলামের আর্মি ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন হইতে আমি কিছু এন্টি বিস্ফোরক ডিটেকটর পাঠাই। এই দুই ঝামেলা লইয়া ব্যস্ত থাকায় আমি অধিক রাত্রে ঘুমাইতে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের দিন অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট '৭৫ সকালে আমার ব্যাটসম্যান দরজা ধাক্কা দিলে আমি বাহির হই এবং দেখি আমার ডি.এম.আই লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন, (ডাইরেক্টর মিলিটারি ইনটেলিজেন্স) সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞাসা করে, স্যার আপনি কি আরমার এবং আর্টিলারিকে শহরের দিকে যাইতে বলিয়াছেন? আমি বলিলাম, নাতো। কেন? সে উত্তরে বললো, তারা তো রেডিও স্টেশন, গণভবন এবং ৩২ নম্বর রোডের দিকে যাইতেছে।

তাহার কথা শুনিয়া আমি শঙ্কিত হইলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাজ্ সাফায়েত নো অ্যাবাউট ইট? সে উত্তরে বলিল, আমি জানি না স্যার, আমি প্রথমেই আপনার কাছে আসিয়াছি। তখন তাহাকে বলিলাম, তুমি শীঘ্রই সাফায়েতের কাছে যাও এবং তিনটা পদাতিক ব্যাটেলিয়নকে তাহাদেরকে প্রতিহত করার জন্য আমার নির্দেশ সাফায়েতকে জানাও। আমি তাহাকে টেলিফোনে নির্দেশ দিতেছি।

তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াই আমি রুমে ঢুকিয়া টেলিফোনে প্রথমে বঙ্গবন্ধুকে চেষ্টা করি। কিন্তু পাই না। পরে সাফায়েত জামিল, চীফ অব এয়ার স্টাফ খন্দকার, চীফ অব নেভাল স্টাফ এম.এইচ. খান, ডিপুটি চীফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমান, সি.ডি.এম. খালেদ মোশারফকে টেলিফোন করি।

সাফায়েতের সাথে কথা বলার সময় মনে হয় যেন আমি তাহাকে ঘুম হইতে উঠাইয়াছি। আমি তখন তাহাকে তিনটা পদাতিক ব্যাটেলিয়ন দ্বারা তাহাদেরকে (আর্টিলারি ও আরমার) প্রতিহত করার নির্দেশ দেই।

আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলি তিনি আমার গলার আওয়াজ শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, শফিউল্লাহ তোমার ফোর্স আমার বাড়ি অ্যাটাক করেছে। কামালকে বোধহয় মেরে ফেলেছে। তুমি জলদি ফোর্স পাঠাও।

উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, I am doing something. Can you get out of the house?

১০.

তিনিতো বেরিয়ে যাওয়ার মানুষ নন। তিনি পলাতক হতে শিখেননি। রাজনীতির মাঠে সবসময় সামনে থেকেছেন। আজও শত্রুর মুখামুখিই হবেন।

যেমন ছিলেন স্কুল জীবনে। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময়। স্কুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোস্টেলের ছাদ ফেটে পানি পড়তো। স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি কয়েকজন ছাত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন। ছাত্রদের অসুবিধার কথা বললেন। প্রতিকার চাইলেন। প্রতিকার পেলেন তাঁদের কাছ থেকে। তাঁরা বিস্ময়ে সাহসী বালকটিকে দেখলেন।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা মোকবেলা করেছিলেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। পড়তেন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে। ত্রাণ বিতরণ করেছেন। বিপন্ন মানুষদের বাঁচানো জন্য জীবন বাজী রেখে ঘুরেছেন। বুঝেছিলেন ধর্মের উর্ধে মানুষের জীবনের সত্যাসত্য।

আজও এই মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু পিঠ দেখিয়ে পালিয়ে যাবেন কেন? তাঁর হাতে অস্ত্র নেই বলে পালানোর পথ খুঁজতে হবে কেন? ওদের মুখোমুখি দাঁড়াবেন। পেছন ফিরে নয়। বুক পেতে দিয়ে। যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন পঁচিশের কালো রাতে– মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ সময়ে।

তারও আগে ছাত্রজীবনে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিদের আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য তাঁকে জরিমানা করেছিল কর্তৃপক্ষ। তিনি এ অন্যায় আদেশ মানেননি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। কিন্তু বন্ড সই করে মুক্তি পেতে অস্বীকার করেছিলেন। রাজনীতির মাঠে বারবারই জেল খেটেছেন কিন্তু রাজনীতিকে পিঠ দেখিয়ে নির্ভেজাল ভালোমানুষ হতে চাননি। পাকিস্তান সরকারের সামনে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ফলে তাঁর হয়েছিল হয়রানি। তাঁকে জেলে ঢোকানো হচ্ছিল বারবার। তারপর দেশের সামরিক সরকার সাজিয়েছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। সেটা মোকাবেলা করতে গিয়েও তিনি পিছু হটেননি। আকাশ-ছোঁয়া মানুষ হয়ে অটল দাঁড়িয়েছিলেন সারা দেশের সবখানে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে প্যারোলে মুক্তি নেননি। সেদিন রেণুও তাঁর সঙ্গে এক হয়েছিলেন। মমিনুলের গাড়িতে করে ক্যান্টনমেন্টের বন্দী শিবিরে এসেছিলেন রেণু আর হাসিনা। দীপ্ত স্বরে বলেছিলেন, 'মনে রেখো, তোমার একদিকে আইয়ুব খান, অন্যদিকে সারা দেশের জনগণ। তুমি যদি প্যারোলে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়া স্থির করো, আমি ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে আত্মঘাতী হবো।' সেদিন তিনি না যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রেণুর সাহস তাঁকে আরও দীপ্ত করেছিল। এখন সেই রেণু তার সামনে। পালানোর কথা তো রেণুর সামনে উঠানোই যাবে না। এমন ভীরু মানুষ তিনি নন। এই মানুষ কি কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সেনা সদস্যকে পিঠ দেখাবেন? তাঁদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লুকিয়ে বাড়ি থেকে বের হবেন? এ এক অসম্ভব কাজ। যে কাজ তিনি সারাজীবনে কখনো করেননি, আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তা করতে হবে? না, কখনোই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনিই তো সেই মানুষ যার নাম এদেশের ঘরে ঘরে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর নামে জেগে উঠেছে মানুষ। তাঁর ডাকে দুর্বিনীত যোদ্ধা হয়েছে মানুষ। তিনি দুঃখী মানুষের স্বপ্নকে লালন করেছেন। স্বপ্ন ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই দেশজুড়ে উচ্চারিত হয়েছে বিশাল স্লোগান–তোমার নেতা-আমার নেতা-শেখ মুজিব-শেখ মুজিব। কুঁড়েঘর, ফসলের মাঠ, গ্রামীণ জনপদ, রাজপথ, শহর, শহরের বস্তি, বাড়িঘর, দালানকোঠার ভেতরে কোটি কোটি বার এই নাম ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর জোয়ারের জলের মতো পলিমাটি বয়ে এনেছে এই ভূখণ্ডের সবখানে। সেই ভূখণ্ডে তিনি বুনেছেন বীজ। সেই বীজ থেকে প্রস্ফুটিত হয়েছে ফুল। যে ফুলের নাম স্বাধীনতা। এই ফুল বাগানে ফোটে না। ফোটে জাতির জীবনে। এই ফুল জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতীক হয়– পতাকা হয়ে পতপত ওড়ে। বিশ্বের মানচিত্রে জাতিকে গৌরবের আসনে নিয়ে যায়। এতকিছুর পরে তিনি কেন পেছন দরজার মানুষ হবেন? যেখানে মানুষ–মানুষই সত্য।

আজ এই ঘোর কৃষ্ণ সময়ে তিনি কি করে ঘর থেকে পালাবেন? পালাননিতো পঁচিশের গণহত্যার কালোরাতে! বলেছিলেন, তোমাদের যা খুশি কর। আমি যা করেছি তারজন্য মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবো। আমার হাঁটু কাঁপবে না। পায়ের পাতা টলবে না। আমার পেছনে কোটি মানুষের শক্তি আছে।

আমার সামনে মানুষই চেতনার দরজা। সে দরজা খুলে দিলে দক্ষিণা বাতাস বয়ে যায়– উড়ে আসে হাজার হাজার ফুলের পাপড়ি। শস্যবতী করে পতিত জমি।

AMARBOI.COM

১১.

সুলতানা কাঁদছেন। কাঁদছেন সবাই।

বাইরে প্রচণ্ড গুলির শব্দ ছিল। এখন কমেছে। সিঁড়িতে বুটের আওয়াজ। ওরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। অস্ত্রধারীরা মুখোমুখি করেছে নিরস্ত্র মানুষকে। ওদের বুটের শব্দ উড়ে যাচ্ছে ধানমন্ডি লেকের উপর দিয়ে। বাড়ির বাইরে ট্যাংক এসে থামে।

এবং এই বাড়িতে সময় থেমে যায়।

সুলতানাকে বুকে জড়িয়ে রেণু ভাবেন, মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠের কৃতি খেলোয়াড়। দৌড়াচ্ছে লক্ষ্যের দিকে– সবার আগে ও পৌঁছে যায়। ওর তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো দৌড়ানোর অনেক পথ বাকি– । তাঁর ছেলে মেয়েটিকে পছন্দ করে বিয়ে করেছে । বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে মাত্র এক মাস আগে । ওর হাত থেকে মেহেদীর রঙ এখনো ওঠেনি । মাত্র এক মাসের মধ্যে মেয়েটি তার ঘর হারালো । রেণুর বুক ভার হয়ে ওঠে ।

তিনি মৃদুস্বরে সুলতানাকে বলেন, মাগো শক্ত হ । যেমন করে তুই খেলার মাঠে শক্ত ছিলি । যেমন করে খেলার মাঠ থেকে সোনার মেডেল ছিনিয়ে আনতি তেমন করে শক্ত হ । তোর ডাকনাম খুকু । আমি তো জানি তুই খুকি নোস । তোর মনের জোর আছে । সাহস আছে । ওরে মেয়ে– ও মা আমার – মাগো –

সুলতানা কামাল মাথা সোজা করেন । শাশুড়ির দিকে তাকান । ভাবেন, এক মাস আগের উৎসবমুখর বাড়িটা, আজ এমন মৃত্যুপুরী কেন? রাসেল এসে ওর পাশে বসে । রোজী আর একপাশে । সুলতানা দুজনের হাত ধরেন । ওরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে তাকায় । সিঁড়িতে বুটের শব্দ শুনতে পায় । সুলতানা আর রোজীর সামনে ভেসে ওঠে বাবা-মা-ভাইবোনের মুখ । কারো সঙ্গে শেষ দেখা হলো না । এমন মনে হচ্ছে কেন? তাহলে কি ওদের মেরে ফেলবে সেনারা? নাকি নিয়ে যাবে কোনো বাঙ্কারে? দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়ায় । কেউই পরস্পরকে ধরে রাখা হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের পানি মোছে না । দুজনেই ভাবেন, আজকের চোখের পানি মোছার নয় । পানি পড়ে পড়ে শেষ হয়ে যাক । ওরা আর কোনোদিন কারো জন্য চোখের জল ফেলবেন না । চোখের জল সঞ্চয় করে রাখার দরকার নাই ।

তখন রেণু দু'হাতে চোখের জল মোছেন । ভাবেন, চোখে আর জল আসবে না । তাঁর বড় ছেলের মৃত্যু তাঁর চোখের সব জল নিয়ে নিয়েছে । সেই গুলির শব্দ শোনার পর থেকে তিনি ছুটোছুটি করছেন । রক্তের মধুমতী নদী প্রবল স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে তার মাথার ভেতরে । তাকেও শক্ত হতে হবে । শক্ত হওয়া কঠিন কাজ নয় । দুর্যোগই মানুষকে শক্ত করে দেয় । কত ধরণের দুর্যোগ বয়ে গেছে তার মাথার উপর দিয়ে । তবে আজকের এই দিনটির মতো কোনোটি ছিল না । আঁচলে মুখ মুছে দু'হাতে দুর্যোগ হাতের মুঠিতে নিয়ে তিনি স্বামীর দিকে তাকান । দেখতে পান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি । হাতে তখনো ফোনের রিসিভার । ক্রেডেলে রাখা হয়নি । একটু আগে সেনাপ্রধানকে বলেছেন, কামালকে বোধহয় মেরে ফেলেছে । হ্যাঁ, কামালের চিৎকার তাঁরা শুনেছেন । তিনি একদৃষ্টে প্রিয় মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকেন । দু'জনের বুকের ভেতর তোলপাড় করে ওঠে কামালের কথা ।

একবার বঙ্গবন্ধু যখন জেলে গেলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র কয়েক মাস । বেশিরভাগ সময় জেলে থাকার কারণে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ তেমন গড়ে উঠেনি । বাবাকে ওর কাছে পাওয়ার সুযোগ হয়নি । বাবাকে কাছে পেলে যেভাবে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেইভাবে তো বাবাকে পায়নি । বুকের ভেতর বাবাকে পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ওইটুকু ছেলের দিন কাটে । খেলাধুলা করে । হাসিনা আব্বা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বা বলে ডাকলে ও তাকিয়ে থাকে। বড় বোনের মতো করে ডাকতে পারে না। কেমন করে ডাকবে? ওর যে ভয় করে। ওর আব্বা ডাকার সাহস হয় না। একদিন তিনি আর রেণু টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে খাটে বসে গল্প করছিলেন। নিচে বসে খেলছিল হাসিনা আর কামাল। হাসিনা খেলা ছেড়ে মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে বাবার কোলে ওঠে। গলা জড়িয়ে ধরে আব্বা, আব্বা বলে ডাকে। বাবা মেয়েকে আদর করে কপালে চুমু দেন। ছোট ভাইটি মেঝেতে বসে দেখে। ওর ভীষণ লোভ হয় ওইভাবে আদর পেতে। শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া ওর আর কিছু করার বয়স হয়নি।

একটু পরে হাসিনা খেলার জায়গায় ফিরে গেলে কামাল বলে, হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা ডাকি।

রেণু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হলে ছেলে তো বাবাকে ভুলবেই। বাবার আদর-সোহাগ কি জিনিস ছেলেটি বুঝতেই পারলো না।

বঙ্গবন্ধু ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আমি তো তোমারও আব্বা মাণিক। ডাকো, তুমি আমাকে আব্বা ডাকো। কতবার ডাকতে পারো দেখি।

অন্যান্যসময় কামাল তাঁর কাছে আসতে চাইত না। সেদিন জড়িয়ে ধরা গলা আর ছাড়তে চায় না। ছোট্ট ছেলেটির আদর কাঙাল ব্যাকুলতা দেখে রেণুর চোখে পানি এসেছিল। ছেলেটির পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, বোকাটার কান্ড দেখ। আহা রে আমার সোনা।

হাসিনা ঘরজুড়ে লাফাতে লাফাতে বলেছিল, আব্বার আদর পাওয়া যে কত মজার এতদিনে তা আমার ছোট্ট ভাইয়া বুঝতে পেরেছে। তারপর সুর করে বলেছিল, আদর নাও ময়না পাখি, আদর নাও। আদর নাও ফিঙে পাখি, আদর নাও। সব আদর মাথায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি যাও।

মেয়ের কান্ড দেখে খুব হেসেছিলেন দুজনে। দুজনেই ভেবেছিলেন, ভাইয়ের অভিমান ঝরিয়ে দিয়েছিল বোনটি। ভাইবোনের সম্পর্কই এমন মধুর।

বঙ্গবন্ধু দৃষ্টি ঘুরিয়ে রেণুর দিকে তাকালেন। দূরে দাঁড়িয়ে দুজনেই বুঝলেন তারা একই কথাই ভাবছিলেন। এই মুহূর্তে ওদের দুই বোন কাছে নেই। তিন ভাই এই বাড়িতে আছে। একজন একতলায় নীথর হয়ে গেছে। দুইজন এই ঘরে অপেক্ষা করছে। রাত্রি অবসানের অপেক্ষা।

ঘরের সবার মুখের উপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বঙ্গবন্ধু আবার রেণুর দিকে তাকালেন। তখনও তিনি তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। ভাবছিলেন বুঝি হয়তো স্বামীর কাছ থেকে কিছু শুনতে পাবেন। কিন্তু ঘরে তখন কোনো শব্দ নেই। রাসেলও নিশ্চুপ হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু রেণুর দৃষ্টি দেখে অবাক হলেন। দৃষ্টি জলে ভেজা নয়। রেণু সাহসে-শক্তিতে দুর্যোগের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। যেভাবে নিজেকে তৈরি করেছেন বিবাহিত জীবনের এতগুলো বছর, রাজনীতিকে ভালোবেসে–মানুষকে ভালোবেসে। মানুষের জন্য ভালোবাসার ছায়া বিছিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখে। বঙ্গবন্ধুর সবকিছুর সঙ্গে থেকেছেন ছায়ার মতো। বঙ্গবন্ধুর আকস্মিকভাবে মনে হয় আসলে রেণুর চোখে এখন প্রবল শূন্যতা। চোখে ভাষা নেই। ভালোবাসার হাহাকার তাকে খামচে ধরে আছে। চিরচেনা রেণু এখন এই ভয়াবহ মুহূর্তের অচেনা রেণু।

তিন বছর বয়সে বিয়ে হলেও আমাদের ফুলশয্যা হয়েছিল তোমার বারো বছর বয়সে, তোমার কি তা মনে আছে রেণু? আমি জানি সেই দিনের কথা তুমি ভুলবে না। আমাকে নিয়ে তোমার যা কিছু সঞ্চয় তা তোমার স্মৃতির সোনার কৌটায় জমা আছে।

সে সময় জামাল এসে মাকে ধরে বিছানায় বসিয়ে দেন।

রেণু যে শক্তির কথা বলেছিলেন, সে শক্তি এখন তার মনে নেই। শরীরও নেতিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ আগে যেভাবে ছুটোছুটি করেছিলেন এখন তাও নেই। ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনের একরাশ বেদনায় ম্রিয়মান।

এক মুহূর্তে সবার বুকের ভেতর সুরের তরঙ্গ বুদ্বুদের ধ্বনি নিয়ে জেগে ওঠে। যেন এই বাড়ির কোথাও বসে কামাল সেতার বাজাচ্ছে। তিনতলায় ওর নিজের ঘরে বসে কি? নাকি বারান্দায়, নাকি নিচতলায় বাবার লাইব্রেরিতে বসে বাজাচ্ছে? কোথায় ও? আজ কোথায় ও সেতার নিয়ে বসেছে? সবাই অনুভব করে প্রত্যেকের বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে মধুমতী নদী। চোখে এসে জমেছে। তারপর পাহাড়ি ঝর্ণার মতো নেমে আসছে প্রবলধারায়।

সুলতানা দু'হাতে মুখ ঢেকে বলে, মাগো!

রাসেল তাঁকে জড়িয়ে ধরে ডাকে, ভাবি।

ওর কণ্ঠস্বর ঘরে গমগম ধ্বনি তোলে। আর কোনো শব্দ নেই। ও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলে, ভাবি কাঁদে না। আপনার গায়ে-হলুদের দিন আমরা খুব মজা করেছিলাম। রঙ খেলেছিলাম। হলুদ আর রঙের মাখামাখিতে খুব সুন্দর হয়ে উঠেছিল বাড়িটা। সিঁড়ির আলপনা খুব সুন্দর হয়েছিল। সোনার ভাবি আমার কাঁদে না।

রোজি ওর মাথায় হাত রাখে।

তখন সিঁড়ির আলপনা বুটের নিচে মাড়িয়ে উঠতে থাকে সেনা অফিসাররা। ওরা সিঁড়ির মাঝ বরাবর উঠতে পারেনি। ওদের হাতে অস্ত্র।

১২.

এই বাড়িতে এখন ভোর-রাতের প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি অনন্তকাল।

সময়ের থেমে থাকা প্রকৃতির সত্য নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসের কালপর্বে সময়কে থামায় মানুষ। কারণ ইতিহাসকে কথা বলতে দেয়ার জন্য সময়কে থামাতে হয়।

এই বাড়িতে এখন যা ঘটছে তা ইতিহাস। এই ইতিহাস রচনা করবে ইতিহাসবিদরা। বলা যায় সময় নিজের প্রয়োজনে থামে। সময়কে দেখতে হয়।

এই বাড়িতে সময় এখন থেমে আছে।

এই সময়ের মধ্যে ঘরে সবাই জড়ো হয়েছে।

দরজা আটকানো। রেণু যতক্ষণ পেরেছেন ছুটোছুটি করেছেন। করিডোর, ডাইনিং স্পেস, অন্যঘরে। কেঁদেছেন। উদভ্রান্ত সময় গড়িয়েছে। তার জীবনের সবচেয়ে উদভ্রান্ত সময়। মাথা সক্রিয় রেখেছেন। আর কি করতে হবে তা ভেবেছেন। কতটুকু করলে কতটুকু সম্পন্ন হয় সে ভাবনা তাঁর আছে।

এই সংসার তার জীবনের সবচেয়ে ধৈর্য্যের সময়। বড় বেশি শান্ত থাকার সময়। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করেছেন। ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন। আত্মীয়স্বজনের দেখাশোনা করেছেন। জেলখানায় স্বামীকে খাবার পাঠিয়েছেন। দলের কর্মীদের সহযোগিতা করেছেন। স্বামীকে দেখবেন বলে ছেলেমেয়েসহ জেলখানায় গিয়েছেন। রাজবন্দী থাকাকালে স্বামীর মামলার খোঁজখবর নিয়েছেন। আর কি? রেণু এই মুহূর্তে হাঁটুর উপর থুতনি রাখেন। ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন না। ছেলেটি এই বাড়ির নিচতলায় মেঝেয় পড়ে আছে। কোথায় গুলি লেগেছে ওর? তিনি নিজেকে সামলালেন। এই কিছুক্ষণ আগে যে মেয়েটি বিধবা হয়েছে তাঁকে বলার মতো আর কোনো কথা তাঁর ভান্ডারে নেই।

এমনই মানুষের জীবন। একসময় ভাষা ফুরিয়ে যায়। কর্ণ বধির হয়ে যায়। একসময় শরীর শীতল হয়ে যায়। একসময় রক্তের স্রোতে ডুবে যায়। এই মুহূর্তে এই বাড়িতে মৃত্যু এমনই নিদারুণ সত্য।

রেণু সবার মুখের দিকে তাকান। রেণু ঘরের চারপাশে তাকান। রেণু এই ঘরে দাঁড়িয়ে-বসে থাকা সবার নাম মনে করতে থাকেন। একসময় তার সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে থাকে টুঙ্গিপাড়ায় কাটানো তার শৈশব-কৈশোর, ভেসে থাকে সবুজ প্রকৃতি। ভেসে থাকে আশ্চর্য মধুর জীবন।

একটু পরে কি হবে তা রেণুর জানা নেই। একটা কিছু যে ঘটবে তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কতটা ভয়াবহ হবে সে আশঙ্কা করতে পারেন না। হঠাৎ করে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। রাসেলের মুখের দিকে তাকান। এই শিশুর কিছু হবে না। ওতো এই পৃথিবীর নিরাপদ মানব-সন্তান। তিনি মনে মনে দোয়া পড়তে থাকেন। আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন যেন সুস্থ থাকে পরিবারের সবাই।

মানুষের জীবনে সময় থেমে যাওয়ার এমনই নিয়ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩.

জামাল রোজীর দিকে তাকান। এক মাসও পূর্ণ হয়নি বিয়ের। এখনও অনেক পথ যাওয়া বাকী। রোজী মুখ নিচু করে আছেন। দু'হাতে সোনার চুড়ি। কানে দুল। বিয়ের আঙটি আঙুলে জ্বলজ্বল করছে। মেহেদীর রঙ মুছে যায়নি। ফিকে হয়েছে মাত্র। ওর মুখ বিবর্ন দেখাচ্ছে। ভীত-সন্ত্রস্ত। এক পলক জামালের দিকে তাকালে ওর মনে হয় জীবনের আয়ু কি এতই স্বল্প! সবে তো নতুন জীবনের দিন শুরু হয়েছে। একটি সবুজ রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছেন তিনি। সঙ্গে কালো রঙের ব্লাউজ। চুল আঁচড়ানো হয়নি। রাতের বেলা বেণী করে যেভাবে শুয়েছিলেন তেমনই আছে। এলোমেলো হয়ে আছে মাথার উপরের চুল।

নিজের ডান হাতের আঙুলের বিয়ের আঙটি বাম হাতের তর্জনি ছুঁয়ে থাকে। জামাল একবার আঙটির দিকে তাকিয়ে সুলতানার দিকে তাকান। তার আঙুলেও বিয়ের আঙটি আছে। দু'হাতে সোনার চুড়ি আছে। কমলা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে আছেন। সঙ্গে একই রঙের ব্লাউজ। হয়তো একটু পরে এই রাত কেটে যাবে তাঁর জীবন থেকে, কিন্তু যে জীবনের শুরু করেছিলেন সেই জীবন আর জোড়া লাগবে না। আজ রাত তার জীবনের সেই পর্ব ঢেকে দিয়েছে। এখনো চলে যায়নি সেনা অফিসাররা। হয়তো বাবাকে ধরে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু শুধু ধরে নেয়ার জন্য এত তোড়জোড় কেন? কতবারইতো বাবাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছেন। তারজন্য এত আয়োজনের দরকার হয়নি, পুলিশই যথেষ্ট ছিল। আজ কি হলো!

জামাল ঘাড় ঘুরিয়ে বাবার দিকে তাকান। চিরচেনা মানুষটি মৃত্যুর মুখে যে পড়েননি তাতো নয়। মৃত্যুকে তাঁর ভয় নেই। আজও তিনি অস্ত্রের সামনে যাবেন। নিজের বুক পেতে দিয়ে বলবেন, এটাই আমার শেষ সম্বল। তোমরা চাইলে নিয়ে চলে যাও। শুধু শুধু ভয় দেখিও না। তোমাদের ভয়ে আমি কাতর নই। তিনি এখন চিন্তান্বিত। কারণ তিনি জানেন তিনি শুধু পরিবারের একজন নন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় অনেকবার বলেছেন, আমি যেদিন শুনলাম, আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, সে দিনটিই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন। ব্যক্তিগত সুখের উর্ধে ছিল তাঁর সুখের চিন্তা। দেশ আর মানুষ ছিল তাঁর পরিবারের চেয়ে বেশি। তারপরও আজকে তাঁকে কি মূল্য দিতে হবে কে জানে! এই মুহূর্তে তিনি চেক লুঙি আর পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে চশমা আছে। মুখে পাইপ। তিনি ঘনঘন পাইপ টানছেন। ভুরু কুঁচকে আছে। কপালে চিন্তার রেখা।

জামাল বাবার দিক থেকে দৃষ্টি ঘোরান। দৃষ্টি পুরো ঘর ঘুরে আবার রোজীর উপর পড়ে। শৈশব থেকে দেখা এই ফুফাতো বোন–। না, স্মৃতির দরজা আর খুলবেন না। সব মানুষের জীবনে হাজার স্মৃতির সঞ্চয় থাকে। স্মৃতি ধরে রাখে জীবনের অনেকখানি।

মুহূর্তে জামাল রোজীর দিকে তাকান। রোজী তখনও মাথা নুইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছেন। যেন পৃথিবীর কোনো কিছু আর তিনি দেখবেন না বলে ঠিক করেছেন। নাকি বুকের ভেতরে তার স্মৃতির খুনসুটি শুরু হয়েছে? জামাল বিপন্ন বোধ করেন। ভাবেন এ সময় তাঁরও দরকার স্মৃতির ভেতরে চলে যাওয়া।

একদিন জামাল রোজীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার প্রিয় পেইন্টার কে?

রোজী এক মুহূর্ত ভেবে বলেছিলেন, জয়নুল আবেদীন। আর যদি বিদেশের কোনো শিল্পীর কথা বলো, তাহলে বলবো পাবলো পিকাসো।

বাহ, তুমি তো দেখছি বেশ স্মার্ট উত্তর দিয়েছ। তারপর জামাল হাসতে হাসতে বলেছিলেন, মেয়েদের মামারবাড়ি শ্বশুরবাড়ি হয়ে গেলে মেয়েরা খুব স্মার্ট হয়ে যায়। রাতারাতি হয়ে যায় বলা যাবে।

দেখো নিজে নিজে ক্রেডিট নেবে না কিন্তু। আমি মোটেই শ্বশুরবাড়িতে এসে শিখিনি। হাতে গুনলে আমার শ্বশুরবাড়িতে আসার মোট দিন হয়েছে নয় দিন। এ কয়দিন নিশ্চয় তুমি আমাকে বেশি কিছু শেখাতে পারোনি। আমি লেখাপড়া করেই শিখেছি।

ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না।

পারবে কেন? তুমি চাকরি করছো আর্মিতে। অস্ত্র ধরতে শিখেছো। কতটুকু ভালো পারো তা এখন বলা যাবে না।

আমি যে গিটার বাজাতে পারি তা বলবে না?

যেদিন মন ভরে শুনবো সেদিন বলবো যে খুব ভালো বাজিয়েছ।

আচ্ছা ঠিক আছে রাজি। চেষ্টা করেছি আমি তোমাকে জয়নুল আবেদীনের একটি পোর্টেট এনে দেব। আমাদের শোবার ঘরে টাঙাবে। আর তার দিকে তাকিয়ে ভাববে, এমন একটি সন্তানের জন্ম দেব, যার শিল্পকর্ম তোলপাড় তুলবে বাংলাদেশে। আমি হব তার গর্বিত মা।

হয়েছে, হয়েছে থাম। বেশি বললে আনন্দ মাটি হবে।

দুজনের হাসি– আনন্দে কল্লোলিত হয়েছিল এই বাড়ির একটি ঘর।

এখন ওদের সামনে অন্যরকম সময়। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে ওরা। প্রতিটি মুহূর্ত ভূমিকম্পের মতো কাঁপিয়ে দিচ্ছে চারদিক।

জামাল মায়ের পাশে বসে রোজীর দিকে তাকান। রোজী তাঁর দিকে তাকান না। রোজীর ভীষণ ভয় করছে। কি হবে এই বাড়িতে? কেন ওরা এত উন্মত্ত হয়েছে? রোজী দীর্ঘদেহী মামার দিকে তাকিয়ে থাকেন। শৈশবের সময় থেকে এই মামাকে কত হাজার হাজার বার দেখেছেন। মামার বুকভরা আদর পেয়েছেন। কোলে চড়েছেন। এখন এই মামাকে ওর একজন বীরের মতো লাগছে। ইতিহাসের একজন বীর। যার সাহসে-শক্তিতে সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। পরাজিত শত্রুরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। এখন তো এখানে কোনো সমনা-সামনি যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ তো একপক্ষ করছে। তাহলে কি এটা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ? নিশ্চয়ই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নিজেই সিদ্ধান্তে আসেন। ওরা ঘাতক। একতরফা আক্রমন করছে। এখন বাইরে গুলির শব্দ নাই। তারপরও বুকের ভেতর খামচে ধরে ধারালো নখ। দানবের নখ।

শুনতে পান রাসেলের কণ্ঠ। চমকে ওঠেন রোজী।

জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিছু বলছো ভাইয়া?

আমি সন্ধ্যায় কোক খেতে চেয়েছিলাম।

হ্যাঁ, তোমার জন্য তো কোক আনা হয়েছিল।

কই সেটা? আমি তো পরে খাইনি। আমার মনে ছিল না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কোকটা রান্নাঘরে আছে।

তাহলে আমার আর কোক খাওয়া হবে না?

কেন হবে না, নিশ্চয় হবে। কাল সকালে খেও।

যখন এই বাড়ি থেকে শয়তানগুলো চলে যাবে তখন খাবো। তুমিও আমার সঙ্গে খাবে কিন্তু ভাবি।

হাঁ, আমি তোমার গ্লাস থেকে এক চুমুক খাব।

বড় ভাবি কাঁদছে কেন? বড় ভাইয়া যে এই ঘরে নেই সেজন্য?

রোজী কথা বলেন না। এবার সরাসরি জামালের দিকে তাকান। দেখতে পান জামাল তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। আজকের এই অসম্ভব মুহূর্তে দু'জনের চোখে কোনো ভাষা নেই। চোখের যে ভাষায় প্রেম, আনন্দ, বেদনা, কষ্টের প্রকাশ থাকে, সে চোখের ভাষা আজ এই থমথমে বাড়িতে নেই। প্রবল শূন্যতার হাহাকার চোখের ভাষাকে খেঁতলে দিয়েছে।

দুজনের কানে এসে আছড়ে পড়ে সিঁড়িতে বুটের শব্দ। ওরা উপরে উঠছে।

ওরা দুজনেই বুঝতে পারেন যে, এই বাড়িতে এই মুহূর্তে মৃত্যুই সত্য।

বুটের শব্দ সে কথাই প্রকাশ করে।

নিচতলায় নীথর পড়ে থাকা এ বাড়ির বড় ছেলের লাশ এমন জানানইতো দিচ্ছে। এর বিপরীতে আর কিছু ভাবার ওদের কোনো অবকাশই নাই। তারা বিমূঢ় হয়ে থাকেন। ভুলে যান যে মাত্র উনত্রিশ দিন আগে তাঁদের বিয়ে হয়েছে। তাঁরা হানিমুনে যাননি। তাঁদের জীবন থেকে উৎসবের রেশ ফুরোয়নি। সিঁড়ির আলপনা মুছে যায়নি।

এখন তাঁদের সামনে মৃত্যুর সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪.

আমি দফাদার আবদুল জব্বার মৃধা। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

14. Dafadar Abdul Zabbar Mridha. (Rtd.)
P. W. -14

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৪৮ বয়স্ক দফাদার আব্দুল জব্বার মৃধা (অবঃ)-র জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৬/৯ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– দফাদার আব্দুল জব্বার মৃধা (অবঃ), বয়স– অনুমান ৪৮ বৎসর, আমার পিতার নাম– মৃত মোজাফ্ফর আলী মৃধা, গ্রাম– রাজনগর, থানা– বাহুবল, জেলা– পটুয়াখালী। বর্তমানে উত্তর বাড্ডায় থাকি।

আমি একজন আর্মার্ড কোরের অবসর প্রাপ্ত সৈনিক। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৩ ক্যাভেলিরিতে চাকুরি করিয়াছি।

১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারিতে ২ মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসি। বাড়ি আসিয়া ৯নং সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধ শেষে আমি ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সারে যোগদান করি।

১৯৭৫ সনে আমি এল.ডি. ছিলাম। ঐ সনের ১৪ই আগস্ট আমাদের সিও মেজর মোমিন সাহেব ছুটিতে ছিলেন। তখন মেজর ফারুক সাহেব সিওর দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সনের ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাতে আমাদের নাইট প্যারেড ছিল। অনুমান রাত ৮টার দিকে আমাদের প্যারেড শুরু হয়। অনুমান রাত্র ২.৩০ টার সময় নাইট প্যারেড শেষ হইলে আমরা লাইনে গিয়া পোশাক পাল্টাইতে ছিলাম। এমন সময় পুনরায় ফল-ইন হওয়ার বাঁশি শুনিতে পাই। তখন আমরা ফল-ইন-এর জন্য পুনরায় প্যারেড গ্রাউন্ডে আসিয়া দেখি মেজর ফারুক, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর আহমদ শরিফুল হোসেন, লেফটেন্যান্ট কিশমত, লেফটেন্যান্ট নজরুল হোসেন আনসারকে দেখিতে পাই। সেখানে সিভিল পোশাক পরিহিত আরও কয়েকজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিতে পাই। তাহাদের পাশে টু-ফিল্ড আর্টিলারি সিও মেজর রশিদ সাহেবসহ ঐ ইউনিটের আরও কয়েকজন অফিসারকে দেখিতে পাই। মেজর ফারুক সাহেব আমাদিগকে by mark ফল-ইন হওয়ার নির্দেশ দিয়া বলিলেন, আপনাদেরকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে পুনরায় ফল-ইন করা হইয়াছে। তারপর সিভিল পোশাক পরিহিত লোকদের লক্ষ করিয়া বলেন, ইহারা আর্মির লোক, আরো বলেন, ইনি মেজর ডালিম, ইনি মেজর শাহরিয়ার। অন্যান্যদের নাম আমার স্মরণ নাই। মেজর ফারুক বলেন, উনারা আমাদের সাথে কাজ করিবেন। উনারা যা নির্দেশ দেয় সেইমতে কাজ করিবেন। কেহ গাফিলতি করিলে বরদাস্ত করা হইবে না। আমাদের ট্যাংকগুলি কোথায় যাইবে তাহা ট্যাংক কমান্ডারগণ জানিবেন। এই বলিয়া আধা ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হইয়া মুভ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আমি একটি স্টেনগান নিই। ট্যাংকের কোন গোলা ছিল না। আমি যে ট্যাংকে ছিলাম ঐ ট্যাংকের কমান্ডার ছিলেন মেজর শরীফুল হোসেন এবং গানার ছিলেন দফাদার হালিম তরফদার।

নির্ধারিত নাইট প্যারেডে সবাই উপস্থিত থাকার কথা। আমার ইউনিটে মনে হয় ৩২টা ট্যাংক ছিল। ৩২ জন কমান্ডারও ছিল। কয়েকজনের নাম বলিতে পারিব। আমি ৪টা ট্যাংক বাহির হইতে দেখি। অন্যগুলি বাহির হয় কিনা জানি না।

অনুমান ৪টার সময় মেজর ফারুক ট্যাংকগুলি মুভ করানোর নির্দেশ দেন। মেজর ফারুক নিজেও একটি ট্যাংকের কমান্ডার ছিলেন। তাহার পাশে অপর একটি ট্যাংকের কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কিশমত সাহেব। আমাদের পাশের ট্যাংক কমান্ডার ছিলেন লেফটেন্যান্ট নাজমুল হোসেন আনসার। ট্যাংকগুলি একই সময় যাত্রা করে। আমাদের ট্যাংক কমান্ডার মেজর শরীফুল হোসেন নির্দেশ দিলেন যে, আমাদের ট্যাংক সরাসরি বাংলাদেশ রেডিও স্টেশনে যাইবে। ট্যাংকগুলি বালুঘাট হইতে ক্যান্টনমেন্ট পুরাতন রেল স্টেশন হইয়া মহাখালী দিয়া ৩য় গেইট হইয়া বাংলাদেশ রেডিও স্টেশনে আসে। আমাদের পাশের ট্যাংক যেটায় নাজমুল হোসেন সাহেব ছিলেন সেটা গেল পুরাতন রেসকোর্স মোড়ে। সেখানে অবস্থান নেয়।

ট্যাংক বাহির হওয়ার বৈধ অনুমতি ছিল কিনা তাহা চেক পোস্টে পরীক্ষা করা হয় নাই। ক্যান্টনমেন্ট হইতে ট্যাংক বাহির হওয়ার পথে চেক পোস্ট ছিল। ঘটনার রাত্রে আমি স্টেনগান ও এমিউনিশন নিয়াছি। আমি স্টেনগানের ৫২ রাউন্ড গুলি লইয়াছি। ঘটনার সময় আমি কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলি ব্যবহার করি নাই। আমরা পাঁচ জন একটি ট্যাংকে ছিলাম। আমাদের ট্যাংকটিই প্রথম রেডিও স্টেশনে যায়। আমাদের ট্যাংক কমান্ডারের নির্দেশে রেডিও স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করি। রেডিও স্টেশনের দারোয়ান ইউনিফর্ম পরা ছিল। কিন্তু হাতে অস্ত্র দেখি নাই। ঐ দিন রেডিও স্টেশনে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা ছিল কিনা জানি না।

১৫ই আগস্ট মেজর ডালিম সাহেব সেনাবাহিনীর কোন ইউনিটের অফিসার ছিলেন তাহা আমার জানা নাই। মেজর ডালিম সাহেব কখনও আমার ইউনিটের অফিসার ছিলেন না। ঘটনার দিন ভোর রাত্রে যখন বলা হইল, 'কিছু সিভিলিয়ান লোক আমাদের সাথে কাজ করিবে এবং তাহাদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিবে', তখন আমি ইহার কোনো কারণ জিজ্ঞাসা করি নাই।

আমাদের ট্যাংক হইতে মেজর শরীফুল হোসেন নামিয়া রেডিও স্টেশনের দারোয়ানকে বলিল, আমরা আর্মির লোক যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকিবেন। অনুমান ভোর সাড়ে পাঁচটায় মেজর ডালিম একটি খোলা জিপে রেডিও স্টেশনে আসেন এবং ওই খোলা জিপে মেশিনগান ধারণ অবস্থায় একজন সিপাই ছিল। মেজর ডালিম সাহেব মেজর শরীফুল হোসেনের সহিত কিছু আলাপ করিয়া রেডিও স্টেশনের ভিতরে ঢুকেন। অনুমান পাঁচ-সাত মিনিট পরে মেজর শাহরিয়ারও ভিতরে ঢুকেন। অনুমান আধঘন্টা রেডিও স্টেশনের ভিতরে থাকিয়া তাহারা বাহির হইয়া যান।

কিছুক্ষণ পরে কিছু সংখ্যক ফোর্স নিয়া মেজর ফারুক, মেজর খন্দকার রশীদ রেডিও স্টেশনে ঢুকে। আরও কিছুক্ষণ পর আর্মি ও সিভিল গাড়িতে করিয়া কিছু সিভিল ও আর্মির অফিসার রেডিও স্টেশনে যাতায়াত করে। তাহারা রেডিও স্টেশনে ঢুকার সময় মেজর শরীফুল হোসেন তাহাদেরকে চেক করেন।

তখন পথচারীর বলাবলিতে শুনিতে পাই যে, রেডিওতে প্রচার হইতেছে, আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে।

১৫.

কখনো ইতিহাস থমকে দাঁড়ায়। মহাকালের সচল প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখেই দাঁড়ায়। কারণ সময় সেইসব মানুষকে অভিবাদন জানায়, যারা ইতিহাসের সমতলে হেঁটে গিয়ে মুঠি ভরে শস্যদানা তুলতে পারে। সেই শস্যদানায় ভরে ওঠে সময়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলা। হাজার বছর ধরে সেইসব সমৃদ্ধ গোলা স্মরণের ইতিহাস ভরে রাখে আগামী দিনের মানুষের জন্য। সেসব পৃষ্ঠা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। যারা নরপিশাচের ভূমিকায় থাকে তারাও টিকে থাকে সেই মহামানবদের সঙ্গে আস্তাকুঁড়ের কীট হয়ে। তাদের মুখমণ্ডলে নরকের ছায়া দেখে জীবিত মানুষেরা ভাবে বেঁচে থাকার কালেই নরক দেখা হলো। ইতিহাসের এখন তেমন সময়।

তিনি বাংলার রাজনীতির চিরায়ত ধ্রুপদী কাব্যকলার একলব্য। তাঁকে কে পরাজিত করবে? তাঁর নামে বাঙালির ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে–ভালোবাসায়, মর্যাদায়, বেদনায়, দ্রোহে, প্রতিরোধে, মুক্তিযুদ্ধে, অবিনাশী সময়ের ভুবনের সঙ্গীতে, শিল্পে, সাহিত্যে সৃজনশীলতার অনুপুঙ্খ বিবরণে। তিনি জন্ম নিয়েছেন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের শেষ ইউনিয়ন। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মধুমতী নদী।

তিনি বাংলার তিনশত নদী দেখেছেন। খালি চোখে নয়, দেখেছেন হৃদয়ের চোখ দিয়ে। তিনি নদীর দু'পাড় দেখেছেন। দু'পাড়ের মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করেছেন, ভালো আছেন তো আপনারা? বাংলার দুঃখী মানুষের কুঁড়েঘরে কে আর এমন করে ঘুরেছেন? তাঁর বজ্রকণ্ঠের মমতার স্বর ধ্বনিত হলে চারদিক থেকে ছুটে আসে মানুষ। আর কে এমন করে তাদের জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন?

তারপরও তিনি বলেন, এমন আর কি করেছি যে যা নিয়ে আত্মজীবনী লেখা যায়? গণমানুষের কি কাজে লাগবে আমার ঘটনা? আমি তো সামান্য একটু কাজ করেছি। সামান্য। নীতি আর আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছি। আপোস করিনি।

তারপরও রেণু আমাকে বলেছিলেন, লেখ। নিজের কথা লেখ।

রেণু আমার কথা লিখে কি হবে? কে পড়বে আমার কথা? ধুত, তুমি এমন ভাবনা ছাড়।

রেণু মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এমন ভাবনা আমি একদমই ছাড়ব না। অনেক লোক তোমার লেখা পড়বে। দেখবে তোমার লেখা সময়ের কথা হবে। দেশের কথা হবে। মানুষ এই বই থেকে অনেক কিছু জানবে। তুমি লেখো। দোহাই লাগে লেখো। মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টাই তো তোমার বড় কাজ।

বঙ্গবন্ধু রেণুর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকেন। তিনি এমন করে সেদিন বলেছিলেন যেন আমার দেখা সময় তারও দেখা। তাঁর ব্যাকুলতায় আমি বুকের ভেতর নাড়া অনুভব করি। তারপরও লিখব কিন ভাবতে পারছিলাম না।

রেণু তাঁর সঙ্গে একমত হননি। লেখার জন্য কয়েকটি খাতা কিনে জেলগেটে জমা দিয়েছেন। যথাসময়ে খাতা তাঁর কাছে এসেছিল। এভাবেই রেণু তাঁর জীবনসঙ্গী–বোধে- ভালোবাসায় কষ্টে-সুখ-দুঃখের সবকিছুতে। সংসারের কত শত কাজ করার পরেও তাঁর দিকে রেণুর মনোযোগের কমতি নেই। সেখানে পান থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুণ খসে না। রেণু জানতেন বঙ্গবন্ধুর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত। সামরিক শাসক তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করেছে। তাঁরা জানতেন কঠিন শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে বিচারের রায় তাদের ইচ্ছেমাফিক হবে। তখন জেলের কুঠুরিতে বসে তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হবে। সামনে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে। বাহ, জীবনতো এমনই। একজন রাজনীতির নেতার জীবন। মৃত্যুকে মাথায় রেখে জীবনের জলছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে এই খাতার পৃষ্ঠায়। বঙ্গবন্ধু ভাবেন, এই কাজটি তাঁর করাই দরকার। এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসের পৃষ্ঠা তাঁকে বাদ দিয়ে রচিত হবে না। তাঁর লেখনীতে থাকুক ইতিহাসের উপাদান। ভবিষ্যতের মানুষের কাজে লাগবে। রেণু তো ঠিকই বুঝেছেন।

তখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন ঢাকা জেলের ছোট্ট কোঠায়। সন্ধ্যা হলে জমাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। বাইরে বের হওয়ার পথ বন্ধ। পথ তখন বাকী থাকে নিজের ভেতরে ঢোকার। সে পথেই তিনি নিজ পরাণের গহীনে প্রবেশ করেন। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে খুঁজতে থাকেন। তিনি জানালা দিয়ে আকাশ দেখেন। কখনো পূর্ণিমা, কখনো অমাবস্যা থাকে। বাইরের বড় নিম গাছটির দিকে তাকান। আলো-আঁধারীতে গাছটির ভিন্ন ছবি দেখা যায়। দিনের আলোর চকমকে ভাব নেই, কিন্তু স্নিগ্ধতা আছে। গাছ এবং চাঁদের এক হয়ে যাওয়াকে তিনি সময়ের ভিন্ন ক্ষণ মনে করেন। আবার আকাশপানে দেখেন। বিছানার উপরে রাখা আছে নতুন খাতা কয়টি। আকাশ পথে তাঁর সামনে রেণুর মুখ ভেসে থাকে, যেন আর একটি নতুন চাঁদ সে মুখ। যতবারই দেখা হয় না কেন মনে হয় নতুন করে দেখা হলো। জীবন-মৃত্যুর বিশাল সময় তাঁর সামনে। দুজনের অনেক পথ হাঁটা হয়েছে এমনটি বলা যাবে না। আরও অনেক পথ যেতে হবে। রেণু নিরাশ হন না। ধৈর্য দিয়ে সময়কে মোকাবেলা করে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে জেলখানায় আসেন। ফেরার সময় বাবাকে ছেড়ে যেতে চাইত না রাসেল। খুব কাঁদতো। কাঁদতে কাঁদতে বলতো, জেলখানা আব্বার বাড়ি। মায়ের সঙ্গে আমরা যেখানে থাকি সেটা আমার বাড়ি। আব্বা একদিন আমার বাড়িতে বেড়াতে আসবে।

শিশুরা এভাবেই ভাবে। তিনি নিজেকে বুঝ দেন। আর জেলের কুঠুরিতে গার্ডের তালা লাগানোর ঝনঝন শব্দ শুনে তিনি ধানমন্ডির বাড়ির কথা ভাবেন। সেখানে তার পুরো পরিবার আছে। বাবা-মা-ভাইবোন-আত্মীয়স্বজনের ওম-ভরা গৃহ আছে। শুধু জেলের নিরানন্দ কুঠুরি থেকে একটুকরো আকাশ পুরো দেশের সমান হয়ে যায়। আকাশের জ্বলজ্বলে হাজার নক্ষত্র মানুষের মুখ হয়ে ভেসে ওঠে।

একদিন তিনি লেখা শুরু করেন। কখনো কলম বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে বসে থাকেন। ভাবনা আসে মনে– কি আর এমন করেছি? আমার পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য ছয় দফা দাবি পেশ করেছি। আমার বিরুদ্ধে এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।' সামরিক সরকারের অধীনে বিচার চলবে। ওরা আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে। যা খুশি করুক। আমি ভয় পাই না।

এই সাহসী মানুষের কথা পৌঁছে যায় দূর দেশের মানুষের কাছে। কিউবার বিপ্লবী ফিদেল কাস্ত্রো বলেন, আমি হিমালয় দেখিনি। শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখেছি। হিমালয়ের সমান উচ্চতায় তাঁর বীরত্ব ও সাহস।

দেশের নেতা মওলানা ভাসানী বলেন, আমার পনেরো-ষোল জন সেক্রেটারি ছিলেন, যার মধ্যে মুজিবই সেরা।

ভয়াবহ সময়ের এই মুহূর্তে রেণুর দিকে তাকান তিনি। দেখতে পান রেণুর দৃষ্টিতে ভয় নেই। জল তো নেই। এই মুহূর্তে তিনি রেণুকে নিয়ে নতুন কিছু ভাবতে পারছেন না। রেণু যেমন ছিলেন তেমনই আছেন এই মুহূর্তেও। তাঁর চেয়ে বেশি কে আর রেণুকে চেনে? রেণু যেমন পরিবারে তেমন রাজনীতিতে। রেণুর চোখে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। রেণু সে দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরায় না।

তাকিয়েই থাকেন। এই ঘরের প্রত্যেক মানুষের ওপর এখন তাঁর দৃষ্টি নাই। রেণু এখন বঙ্গবন্ধুকে দেখছেন। ভাবছেন তিনি হয়তো একটা কিছু বলবেন। জেলে যাওয়ার আগে যেমন বলতেন তেমন একটা কিছু। যেমন একবার বলেছিলেন, পুলিশ আমাকে পেলেই গ্রেফতার করবে। তাছাড়া আমি পালিয়ে বেড়াতে চাই না। তোমাদের সাথে আবার কবে দেখা হবে জানি না। তুমি ঢাকায় এসো না রেণু। ছেলেমেয়েদের কষ্ট হবে। ওদের কষ্ট হোক এটা আমি চাই না। যতদিন তুমি একা ছিলে তখন একরকম কেটেছিল। এখন আর সেইভাবে কাটানো যাবে না। এখন আমাদের একটি মেয়ে একটি ছেলে আছে। আমাদের সংসার বড় হয়েছে রেণু। আমার দুই বাচ্চার কথা ভাবলে তোমার অন্য কোথাও থাকা ভালো লাগে না। ওদের নিয়ে তুমি আব্বা-আম্মার কাছে থাকবে। তাহলে আমি নিশ্চিত থাকব। আমি তোমাকে টাকা-পয়সা দিতে পারব না রেণু। তোমাকেই চালাতে হবে। ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকতে মন চায়না। কিন্তু আমি দেশ সেবায় নেমেছি। আমাকে তো যেতেই হবে। তাছাড়া আত্মীয়ের বাসায় থাকা আমার পছন্দ না। ওদেরকে কষ্ট দেয়া হবে। মেজো বোনের বাড়িটা ছোট। তুমি বাড়িতে থাক। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে রেণু। আমিও তোমাকে লিখব।

বঙ্গবন্ধু দেখলেন রেণুর ঠোঁট কাঁপছে। যেন কিছু বলতে চাইছে। রেণু কি বলতে চায় এবার তোমাকে ধরে নিয়ে গেলে তুমি কি আমাকে চিঠি লিখবে? আমিই বা তোমাকে কোন ঠিকানায় চিঠি লিখব? একবার বলো তোমার ঠিকানা কোথায় হবে? কোথায় থাকবে তুমি?

বঙ্গবন্ধু দেখতে পান রেণু ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। রেণু কি আর কথা বলবে না? তিনি কি জিজ্ঞেস করবে না যে আমাকে কোন ঠিকানায় চিঠি লিখবে? বোধহয় না। বঙ্গবন্ধুর মনে হয় তাঁর কাছে রেণুর জিজ্ঞাসা ফুরিয়ে গেছে। রেণুর আর জানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বাকি নেই। তাঁর মতো একজন জীবনসঙ্গী তিনি পেয়েছেন, যে তাঁকে গভীরভাবে বোঝে। রেণুর বুকের ভেতরেও তো এই একই ভাবনা।

তিনি কি রেণুকে কম বোঝেন! নিজেদের বোঝাপড়ায় তো কোনো ফাঁক ছিল না। না-পাওয়ার কষ্ট ছিল। সেটা একরকম দুঃখবোধ দুজনে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন।

দুজনেই বোঝেন যে চিঠি লেখার দরকার তাদের জীবনে আর কোনোদিন হবে না। দুজনের বুকের ভেতর বেদনার মধুমতী প্রবল স্রোতে বইতে থাকে।

১৬.

আমার নাম সিরাজুল হক। আমি এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

12. A. L. D. Shirajul Haque (Suspend)
P. W. -12

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

AMARBOI.COM

আন্দাজি– ৪৬ বৎসর এ. এল. ডি. সিরাজুল হক (বরখাস্ত)-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ৯/৯ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– দফাদার আব্দুল জব্বার মৃধা (অবঃ), বয়স– ৪৬ বৎসর, আমার পিতার নাম– আনোয়ারুল হক মিয়া, গ্রাম– টুমচর, থানা– হিজলা, জেলা– বরিশাল। বর্তমানে আমি বরিশালে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কেরাণী হিসাবে কাজ করি।

আমি ১৯৬৯ সনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আরমার হিসাবে ভর্তি হই। ট্রেনিংয়ের পরে কোয়েটা ৩৩ কেভিলারিতে যোগদান করি। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে ২ মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসি। ১৯৭১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা ট্রানজিট ক্যাম্পে হাজিরা দেই। মার্চ মাসে ঢাকা-করাচি ফ্লাইট বন্ধ হইয়া যাওয়াতে আমার পশ্চিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানে যাওয়া হয় নাই। তখন দেশের বাড়িতে চলিয়া যাই এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সারে যোগদান করি। তখন আমাদের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান। ১৯৭৩-৭৪ সনে পাকিস্তান থেকে রিপ্যাট্রিয়েটেড হইয়া অফিসার জে সি ও, এন সি ও আমাদের ফার্স্ট ল্যান্সারে যোগদান করে। মেজর মমিন সাহেব সিনিয়র অফিসার হওয়ায় তিনি কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আমাদের ইউনিটে ৪টি স্কোয়াড্রন ছিল। আমি এ. এল. ডি. হিসাবে অ্যাকটিং দফাদারের দায়িত্ব পালন করি। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে আমাদের কমান্ডিং অফিসার মেজর মমিন সাহেব ছুটিতে থাকায় মেজর ফারুক রহমান ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। আমাদের ইউনিটে মাসে দুইবার নাইট প্যারেড হইত। নাইট প্যারেড সন্ধ্যায় আরম্ভ হইত রাত্র ১০/১১ টায় শেষ হইত। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট বেলা ২ ঘটিকার সময় আমাদের হেড কোয়ার্টারে এস, ডি, এম, স্কোয়াড্রন দফাদার মেজর বশির আহাম্মদ আমাদের জানান, আজকে রাত ৯ ঘটিকার সময় নাইট প্যারেড হইবে। এই বলিয়া আমাদেরকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আমরা Kote হইতে অস্ত্র লইয়া তৈরি থাকি, রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকার সময় রেজিমেন্ট দফাদার মেজর মোসাদ্দেক অথবা আশেক বাঁশি বাজাইলে আমরা প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হই। রেজিমেন্ট দফাদার আমাদেরকে ফল-ইন করাইয়া (Asst. Adjudent) মেজর নায়েক রিসালদার আবদুল মালেকের নিকট প্যারেড হস্তান্তর করেন। নায়েক রিসালদার মালেক সাহেব রিসালদার মেজর সাঈদ সাহেবের নিকট প্যারেড হস্তান্তর করেন। রিসালদার মেজর সাঈদ সাহেব অ্যাডজুটেন্টের নিকট (নাম স্মরণ নাই) প্যারেড হস্তান্তর করেন। অ্যাডজুটেন্ট মেজর মহিউদ্দিন সাহেবের নিকট প্যারেড হস্তান্তর করেন। মেজর মহিউদ্দিন সাহেব ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার মেজর ফারুক সাহেবের নিকট প্যারেড হস্তান্তর করেন।

মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান আমাদের প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং আর.ডি.এম.-কে নাইট ক্লাস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। আর. ডি. এম. আমাদেরকে তিন গ্রুপে যথা ড্রাইভার, গানার, অপারেটর এই তিন গ্রুপে ভাগ করিলেন। আমি অপারেটর গ্রুপে ছিলাম। অপারেটর এবং গানার গ্রুপকে ইউনিটের ভিতরে শেডে ক্লাস নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আমি অপারেটর হিসাবে অপারেটর ক্লাসে যোগদান করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ইনস্ট্রাকটার ছিলেন রিসালদার মোবারক সাহেব। রাত অনুমান ১২টা পর্যন্ত ক্লাস করি। অনুমান ১২টার দিকে আর. ডি. এম. বাঁশি বাজাইয়া আমাদেরকে ২০ মিনিটের বিরতি দেন। বিরতির পর পুনরায় ক্লাসে যোগদান করি। অনুমান রাত ৩.৩০টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। ৩.৩০টার সময় আর. ডি. এম. পুনরায় বাঁশি বাজাইলে আমরা ফল-ইন হই। তখন প্যারেড গ্রাউন্ডে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর শরীফুল আহাম্মদ হোসেন, লেফটেন্যান্ট কিশমত হাশেম, লেফটেন্যান্ট নাজমুল হোসেন আনসার, জে.সি.ও.দেরকে নিয়া প্যারেড গ্রাউন্ডে এক পাশে গিয়া কিছু আলাপ-আলোচনা করেন। পরে আমাদের সামনে আসেন। তখন তাহাদের সঙ্গে ইউনিফরম পরা তিনজন অপরিচিত অফিসারকে দেখিতে পাই। মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ঐ তিনজন অফিসারকে আমাদের নিকট মেজর ডালিম, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকে (আর একজনের নাম স্মরণ নাই) পরিচয় করাইয়া দেন। মেজর ফারুক রহমান ব্রিফিং করিয়া বলেন, আগামীকাল ১৫ই আগস্ট ইউনিভারসিটিতে মিটিং হইবে। সেই মিটিংয়ে রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হইবে। শেখ মুজিবুর রহমান রাজতন্ত্র ঘোষণা করিবেন। আমরা রাজতন্ত্র সমর্থন করি না। এখন আমি যাহা বলিব এবং আমার অফিসারগণ যাহা বলিবে তাহা তোমরা সকলে শুনিবে।

ইহার পর মেজর ফারুক রহমান হুকুম করিলেন Kote এমিউনিশন নেওয়ার জন্য। আমরা Kote -এ যাইয়া এমিউনিশন নেই। তারপর প্যারেড গ্রাউন্ডে চলিয়া আসি। আমার নিকট ৩০৩ রাইফেল ছিল। আমি দুই ম্যাগাজিন এমিউনিশন নেই। মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) সাহেব আমাদেরকে গাড়িতে উঠার নির্দেশ দিলেন। আমাদের পাশে ৪টি ট্রাক গাড়ি ছিল। আমরা তিনটি সেকশন (এক সেকশনে/দলে ১১ জন করিয়া) একটি ট্রাকে উঠি। বাকিরা অন্যান্য ট্রাকে উঠে। গাড়িতে উঠার পরে দেখিতে পাইলাম আমাদের ইউনিটের ভিতর থাকা ইউনিফরম পরা দুই ট্রাক ভর্তি সৈনিক আসে। গাড়িতে বসিয়া জানিতে পারিলাম তাহারা আর্টিলারির লোক। ওরা আমাদের সাথে যাইবে। রাত অনুমান ৪.৩০টার সময় আমরা ৬ ট্রাক একত্রিত হইয়া বালুরঘাট হইতে পুরাতন ক্যান্টনমেন্ট রেল ক্রসিং হইয়া মহাখালী রোড দিয়া ফারমগেইটে আসি। ফারমগেইট হইতে মিরপুর রোড ধরিয়া ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং রোডের মুখে আসিয়া আমাদের ট্রাক থামে। আমি যে ট্রাকে ছিলাম সেই ট্রাকের সামনের সিটে মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) ছিলেন। ট্রাক আসার পর মেজর মহিউদ্দিন আমাদিগকে গাড়ি হইতে নামার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশ দিলেন। আমরা গাড়ি হইতে নামিলে তিনি আমাদিগকে ব্রিফিং করিলেন। ভিতরে গুলির আওয়াজ শুনিলে তোমাদের কোনো ভয় নাই। ঐখানে আমাদের লোক ও মেজর ডালিমের লোক আছে। তোমরা কোনো গাড়ি বা লোককে ৩২ নং রোডের ভিতরে ঢুকিতে দিবা না। (এখন ৩২ নং রোডের কথা উল্লেখ করায় সৈয়দ ফারুক রহমানের বিজ্ঞ আইনজীবী আপত্তি দেন–কিন্তু সাক্ষী এই কথা নিজে থেকে বলিয়াছে)।

ইহার পর আমাদিগকে মিরপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ডিউটিতে রাখিয়া কয়েকজন সৈন্য নিয়া মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) ৩২ নং রোডের ভিতর চলিয়া যান। কিছুক্ষণ পরেই গুলির আওয়াজ শুনিতে পাই। একই সময় আর্টিলারির ৩/৪টা শেলের আওয়াজও শুনিতে পাই। কিছুক্ষণ পরে মেজর মহিউদ্দিন সাহেব পুনরায় আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের মধ্যে হইতে কিছু সৈন্য মিরপুর রোডের পূর্ব পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া কারফিউ জারি করিলেন। আরো বলেন, কোন সিভিলিয়ান লোককে ভিতরে যাইতে দিবে না।

ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় ৩২ নং রোডের দিকে চলিয়া যান।

অনুমান সকাল ৭টার সময় আমি যেখানে ডিউটিতে ছিলাম। উহার পাশে একটি দোকানে রেডিওর মাধ্যমে শুনিতে পাইলাম, আমি মেজর ডালিম বলছি, কুখ্যাত শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হইয়াছে।

ঐ ঘোষণা শোনার পর আমার খারাপ লাগিল।

অনুমান সকাল সাতটার সময় ৩২ নং রোড হইতে একটি ট্যাংক মিরপুর রোডে আসে। ওই ট্যাংকের ভিতর মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানকে দেখি। ট্যাংকটি মিরপুর রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে কিছু দূর যাওয়ার পরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান ট্যাংক হইতে নামিয়া সেখানে যাহারা ডিউটিতে ছিল তাহাদের সাথে আলাপ করিয়া একটি জিপে করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়।

পরের দিন ১৬ই আগস্ট আমি মিরপুরে আমার মামার বাসায় যাই। বাসায় বসিয়া শুনিতে পাই যে, রব সেরনিয়াবাতের বাসায় বরিশাল হইতে কয়েকজন শিল্পী বেড়াইতে আসিয়াছে, ওই বাড়িতে তাহারা গুলিবিদ্ধ হয়। আহতদের মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। পরে বিকাল বেলা আমার ইউনিটে চলিয়া যাই। ইউনিটে গিয়া শুনিতে পাই যে, রিসালদার মোসলেমউদ্দিন, এ. এ. ডি মারফত আলি শাহ ১৫ই আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্যদের হত্যাকান্ডে ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমোশন পাইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

জামাল মায়ের পাশ থেকে উঠে বাবার পাশে এসে দাঁড়ান।

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলেন, আব্বা সিঁড়িতে বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। যারা আমাদের বাড়িতে ঢুকেছে, ওরা হয়তো দোতলায় উঠবে।

হ্যাঁ, তাই হবে। দোতলায় আসার জন্যই ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। নইলে তো ওরা একতলাতেই থাকত।

আমরা এখন কি করব? আমাদের কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া অস্ত্রের মুখে আমরা কিইবা করতে পারি। আব্বা–

বঙ্গবন্ধু জামালকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তোমরা সবাই বিষয়টি খুব সহজে বুঝতে পারছ। ওদের উদ্দেশ্য কি তাও আমার কাছে এখন পরিষ্কার। আমাদের বেশিকিছু ভাবার সুযোগ আর নাই। ওদের কাছে অস্ত্র আছে। আমাদের কাছে নেই। এই শহর এখন অস্ত্র-গোলাবারুদ-ট্যাংক-কামান ইত্যাদিসহ হিংস্র মানুষের দখলে। ওরা যা খুশি তা করবে বলে শহরের মানুষকে আর্মির গোলাগুলির সামনে দাঁড় করিয়েছে। কারো কিছু করার নেই বাবা।

এই কথা বলার সময় শেখ নাসের বঙ্গবন্ধুর কাছে এসে দাঁড়ান। বঙ্গবন্ধু তাঁর দিকে তাকালে তিনি দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেন। মনে মনে বলেন, তিনি এখন অনেক কিছু ভাবতে পারছেন। তাঁর পক্ষেই সম্ভব। হয়তো একটু পরে তিনি–। না, শেখ নাসের আর ভাবতে পারেন না। বরং সবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছাদের দেয়ালে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি আটকে যায়।

আকস্মিকভাবে সুলতানা উঠে দাঁড়ান। দু'পা এগিয়ে বলেন, আমি আমার ঘরে যাব।

আপনার ঘরে? তিনতলায়? অসম্ভব। পাগলামি করবেন না ভাবী। আমাদের কি সৌভাগ্য যে আর্মির কেউ কেউ আমাদের দোতলায় উঠেছে। হয়তো এই দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

জামাল দু'হাত ছড়িয়ে তার সামনে দাঁড়ান। রোজী আর রাসেল তাঁর দু'হাত ধরে রাখে। সুলতানা চোখে আঁচল চাপা দেয়।

বঙ্গবন্ধু তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেন, বৌমা শান্ত হও। আমাদের এখন ধৈর্যের পরীক্ষা বৌমা।

স্যুটকেসে কামালের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি শার্ট আছে আব্বা। আমি সেই শার্টটি আমার কাছে রাখতে চাই। আমাকে যখন ওরা মেরে ফেলবে তখন বুঝবো কামাল আর আমি একসঙ্গে আছি।

রেণু ওর হাত টেনে ধরে বলেন, আমার কাছে এসে বসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুজনে খাটে বসেন। সুলতানা থরথর করে কাঁপে। কান্না এবং ভয় একসঙ্গে তার ভেতরে কাজ করছে। রেণু তাঁকে দু'হাতে জাড়িয়ে ধরে রাখলেও তাঁর মনে হয় তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। মেয়েটি বুঝি হাতের বাঁধন ছিঁড়ে, দরজা ভেঙে দৌড়ে বেরিয়ে যাবে। যেভাবে ও খেলার মাঠে দৌড়ায়, সেভাবে। আর্মির সদস্যরা ওর পিছে ধাওয়া করে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। খেলার মাঠে দীর্ঘলম্ফে ওর সঙ্গে কেউ পারত না। রেণুর বুকে হাহাকার জাগলে তিনি সুলতানাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরেন।

রাসেল জামালকে জড়িয়ে ধরে বলে, আজ কেন এমন হচ্ছে ভাইয়া? আমাদের কি হয়েছে? ওরা কেন আমাদেরকে মারবে?

জামাল হাঁটু গেঁটে বসে রাসেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মৃদু স্বরে বলে, আল্লাহকে ডাক।

রাসেল ভাইয়ের ঘাড়ে মুখ রাখে। জামাল ভাবেন, রাসেল জানে না যে তার বড় ভাইয়া আর জীবিত নেই। ওরা একভাইকে হারিয়ে এখন শুধু দুজন। সামনে কি এই ভাইকে স্মরণ করার সময় পাবে তারা দুজন? জামাল এখনও বুঝতে পারছে না যে এই পরিবারের কতজন ওদের লক্ষ্য।

বঙ্গবন্ধু শেখ নাসেরকে বলেন, তোর জায়গায় গিয়ে বোস।

বসবো? নাসের দ্বিধান্বিত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা উচ্চারণ করে। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাইকে খুব অস্থির মনে হচ্ছে। প্রকাশটা কম। নিজেকে সামলানোর চেষ্টা বেশি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ, বসবি। বুঝতে পারছিস না বাইরের অবস্থা?

পারছি। মিয়াভাই সবই বুঝতে পারছি।

দুঃখ একটাই যে তুই অন্য কাজে ঢাকায় এসেছিস।

এসব কথা থাক মিয়াভাই। আল্লাহ ভাগ্যে যা রেখেছে তা আমাদের মানতে হবে।

বঙ্গবন্ধু আর কথা বাড়ান না। ছোট ভাইয়ের দিকে তাকান না। ভাবেন, ও কেন বসবে? বসলে কি ও এই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতে পারবে? যেমন উধাও হয়েছিলেন ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময়? দুজনের ভাবনায় এখন স্মৃতির তোলপাড়।

তারপরও শেখ নাসের দাঁড়িয়ে থাকেন। কোথায় বসবেন তিনি? তিনি কি রেহানার ঘরে যাবেন? রেহানা বিদেশে থাকায় দু'দিন ধরে তিনি সেই ঘরে ঘুমাচ্ছেন। আজ এই মুহূর্ত ভাই-ভাবির দুই মেয়ে দেশে নাই। আল্লাহ ওদের হায়াৎ-দারাজ করুক।

শেখ নাসের সরাসরি ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, মিয়াভাই আমি এই ঘরে বসতে পারছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু নিজেকেই বলেন, ব্যবসার কাজে তোকে এ সময়ে কেন ঢাকায় আসতে হলো নাসের? একেই কি মানুষের নিয়তি বলে? খুলনা থেকে এখন না এলে তোকে এই অবস্থা দেখতে হতো না।

শেখ নাসের আবার বলেন, আমি এই ঘরে বসতে পারব না। রেহানার ঘরে যাই?

জামাল দ্রুত এগিয়ে এসে বলেন, না। বের হওয়ার দরজা নাই।

বঙ্গবন্ধু তাঁর দিকে তাকান না। মনে পড়ে ছেচল্লিশের দাঙ্গার রক্তাক্ত সময়ের কথা। দুরন্ত ছেলে ছিলেন নাসের। সে সময় ক্লাস টেনে পড়তেন। কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। এদিকে দাঙ্গার ভয়াবহতা চারদিকে। নাসের যে কার কাছে আছে বুঝতে পারছেন না বঙ্গবন্ধু। নাসের একবার মেজো বোনের বাড়িতে বেড়াতে যান। একবার ছোট বোনের বাড়ি। কখনো বঙ্গবন্ধুর কাছে থাকেন। যেদিন গড়ের মাঠে ঘুরতে গিয়েছিলেন, তারপর আর বঙ্গবন্ধুর কাছে ফিরে আসেননি। বঙ্গবন্ধুর কাছে সেটা এক নাভিশ্বাস ওঠা সময়। দাঙ্গা বিধ্বস্ত শহর নিজের চোখে দেখা খুবই কষ্টের। একই সঙ্গে কঠিনও। এত তান্ডব, এত মৃত্যু। তারপরও একদিকে দাঙ্গা মোকাবেলার নানা কাজ করতে হচ্ছিল অন্যদিকে ছোট ভাইটির চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছিল। সেই ভয়াবহ দুর্যোগের দিনগুলোতে দেখেছিলেন কলকাতা শহরে লাশের স্তূপ। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে দাউদাউ জ্বলছে। সেদিন ভেবেছিলেন, মানুষ মানুষকে এভাবে হত্যা করতে পারে? মানুষ কি তার মানবতা হারিয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে? দুরন্ত কিশোর নাসেরকে ফিরে পেতে বেশ কদিন লেগেছিল। আজ দু'ভাই একসঙ্গে আছেন। একই বাড়িতে, একই ঘরে। কেউ কাউকে খুঁজছেন না। কারও জন্য কারও উৎকণ্ঠা নেই। এখন সময় দুজনের সামনে এক রকম।

মুহূর্তের জন্য বঙ্গবন্ধু চোখ বুঁজলেন।

শুনলেন, জামাল তাঁর মাকে বলছে, মা ঘরের সামনে বুটের শব্দ।

বঙ্গবন্ধু চোখ খুললে দেখলেন, রেণু দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন। রাসেল মাকে জড়িয়ে ধরে আছে। সুলতানা আর রোজী তাঁর দু'পাশে।

বুটের শব্দে তোলপাড় করছে চারদিক। শব্দ নিয়তির মতো দাপাচ্ছে। শব্দ নিয়তির মতো ক্ষিপ্ত হচ্ছে। বুটের শব্দ প্রবলবেগে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। শব্দ এখন প্রস্তর খন্ডের মতো বিশাল ওজন-সর্বস্ব। কারা যেন ওই প্রস্তর খন্ডবৎ শব্দ মাথায় তুলে হেঁটে যাচ্ছে এই বাড়ি ছাড়িয়ে, রাস্তা হ্রদ ছাড়িয়ে দূরে কোথাও জ্ঞ অন্তহীন যাত্রার শেষ প্রান্তে।

এই বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে আছে সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮.

আমার নাম নেওয়াজ আহমেদ গর্জন। আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

36. Neaz Ahmed Gorjan
P. W. -36

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি ৪৪ বয়স্ক নেওয়াজ আহমেদ গর্জন-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ৫/১১ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– নেওয়াজ আহমেদ গর্জন, বয়স– ৪৪ বৎসর, আমার পিতার নাম– নুর উদ্দিন আহাম্মেদ, ধানমন্ডি, সড়ক নং ৩২, বাসা নং ৬৭৮, ঢাকা।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের বাসা চিনিতাম। আমাদের লাগোয়া পশ্চিম দিকে আমার ৬৭৭ নং বাসা।

আমি একজন ব্যবসায়ী।

১৯৭৫ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাতে আমি নিজ বাসায় ছিলাম। বাসার দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের রুমে ঐ রাতে আমি ঘুমাই। ঐদিন আমার বড় বোন নাসরিন আহমেদ, বড় ভাই রতন, ছোট বোন শান্তা, ফুফাতো ভাই আমিনুল হক বাদশা ও আরো কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনসহ আমরা বাসায় ছিলাম। আমার পিতা ঐ সময় সরকারি কাজে দেশের বাহিরে ছিলেন।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাতে স্বাভাবিকভাবে শুইয়া পড়ি। ১৫ই আগস্ট ভোরবেলা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে বিউগলের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙ্গে। আমি উঠিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পতাকা উত্তোলনের দৃশ্য দেখিতেছিলাম। ঠিক এই সময় একটা জিপ–পূর্ব দিক অর্থাৎ মিরপুর রোডের দিক হইতে খুব দ্রুত পশ্চিম দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেইটের সামনে থামে। গাড়ির এই দ্রুতগতি দেখিয়া আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হইল।

গেইটে জিপে থাকা লোকদের সাথে সেন্ট্রির কথাবার্তা হইতেছিল। ঠিক এক সময় লেকের পাড় দিয়া কালো পোশাক পরা বেশ কিছু সংখ্যক লোককে ক্রল করিয়া আগাইতে দেখি। সাথে সাথে ঐ কালো পোশাকধারী আর্মিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অবিরাম প্রচণ্ড গুলি করিতে দেখি। একই সময় কামানের গুলিও হইতেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে আমরা নিরাপত্তার জন্য বাথরুম, বারান্দা ইত্যাদি জায়গায় আশ্রয় নিই।

এই সময় আমাদের বাসায় একটা ফোন আসে। ফোনটা আমি ধরি। ফোনে আমার এক ভাবী জানাইলেন, এই মাত্র শেখ মনিকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে।

তখন গুলি চলিতেছিল–আমরা ঘরের ভিতরেই আছি। এই প্রচণ্ড গুলি কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতর হইতে পুনরায় স্টেনগানের আওয়াজ শুনি। এই সময় আমি জানালার পাশে দাঁড়াইয়া বাহিরে দেখিতে থাকি। আমি দেখি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতরে কালো পোশাকধারী আর্মি অফিসার বাহিরের দিকে বন্দুক তাক করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সময় একজন আর্মি আমাকে দেখিয়া লক্ষ করিয়া বলে, বের হও, বের হও–ঘরে যারা আছে বের হও।

এরপর নিচের তলায় রান্নাঘরের দরজায় জোরে জোরে আঘাত করিয়া বলে, বের হও, নচেৎ গুলি করিব।

আমরা এই গুলির কথা শুনিয়া লাইন হইয়া নিচে নামিলাম এবং রান্নাঘরের দরজা খুলিয়া সামনে এক বীভৎস চেহারার আর্মি দেখিলাম। তিনি নিজেকে আর্মি মেজর বলিয়া পরিচয় দেন। তাহার সাথে আরো কয়েকজন আর্মির লোক বন্দুক তাক করা অবস্থায় আমাদেরকে লাইন করিয়া দাঁড়াইবার নির্দেশ দেয়।

আমাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করিতে পারে, এই ভয়ে আমার বোন নাসরিন আহমেদ বলে, Please আমাদেরকে মারবেন না। এইভাবে কয়েকবার request করিলে একজন আর্মির লোক আমার বোনের কাছে আসিয়া কানে কানে বলে যে–লাইনে আসিয়া দাঁড়ান।

আমরা তখন লাইনে আসিয়া দাঁড়াইলে আমাদেরকে আমাদের বাড়ির পিছনে একটি একতলা বাড়িতে নিয়া ঐ বাড়ির বারান্দায় বসাইয়া রাখে। আমাদের একই কমপাউন্ডে ঐ বাড়িটিও আমাদের পুরান বাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ বাড়িতে তখন কেহ থাকিত না।

আমাদেরকে এই বাড়িতে আনার পর আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে উঁচু তলায় কান্নার শব্দ পাই। একটু পরেই বঙ্গবন্ধুর ঘরের ভিতর হইতে দুইটা গুলির আওয়াজ পাই। ইহার পরে সব চুপ।

এই সময় ওই বাড়িতে থাকা কালো পোশাকধারী আরও কিছু আর্মি আমাদের বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ে এবং অস্ত্র আছে কিনা তাহা তল্লাশী করে। আবার বারান্দায় ফেরৎ গেলে রাস্তায় ট্যাংকের আওয়াজ শুনি। পরে ট্যাংকও দেখি। এই সময় বেশ কিছু আর্মি আসিয়া আমাদের বাড়ির ছাদে যাইবার সিঁড়ির অবস্থান জানিতে চায়। বেশ কিছুক্ষণ পরে বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের বাড়ির মধ্যে থাকা একটি গেইট দিয়া একজন অফিসার আমাদের বাড়িতে আসে। তাহার কোমরে রিভলবার, হাতে স্টেনগান ছিল। আমাদের পাশে থাকা আর্মিকে বাড়ির মালিকের কথা জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে একজন আর্মি বলিল, ইহা বেগম বদরুন্নেছার বাড়ি। আমার পিতা দেশের বাইরে, এই কথাও ওই আর্মি জানাইলো।

এরপর আমাদের সকলের দিকে তাকাইয়া- পরে আমার ফুফাতো ভাই আমিনুল হক বাদশাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, আপনার নাম কি? বাদশা ভাই তাহার নাম বলিবার পরে ওই অফিসার বলিল, আমিতো আপনাকে চিনি। জবাবে বাদশা ভাই বলিলেন, আমিও আপনাকে চিনি। এই কথা শোনার পর অফিসার নরম হইল। তখন আমাদেরকে বলিল, আপনাদেরকে খামাখা এইখানে বসাইয়া রাখিয়াছে। আপনারা ভিতরে যান। স্বাভাবিক হন।

আমরা উঠিয়া বাড়ির দিকে যাইতেছি সেই সময় বাদশা ভাইয়ের কাছ হইতে জানিতে পারিলাম, ওই অফিসারের নাম মেজর বজলুল হুদা।

এরপর মেজর বজলুল হুদা আমাদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, Start cooking.

আমরা যখন বাড়িতে ঢুকিতেছিলাম তখন আমাদের সাথে একজন আর্মি দিয়া বলিলেন, ইনি আপনাদের ছাদে থাকিবেন। তখন সময় ১১টা হইবে। আমি ওই আর্মিকে ছাদে নিয়া যাইবার সময় ওই আর্মিকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই কি হয়েছে? উত্তরে বলেন, রেডিও খুলুন। পাশের বাড়িতে শুধু রক্ত আর রক্ত, সবশেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯.

আমি সফিউদ্দিন সরদার। আমি জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

13. Dafadar Shafiuddin Sardar (Rtd.)
P. W. -13

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং- ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

উপস্থিত- জনাব কাজী গোলাম রসুল,
জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা

আন্দাজি- ৪৫ বয়স্ক দফাদার সফিউদ্দিন সরদার (অব.)-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৫/৯ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম- দফাদার সফিউদ্দিন সরদার (অব.), বয়স- ৪৫ বৎসর, আমার পিতার নাম- মৃত মুন্সি মঙ্গল সরদার, গ্রাম- পোম, থানা- ভেদরগঞ্জ, জেলা- শরিয়তপুর।

আমি আর্মিতে চাকুরি করিতাম। এখন অবসর নিয়াছি। পাকিস্তানে ছিলাম। ১৯৭৩ সনের শেষের অথবা ১৯৭৪ সনের প্রথম দিকে রিপাট্রিয়েটেডের মাধ্যমে দেশে আসিয়া ২ মাসের ছুটি কাটাইয়া ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সারে এল. ডি. হিসাবে যোগদান করি।

১৯৭৫ সনের প্রথম দিকে এল. ডি. পদে পদোন্নতি পাই।

আমি গাড়ি চালাইতাম। আমার ইউনিট ৪টি ভাগে যথা A. B. C. ও HQ স্কোয়াড্রন ছিল। প্রত্যেকটি স্কোয়াড্রনে ৪টি করিয়া ট্রুপস যথা ১ম, ২য়, ৩য় ও ভেহিকেল ছিল। আমার ট্রুপসে ২টা জিপ, ২টা বেড ফোর্ড ৩ টনি ট্রাক ছিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোমিন সাহেব ভাল জিপটি ব্যবহার করিতেন। অন্য জিপটি অফিসের কাজে ব্যবহৃত হইত। সেইটি আমি চালাইতাম।

আমার ভেহিকেল ইউনিটে সিনিয়র জে. সি. ও. ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিসালদার নোয়াব আলী শেখ।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট বিকাল বেলা আমাদের খেলাধুলার পর রিসালদার নোয়াব আলী নাইট প্যারেডের কথা শোনান। আনুমানিক রাত্র ৮.৩০ টার সময় আমাদের নাইট প্যারেড ফল-ইন হয়। আর. ডি. এম. এরশাদ নাইট প্যারেড ফল-ইন করান। তিনি ইউনিটের নায়েব সুবেদার আবদুল মালেককে প্যারেড বুঝাইয়া দেন। আবদুল মালেক ইউনিটের রিসালদার মেজর সাঈদ আহমদকে প্যারেড বুঝাইয়া দেন। তিনি ইউনিটের এ্যাডজুটেন্টকে প্যারেড বুঝাইয়া দেন, এ্যাডজুটেন্ট মেজর মহিউদ্দিনকে প্যারেড বুঝাইয়া দেন। মেজর মহিউদ্দিন ইউনিটের টু-আই সি. মেজর ফারুক রহমানকে প্যারেড বুঝাইয়া দেন। কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মোমিন সাহেব ছুটিতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান।

১৪ই আগস্ট দিবাগত রাতে বালুরঘাট এলাকায় নাইট প্যারেড হওয়ায় আমাদের প্যারেড আমাদের মধ্যেই হয়।

প্যারেড মার্চ আপ-এর সময় মেজর ফারুক সাহেব বলিয়াছিল যে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কেহই ইউনিটের বাহিরে যাইতে পারিবে না।

আমার গাড়ি আমি মেইনটেনেন্স করি। রাত অনুমান ৩.৩০ টায় রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী শাহ, এল, ডি, আবুল হাশেম মৃধা একটি বেড ফোর্ড ট্রাকে উঠে। গভীর রাতে টু-ফিল্ড আর্টিলারি হইতে খন্দকার মেজর রশিদ সাহেব আমাদের ইউনিটে আসেন। তাহার সহিত মেজর ফারুক সাহেব বাহির হইয়া যান। কিছুক্ষণ পর মেজর ফারুক সাহেব ইউনিটে ফেরত আসেন। ইহার পর রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী ও এল ডি আবুল হাশেম মৃধা একটি বেড ফোর্ড ট্রাকে উঠেন এবং তাহাদেরকে অনুসরণ করার জন্য আমাকে বলেন। আমি তাহাদের অনুসরণ করিয়া মহাখালী গিয়া গাড়ি থামাই। সেখানে আর্টিলারির কিছু ফোর্স দাঁড়ানো ছিল। আমার গাড়িতে একজন অফিসার উঠে। মোসলেম উদ্দিনের বেড ফোর্ড গাড়ির কনভয় ট্রাকে কিছু ফোর্স ওঠে। আমার জিপেও দু-ফিল্ড আর্টিলারির ২-৩ জন জোয়ান উঠে। মহাখালী হইয়া ফারম গেইটের দিকে যায়। ফারম গেইট হইতে ইন্দিরা রোড হইয়া মিরপুর রোডে উঠে। মিরপুর রোড দিয়া দক্ষিণ দিকে ধানমন্ডি মাঠ পার হইয়া পশ্চিম ধানমন্ডির মধ্যে দিয়া সাত মসজিদ রোডে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে যাই। কিছুদূর গেলে হাতের বাম দিকে একটি লেক পাই। লেকের দক্ষিণ পাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়া পূর্ব দিকে গিয়া থামি। ট্রাকের পিছনে আমার জিপ থাকে। গাড়ি থামিলে রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এল.ডি. মৃধা এবং অন্যান্যরা রাস্তার ডান দিকে রাস্তার পাশে দোতলা একটি বাড়িতে উঠে। আমি আমার জিপের পাশে দাঁড়ানো ছিলাম। একটু পরেই দোতলায় গুলির আওয়াজ পাই। গুলি শেষ হইতেই রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এল.ডি. মৃধা দ্রুত বাহির হইয়া আসে।

ইহার পর গাড়ি ব্যাক করিয়া সাত মসজিদ রোড হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া ধানমন্ডি ২৭ নং রোড দিয়া পুনরায় মিরপুর রোডে উঠিয়া ৩২ নং রোডের মাথায় আসিয়া গাড়ি থামাই। রিসালদার মোসলেমউদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এল.ডি. মৃধাসহ অন্যান্যরা গাড়ি হইতে নামিয়া দাঁড়ায়। তখন দফাদার মারফত আলীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, একটু আগে যে বাড়িতে গুলি করিয়াছে সেই বাড়িটি কাহার এবং কাহাকে গুলি করিয়াছে?

উত্তরে মারফত আলী বলে, শেখ মুজিব ও তাঁহার স্ত্রীকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছি।

আমরা ধানমন্ডি ৩২ নং রোডের মাথায় আসিয়া ২টি ট্যাংক দেখি। তখন সকাল হইয়াছে। ওখানে আসার পর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনিয়াছি। এখানে থাকাকালীনও গোলাগুলির আওয়াজ শুনিয়াছি। ইহার পর রিসালদার মোসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলি, এল.ডি. মৃধা বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যায়। মনে হয় সেখানে যাহার আছে গোলাগুলির মধ্যে তাহাদেরকে সাহায্য করার জন্য অথবা তাহাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্যই যায়।

আমি ঘটনার বাড়িতে যাই নাই। তবে ঘটনার বাড়িতে গোলাগুলি দেখিয়াছি। আমি ৩২ নম্বর রোডের মুখে ছিলাম সেখান হইতে আওয়াজ শুনিয়াছি। কতক্ষণ পরে মেজর ফারুক সাহেব একটি ট্যাংকে ৩২ নম্বর রোড হইতে বাহির হইয়া মিরপুর রোডে উঠে এবং আমাদেরকে রেডিও স্টেশনে চলিয়া যাইতে বলে।

পরে জানিতে পারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাহার স্ত্রী, তিন ছেলে, দুই ছেলের বউ, ভাই নাসের, একজন পুলিশ অফিসারকে গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। তাহাছাড়া রাস্তায় কর্ণেল জামিলকেও গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০.

ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আকস্মিকভাবে রেণু বলেন, আজ আমার আরজুমনির বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। ও বলেছিল, মামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার পরে আপনি আমাকে দেখতে আসবেন। আমার শরীর ভালো লাগছে না। আমি ওকে বলেছিলাম যে, আসব। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি খাবি? ও বলেছিল, টাকী মাছের ভর্তা আর পুডিং। আমি তো ওর জন্য এসব কিছু বানিয়ে বাটি ভরে রেখেছি। এ সময়তো এটা-ওটা খেতে মন চাইবে। আহা রে, ওর জন্য আমি কখন এসব নিয়ে যাব। আমার কি আর সময় হবে? ও খাবেই বা কখন?

ঘরে যারা আছেন তার কেউ কথা বলছেন না। আরজুমনির দু'টি ছোট বাচ্চা আছে। কেমন আছে ওরা? তাপস আর পরশ?

রেণু ভাবলেন, আরজুমনির গর্ভে সন্তান। এবার একটি মেয়ে হলে ভালোই হবে। দু'টি ছেলের পরে একটি মেয়ে।

রেণু বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার মনে হচ্ছে আরজুর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না। পরশ আর তাপসের সঙ্গেও দেখা হবে না।

সৈনিকদের বুটের শব্দ আমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে থেমেছে।

কে যে এই কথাটি বলে কেউ বুঝতে পারে না। কখনো মনে হয় কথাগুলো বোমার মতো ঘরে এসে পড়ছে, আর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে দেয়াল– ঘরটি একটি রক্তাক্ত প্রান্তরে পরিণত হচ্ছে।

হঠাৎ করে রেণু ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করেন। তিনি নানাকিছু গোছাতে শুরু করেন। যেন তাঁর সামনে এখন অনেক কাজ। সবকিছু এলোমেলো থাকলে তাঁর মেয়েরা ফিরে এসে অনেককিছু খুঁজে পাবে না। মেয়েদের জন্য সবকিছু গুছিয়ে রাখতে হবে। নইলে ওরা বারবার জিজ্ঞেস করবে, মা আমরা যে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছেন আপনার স্যান্ডেল? আব্বার পাঞ্জাবি, রাসেলের স্কুলের ইউনিফর্ম? মা আমের আচারের বোয়েমটা কোথায়? গাজরের হালুয়ার বাটিটা? কোরাণ শরীফ কোথায় আম্মা? জায়নামাজ—

বঙ্গবন্ধুর ভারী কণ্ঠ রেণুর কানে বাজে, কি করছ রেণু?

আমাদের মেয়েদের জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছি। দেশে ফিরে ওরা যেন সবকিছু হাতের কাছে পায়।

বঙ্গবন্ধু মৃদু স্বরে বলেন, তুমি শান্ত হও হাসুর মা।

শান্ত! রেণু থমকে দাঁড়ান।

দুজনেই ভাবেন, আশ্বিনের এক রোদ-ভাসা দুপুরে তাঁদের হাসুর জন্ম হয়েছিল। কি যে খুশি হয়েছিলেন তাঁরা। রেণুর মনে হয়েছিল এই শিশুর মুখ দেখা তাঁর জীবনে কখনোই ফুরোবে না। বুকে নিয়ে শ্বাস টানলে এক আশ্চর্য মায়াবী আলোয় ভরে যেত মন। মনে হতো টুঙ্গিপাড়ার সব শিউলি ফুলের সৌরভ শিশুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরীরে ভরে আছে। সেদিনের স্মৃতি এখনো ভীষণ তাজা। রেহানার জন্ম হয়েছিল ঢাকায়। তিন ছেলেমেয়ের পরে চতুর্থ সন্তান। আবার কোল-আলো করা একটি মেয়ে। রেহানার জন্ম গভীর আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছিল। ফুলের মতো শিশু। দুচোখ মেলে তাকালে শিহরিত হতো মন। ও বসতে শিখল, হাঁটতে শিখল, দৌড়াতে শিখল। পড়ালেখা করতে শিখল। দিন গড়ালো কেমন করে, সে কথা মনেই আসে না। মনে ভেসে আসে স্মৃতি। এই মুহূর্তে দু'মেয়েকে স্মরণ করে নিজেকেই বলেন, আমি কেমন করে শান্ত থাকব হাসুর আব্বা।

ধানমন্ডি গার্লস স্কুলে পড়ার সময় একদিন রেহানা বলল, আব্বা আপনাকে একদিন আমাদের স্কুলে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নয় আব্বা, আমার অভিভাবক হিসাবে যেতে হবে। সবার সঙ্গে একই সারির চেয়ারে বসতে হবে।

মেয়ের এমন আবদারে সেদিন ভীষণ আনন্দ পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর মেয়ে তাঁরই মতো ভাবতে শিখেছে। আর হাসুতো তাঁকে পেলে ছাড়ত না। গলা জড়িয়ে ধরে রাখত। ভাষা আন্দোলনের সময় অনশন করে শরীর খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। স্ট্রেচারে করে জেল থেকে বের করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধুকে। পাঁচ দিন পরে টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছেছিলেন। হাসু আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, 'আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।' ২১ ফেব্রুয়ারির সময় ওরা ঢাকায় ছিল। অন্যের কাছ থেকে শুনে শুনে স্লোগানটি শিখেছিল পাঁচ বছরের মেয়েটি। বাবাকে ঘিরে স্লোগানটি বলতে ও খুব আনন্দ পেতো। ওর কোনো ভুল উচ্চারণ ছিল না। মেয়েটি কি বড় হয়ে রাজনীতি করবে? দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর রাজনীতি?

তিনি জানালার দিকে তাকালেন। ছাত্রী জীবনে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ও। স্বামীর সঙ্গে এখন বিদেশে। একদিন দেশে ফিরবে ওরা। একদিন ওদের জীবনে বহুদিন হবে। একদিন ওরা ফিরে আসবে নদী-মাতৃক বাংলাদেশে। যে নদী-পথে আমি জীবনের অসংখ্য দিন কাটিয়েছি। মায়েরা আমার, আমি চেয়েছিলাম স্বাধীনতা। তোমাদের কাছে আমার এই আশা যে এ দেশের মানুষ দেশ স্বাধীন করেছে। তোমরা নিরন্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে। তোমাদের যেটুকু সাধ্য আছে তাই দিয়ে ওদের জন্য কাজ করবে। মনে রাখবে, তাহলে আমার আত্মা সবচেয়ে খুশি হবে।

বঙ্গবন্ধু রেণুর দিকে তাকালেন। দেখলেন, রেণুর দুই চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। তিনি রেণুর দিকে তাকিয়েই থাকলেন। মনে পড়ে সেদিনের কথা। ভাষা আন্দোলনের সময় অনশন ধর্মঘট করে জেলখানায় তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। ঠিকমতো হাঁটাচলা করারও অবস্থা ছিল না। স্ট্রেচারে করে বাড়িতে আনা হয়েলিছ। শারীরিক দুর্বলতায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে গেলে কেঁদে ফেলেছিলেন রেণু। বলেছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার চিঠি পেয়েই আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল তুমি নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখ না। তোমাকে দেখার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আমাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে কাকে বলবো তা ভেবে উঠতে পারছিলাম না। আব্বাকে তো লজ্জায় বলতে পারি না। নাসের ভাই বাড়িতে নাই। খবরের কাগজে তোমার শারীরিক অবস্থার খবর দেখে নিজের লজ্জাশরম ফেলে আব্বাকে গিয়ে বললাম। আব্বাও এই খবরে খুব মন খারাপ করলেন। আমাদেরকে নিয়ে আব্বা ঢাকায় রওনা করলেন। আমাদের বড় নৌকায় তিনজন মাল্লা নিয়ে যাত্রা করলাম আমরা। সে কি চিন্তা আমার। শুনেছিলাম তোমার শরীর এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তুমি হাঁটতেই পারছ না। কত যে আল্লাহকে ডেকেছি। কেন অনশন করতে গিয়েছিলে? আমাদের কারও কথা কি তুমি একবারও ভাবনি? তোমার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কি হতো? এই দুইটা বাচ্চাকে কীভাবে দেখাশোনা করতাম? হাসিনা, কামালের কি অবস্থা হতো একবারও ভেবেছিলে? তুমি বলবে, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হতো না। মানুষ কি শুধু খাওয়াপরা দিয়েই বেঁচে থাকতে চায়? ছেলেমেয়েদের বাবা লাগে না? কে ওদেরকে বাবার ভালোবাসা দিত? আর যদি মরেই যেতে তাহলে দেশের কাজই বা কীভাবে করতে? ভাষার জন্য এমন অনশনের কথা আমি কারও কাছে শুনিনি।

বঙ্গবন্ধু রেণুর দিকে তাকিয়েই থাকেন।

ঘরের দরজার সামনে সৈনিকেরা বুট স্তব্ধ হয়ে আছে। ওরা আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে না। ওরা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য এ বাড়িতে আসেনি।

এই বাড়িতে এখন শুধু একটি মুহূর্ত অনন্তকাল।

AMARBOI.COM

২১.

আমার নাম আয়েনউদ্দিন মোল্লা। আমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

20. Ayenuddin Mollah
P. W. -20

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দাজি ৫৭ বয়স্ক আয়েনউদ্দিন মোল্লার জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ৭/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম আয়েনউদ্দিন মোল্লা, বয়স– ৫৭ বৎসর, আমার পিতার নাম– মৃত হারুন মোল্লা, গ্রাম– মাঝগ্রাম, থানা– মাগুরা, জেলা– মাগুরা।

বর্তমান ঠিকানা– ৭৭/১২, এ.জি.বি কলোনি, মতিঝিল।

আমি সরকারি পরিবহন পুল হইতে ড্রাইভার হিসাবে এল. পি. আর-এ আছি। আগে আর্মিতে ল্যান্স নায়েক ড্রাইভার ছিলাম। সেখান হইতে ১৯৭৪ সালে অবসর গ্রহণ করি।

১৯৭৫ সনে ১৫ই আগস্ট আমি কর্নেল জামিল সাহেবের ড্রাইভার হিসাবে চাকরি করিতাম।

ঐ সনের ১৪ই আগস্ট বেলা ৩টার দিকে কর্নেল জামিল সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আগামী শনিবারে তিনি আই.এস.আই-তে যোগদান করিবেন। আমাকে নারায়ণগঞ্জের সি.সি. সাহেবের ডিউটি করিতে হইবে। ঐ দিন রাত্রে খানা শেষ করিয়া আমার রুমে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ি।

ঐ সনের ১৫ই আগস্ট ভোর অনুমান ৫টার সময় আমার রুমের কলিং বেল বাজিতেছিল। তখন আমি বাথরুমে অজু করিতে ছিলাম। তাড়াতাড়ি করিয়া বাসার সামনে গেলে সাহেব উপর হইতে বলেন, তাড়াতাড়ি গাড়ি রেডি কর। এবং গণভবনে গিয়া যত ফোর্স আছে হাতিয়ারগুলিসহ ৫ মিনিটের ভিতর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাইবার জন্য ফোর্সদের খবর দিবার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মতো আমি গণবভনে গিয়া ফোর্সদেরকে এই নির্দেশ শুনাইলাম।

ফিরিয়া আসার পর আমি সরকারি গাড়ি নিতে চাহিলে তিনি তাহার ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়া যাইতে বলেন। আমি তাহার ব্যক্তিগত গাড়িসহ তাহাকে নিয়া ধানমন্ডি ২৭ নং রোডের মাথায় বয়েজ স্কুলের গেইটে আসিলে সেখানে গণভবন হইতে আগত ফোর্সগুলি দেখিলাম।

আমরা দ্রুত সোবহানবাগ মসজিদের কাছে গেলে দক্ষিণ দিক হইতে সোঁ সোঁ করিয়া গুলি আসিতে দেখি। তখন কর্ণেল জামিল সাহেব সেখানে গাড়ি রাখিতে বলিলেন। আমি গাড়ি থামাই। সাহেব গাড়িতে বসা ছিলেন। তখন আমি কর্ণেল জামিল সাহেবকে ফোর্স attack

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করানোর জন্য বলিলাম। উত্তরে তিনি বলিলেন, এটা ওয়ার ফিল্ড নয়, attack করা হইলে সিভিলিয়ানদের ক্ষতি হইতে পারে। ইহার পর তিনি আমাকে প্রতিপক্ষের অবস্থান জানিয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আমি চাবি গাড়িতে রাখিয়া দেওয়াল ঘেঁষিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাইতে থাকি। কিছুদূর যাইবার পরে দক্ষিণ দিক হইতে আর্মির পোশাক পরিহিত ৫/৬ জনকে অস্ত্রসহ কর্ণেল সাহেবের গাড়ির দিকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখি। অবস্থা খারাপ বুঝিতে পারিয়া আমি কর্ণেল জামিল সাহেবকে পিছনে যাইবার জন্য হাত দিয়া ইশারা দেই। কিন্তু তিনি আমার দিকে দেখেন না। তখন স্যার স্যার বলিয়া কয়েকবার আওয়াজ করি। তাহাতেও তিনি আমার দিকে তাকান নাই। এসময় সেনা বাহিনীর লোকগুলি গাড়ির কাছে পৌঁছিয়া যায়। কর্ণেল জামিল সাহেব দুই হাত উঁচু করিয়া ঐ সেনা বাহিনীর লোকগুলিকে কিছু বলার বা বুঝানোর চেষ্টা করিতে ছিলেন। এই সময় কর্ণেল জামিল সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া ২/৩ টা ফায়ার করা হয়। তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। আমি ভয়ে সোবহানবাগ মসজিদে গিয়া আশ্রয় নিই। তখন সেনা বাহিনীর ঐ লোকগুলি বলিতে থাকে, ড্রাইভার কোথায়? তখন মুসল্লিরা আমাকে মসজিদে থাকিতে দেয় নাই। আমি বাড়ির ভিতর দিয়া মহম্মদপুর ফায়ার ব্রিগেডে যাই। ঐ সময় ক্যান্টনমেন্ট হইতে I.S.I.-এর গাড়ি তাহার বাসায় যাইতেছিল। ড্রাইভার আমার পরিচিত ছিল। আমি ঐ গাড়ি দাঁড় করাইয়া ঐ গাড়িতে কর্ণেল জামিল সাহেবের বাসায় যাই এবং বেগম সাহেবকে ঘটনা বলি। বেগম সাহেব হার্ট ফেল করিতে পারেন, এই ভয়ে আমি মৃত্যুর সংবাদ না দিয়া বলি যে, সাহেবকে আর্মির লোকজন ধরিয়া নিয়া গিয়াছে।

আমি বেগম সাহেবকে কর্ণেল মাশরুরুল হক সাহেবের কাছে ফোন করিতে বলি। বিকাল বেলা আর্মির পিকআপে তাহার বাড়ির সকল মালপত্র লালমাটিয়ায় তাহার ভাইয়ের বাসায় নিয়া যায়। সাথে আমিও ছিলাম। রাত্রিবেলা আমি কর্ণেল জামিল সাহেবের বাসায় থাকি। সকালে সরকারি পরিবহন পুলে রির্পোট করি। পরের দিন আমাকে ড্রাইভার হিসাবে বঙ্গভবনে ডিউটি দেয়। বঙ্গভবনে মেজর ইকবাল এবং ক্যাপ্টেন মাসুমের গাড়ি চালানোর জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়। তখন বঙ্গভবনে আর্মির খুব দাপট। ভিতরে আর্মি অফিসাররা থাকিত। মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর ফারুক, মেজর পাশা, মেজর নূরসহ আরো কয়েকজন আর্মি অফিসার বঙ্গভবনের ভিতরে ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গভবনের ভিতরে যে সব আর্মি অফিসার থাকিত এবং তাহাদের সাথে যে সব ড্রাইভার ডিউটি করিত তাহাদের মধ্যে ড্রাইভার শফি, ড্রাইভার রুস্তম ও ড্রাইভার হানিফের নাম মনে আছে। অন্যদের নাম মনে নাই।

তাহাদের নিকট হইতে জানিত পারি যে, এইসব আর্মি অফিসারগণ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে এবং তাঁহার ভাগিনা শেখ মণি ও ভগ্নিপতি সেরনিয়াবাতকে হত্যা করিয়াছে। (ডিফেন্সের আপত্তিতে রেকর্ড)।

২২.

ড্রাইভার আয়েনউদ্দিনের কথা শুনে কর্ণেল জামিলের স্ত্রী আঞ্জুমান আরা এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর গলা শুকিয়ে যায়। মনে হয় ভেতর থেকে কথা বের হতে কষ্ট হচ্ছে। ঢোক গিলে বলেন, ধরে নিয়ে গেল? কোনদিকে গেল দেখেছ?

মিরপুর রোড ধরে সোজা গেল। স্যার আমি কিছু জানি না বেগম সাহেব।

আর্মির লোক কয়জন ছিল?

চার-পাঁচ জন হবে।

তোমার পরিচিত ছিল কেউ?

না, আমি কাউকে চিনতে পারিনি। ওরা সবাই কালো পোশাক পরা ছিল।

এখন আমি কোথায় খোঁজ করব?

আপনি কর্ণেল মাশরুরুল হককে ফোন করেন বেগম সাহেব। তিনিই সবকিছু জানাতে পারবেন।

আয়েনউদ্দিন দুই হাতে মুখ ঢাকে। তার শরীর কাঁপে থরথর করে। স্তব্ধ হয়ে থাকেন আঞ্জুমান আরা। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলেন, তুমি কি ভয়াবহ কিছু দেখেছ আয়েনউদ্দিন? আর্মি কি গোলাগুলি করছে? বঙ্গবন্ধুর বাড়ির খবর কি?

আমরাতো ওই পর্যন্ত যেতে পারিনি। বেগম সাহেব আমি একটু রুমে যাই? আমার খুব পানির পিপাসা পেয়েছে। আমার মাথা ঘুরছে।

আঞ্জুমান কিছু বলার আগেই আয়েনউদ্দিন দ্রুতপায়ে চলে যায়। ওর যাওয়া স্বাভাবিক মনে হয় না আঞ্জুমানের। মনে হলো আয়েনউদ্দিন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না।

আঞ্জুমান বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। কি করবেন বুঝতে পারেন না। ভাবেন, রাত তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে তাঁর বাসার লাল ফোন বেজেছিল। লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার ফোন। ফোন ধরে ছিলেন আঞ্জুমান আরা নিজে। হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে অপর দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এসেছিল, ফোনটা জামিলকে দে। ও কি কাছে আছে?

বঙ্গবন্ধুর গম্ভীর কণ্ঠ শুনে তিনি ঘাবড়ে যান। কর্ণেল জামিলকে ফোন দিয়ে পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। শুনতে পান স্বামীর কথা।

স্যার আপনি ভয় পাবেন না। আমি এখনই আসছি। ঘর বন্ধ রাখুন স্যার। কেউ খুলতে বললে খুলবেন না।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা শেষ করে কর্ণেল জামিল ফোন করলেন সেনাবাহিনী প্রধান সফিউল্লাহকে। আঞ্জুমান আরা শুনলেন তিনি বলছেন, বঙ্গবন্ধুকে মিসক্রিয়েন্টসরা ঘিরে ফেলেছে। ফোর্স পাঠান।

কথা শেষ হলে আঞ্জুমান আরা জিজ্ঞেস করেন, কি বলেছেন সেনা প্রধান?

বললেন, ফোর্স পাঠাচ্ছেন।

আবার ফোন ঘোরান কর্ণেল জামিল। কথা হয় পুলিশ সুপার ও রক্ষীবাহিনী প্রধানের সঙ্গে। আঞ্জুমান আরা বেশি কথা বলার সুযোগ পান না। তিনি দ্রুত তৈরি হয়ে গণভবনের গার্ড রেজিমেন্টকে বলেন, তৈরি হও। যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে যাও।

কর্ণেল জামিলকে যেতে দেখে আঞ্জুমান আরা তাঁর হাত টেনে ধরে বলেন, কোথায় যাও?

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছি। ভয়াবিপদে। তুমি ভয় পেও না। দরজা আটকে রাখ। এই যে আমার হাতে অস্ত্র আছে না? কোনো বিপদ হবে না।

কর্ণেল জামিল দ্রুত হেঁটে গিয়ে তাঁর লাল রঙের প্রাইভেট গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল। আঞ্জুমান আরা ভাসুর জামালউদ্দিনকে ফোন করলেন। তিনি লালমাটিয়ায় থাকেন। তিনি বললেন, তুমি ভয় পেও না। আমি দেখছি। ওতো আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই যাবে।

ভাইজান আমার খুব ভয় করছে।

মনে সাহস রাখ।

ওরা ওকে কোথায় নিয়ে গেল?

তুমি শান্ত হও। আমি খোঁজ করার চেষ্টা করছি।

ফোন রেখে দেন তিনি। কথা থেমে যায়। রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন আঞ্জুমান। পাশে এসে দাঁড়ায় ছোট বোনটি।

ভাইজান কি বললেন বুবু?

আঞ্জুমান কথা বলতে পারেন না। বুকভরা শুধুই দীর্ঘশ্বাস। নিশ্বাস ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর আর কিছু নেই। তিনি চুপ করে থাকেন।

তখনতো বেশি কথা বলার সময় নয়। তখন সময় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অল্পক্ষণ পরে তিনি দোয়া পড়তে শুরু করেন।

বাইরে গুলির শব্দ চারদিক ফাটিয়ে দিচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধ প্রহর রাতের এই শেষ মুহূর্তে আর নিস্তব্ধ নেই। ভয়াবহ সময় চারদিকে। প্রবল পরাক্রমে সেনা সদস্যদের হাতে তুমুল ফুটছে গুলি। যেন তারা উৎসবে মেতেছে— মৃত্যুর উৎসব। মানুষের জীবনে কখনো এমন সময় আসে।

২৩.

রেণুর ঘরে এই মুহূর্ত কারো মুখে কথা নেই।

বঙ্গবন্ধু একবার বললেন, জামিলকে আসতে বলেছিলাম। ও বলল, আমি এক্ষুণি বের হচ্ছি। ও বোধহয় আসতে পারছে না। নিশ্চয় কোথাও আটকে গেছে। আমি ডাকলে, ও না আসার লোক নয়।

রেণু কান্না-ভেজা কণ্ঠে বলেন, তিনি কোনো বিপদে পড়েন নি তো? আল্লাহু, আল্লাহু–

রেণুর মৃদু কান্নার ধ্বনি ঘরময় ছড়িয়ে যায়। অন্যদের বুকের ভেতর শব্দ জমতে থাকে। কেউ কোনোদিন অনুভব করেনি যে বুকের ভেতরে শব্দ জমতে পারে। কান্নার শব্দ পাথরের মতো শক্ত হতে পারে। তারপরও এমনই হচ্ছে। কারণ আজ একটি ভয়াল রাত। চারদিক তোলপাড় করা হিংস্র উন্মত্ততা গ্রাস করেছে প্রকৃতির নিয়মকে। আজকের রাত তাই দিন ও রাতের পরিক্রমার সময় নয়। হিংস্র দানবের বুটের নিচে পদদলিত অন্যরকম রাত। মানুষের সভ্যতায় বারবার এমন রাত আসে না। মানুষই এমন রাত তৈরি করে, যখন তার ভেতরে দানবের হিংস্রতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষের হিংস্রতার শেষ নেই, আবার মানুষই সোনালি সময় তৈরি করে— প্রেম-ভালোবাসায়-মর্যাদায়-শান্তির জয়গানে। এই নিষ্ঠুরতম সময়ে যাবতীয় বোধ মুখ থুবড়ে পড়েছে।

তখন বঙ্গবন্ধুর বুকের ভেতরও রেণুর কান্নার শব্দ জমে পাথর হতে থাকে। কতবারইতো কাঁদতে দেখেছেন রেণুকে। জলের সঙ্গে মৃদু শব্দও ছিল, কিন্তু কান্নার এমন ধ্বনি কখনো তাঁর বুকের কোণায় জমে পাথর হয়নি, যে পাথর সরানোর সাধ্য কারো নেই। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁর প্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। তাঁর উদারতা ছিল, নীচতা ছিল না। দল-মতের উপর মানুষকে দেখতেন। কোটারি করতে জানতেননা। কখনো গ্রুপ করারও চেষ্টা করতেন না। যোগ্যতার বিচারে মানুষকে পছন্দ করতেন। একইভাবে বিশ্বাসও করতেন। নিজের নীতি, কাজের প্রেরণা, দক্ষতা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ফল ভালো হয়নি। অসংখ্যবার অপমানিত হয়েছেন। মানুষের নীচতার কাছে পরাজিত হয়েছেন। এসব কিছু হাসিমুখে মেনে নেয়ার ধৈর্য ও সাহস তাঁর ছিল।

আজ তেমন একটি মুহূর্ত তাঁর সামনে। নিজের জীবন দিয়ে এই সময়কে দেখতে হচ্ছে। ধৈর্য ও বিনম্রতার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। মানুষের অন্যায় আচরণের সামনে নিশ্চুপ থাকতে হচ্ছে। তাঁর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে অস্ত্রের সামনে। হিংস্র উন্মত্ততার সামনে।

রাজনীতির দীর্ঘ সময় পাড়ি দিতে গিয়ে কত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাদের বিরোধীতা দেখেছেন, প্রতিরোধ দেখেছেন, কিন্তু হিংস্রতা দেখেননি। পাকিস্তান আর্মিকে তার মুখোমুখি দেখেছেন, কিন্তু এভাবে নয়। সাত মার্চের ভাষণের সময় রমনা রেসকোর্সের উপর উড়েছিল পাকিস্তান বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার। আবার ফিরে গেছে তারা। পঁচিশের কালোরাতে ওরা এসেছিল বত্রিশ নম্বর বাড়িতে, কিন্তু এমন আচরণ করেনি। আজ—। তিনি আর ভাবতে পারলেন না। গলার কাছে আটকে থাকল শরীর তোলপাড় করে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস।

পরক্ষণে আবার ভাবলেন, মানুষের ভালোবাসা যেমন পেয়েছেন তেমনি তাদের পরশ্রীকাতরতাও দেখেছেন। দেখেছেন ভাইয়ের উন্নতি দেখেলেও খুশি হয় না কাছের মানুষ। তাই এ দেশের বাঙালি সব রকম গুণ নিয়েও ইতিহাসের লম্বা সময় ধরে কেবলই নির্যাতন সয়েছে। বঞ্চনার শিকার হয়েছে। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের সম্পদের অভাব নেই। এমন উর্বর জমি পৃথিবীর কম দেশেই আছে। তারপরও এ দেশের মানুষ গরিব। কারণ নিজের দোষেই নিজেরা শোষিত হয়েছে। ইতিহাসের মীরজাফর একা নয়। বিভিন্ন সময়ে শত শত মীরজাফর তৈরি হয়েছে। এই মীরজাফরদের পদচারণা বাংলার জনপদকে বিপন্ন করেছে বারবার। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। রুখে দাঁড়িয়েছে শতবার। কিন্তু বাঙালির প্রকৃত মুক্তি ঘটেনি। যতদিন বাঙালি নিজের পরিচয়কে ঠিক জায়গায় দাঁড় করাতে না পারবে ততদিন বাঙালির মুক্তি আসবে না। আমি আমার রাজনীতির জীবনে বাঙালির মুক্তি চেয়েছি। বাঙালির মর্যাদা চেয়েছি। একজন রাজনীতির মানুষের এটা কি অনেক বড় চাওয়া? কার কাছে আমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাব? এই সময় মীরজাফরদের। আত্মত্যাগে ওদের বিশ্বাস নাই। ওদের বিশ্বাস স্বার্থ উদ্ধারে। এখন ওরা সেই উন্মত্ততায় নিজেদের সমর্পণ করেছে। এখন আমার চারপাশে মানুষ নাই।

তখন শুনতে পান জামালের কণ্ঠস্বর।

আব্বা।

তুই কি ভয় পাচ্ছিস রে? তুই না একটি যোদ্ধা ছেলে?

ওদের বুটের শব্দ আর শুধু এই বাড়িতে নেই। শব্দ ঢাকা শহরের সবখানে পৌঁছে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি। বুঝতে পারছি না জামিল আসতে পারল না কেন। জামিলের ফোর্স কোথায় গেল? গণভবন থেকে এই বাড়ির দূরত্ব তো বেশি নয়? বুঝতে পারছি না সফিউল্লাহর কি হলো। ওর ফোর্স কি ওর কথা শুনছে না? ওরা কি ওকে আটকে রেখেছে? বের হতে দিচ্ছে না? না এসব ঠিক নয়। আমি বুঝতে পারছি ওরা অসহায় হয়ে গেছে। সবটাই ওদের নিয়ন্ত্রণে, যারা আজকের ঘটনা ঘটাবে বলে প্রস্তুত হয়েছিল। আমার একটাই জিজ্ঞাসা ওদের কাছে, ওরা কি চায়? ওদের চাওয়া পূরণ করার জন্য এতকিছুর আয়োজন কি দরকার ছিল? আমাকে তুলে নিয়ে গেলেইতো হতো? আমিতো ওদের সঙ্গে যেতে রাজী ছিলাম? এখনতো ওরা আর্মির শৃঙ্খলা নষ্ট করছে। দেশের শৃঙ্খলা নষ্ট করে ওরা কি চায়?

রেণু কান্না থামিয়ে বলেন, কি চায় এখনও বুঝতে পারছ না যে ওরা কি চায়?

ওরা ক্ষমতার দখল চায় আম্মা। ওরা সিংহাসন চায়।

জামালের কথায় আবার রেণু কান্না থামিয়ে বলেন, হায় রে ক্ষমতা!

তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রবল তিক্ততা ঝরে পড়ে। বঙ্গবন্ধু চমকে রেণুর দিকে তাকান। রেণু কখনো বলেননি, ঘর-সংসার ফেলে রাজনীতি করতে হবে না। বলেননি এত কষ্ট সয়ে রাজনীতি করতে হবে না। বলেননি, এত জেল-জুলুম নির্যাতন সয়ে রাজনীতি করতে হবে না। রেণু ঠিক নিজের বোঝার ক্ষমতা দিয়ে রাজনীতি বুঝেছেন। রেণু বাংলার মানুষের মুক্তি চেয়েছেন, মর্যাদা চেয়েছেন। হায় রেণু, সেই চাওয়া এখন তোমার জীবনের কাল হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর মাথায় স্মৃতি পূর্ণ হয়ে ওঠে। কতকিছু বারবার মনে আসছে। কলকাতায় পড়ার সময় একবার দিল্লি গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মুসলিম লীগ পন্থী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। সোহরাওয়ার্দী কয়েকজন ছাত্রকর্মীকে সেই কনভেনশনে যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁরা কয়েকজন ঠিক করেছিলেন কনভেশন শেষে আজমীর শরীফ যাবেন। তারপরে আগ্রায় গিয়ে তাজমহল দেখবেন।

সবকিছুই সুন্দরভাবে শেষ হলো। আজমীর শরীফ, তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি, তানসেনের বাড়ি, সেকেন্দ্রা ইত্যাদি দেখার অভিজ্ঞতায় মন পূর্ণ হয়েছিল। এর মধ্যে শেষ হয়েছে টাকাপয়সা, আর হারিয়ে গেছে স্যুটকেস।

আনন্দের পাশাপাশি বিড়ম্বনা নিয়ে ফিরেছিলেন কলকাতায়। হাত খালি। নতুন কাপড় কেনারও টাকা নেই। যাহোক, যা হবার তাই হবে। নিজের জন্য এতকিছু তো তিনি কখনো ভাবেননি। আজও গায়ে মাখলেন না। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ভঙ্গি করে ভাবলেন, এবার লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে হবে। কলেজে বেতন বাকি পড়েছে। প্রায় বছর খানেকের বেতন। বাড়ি যেতে হবে। আব্বার কাছে না গেলে এই টাকো কোথায় পাবেন। দিল্লি ও আগ্রা থেকে রেণুকে চিঠি দিয়েছিলেন। রেণু চিঠি পেয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণের খবর জানতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি পৌঁছে রেণুর হাসি-মুখ দেখে খানিকটুকু স্বস্তি পেয়েছিলেন। রেণুকে টাকাপয়সার কথা বললে তিনি বললেন, এত ভাবতে হবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি না।

অর্থপূর্ণ হাসিতে ভরিয়ে দিয়েছিলেন সেই মুহূর্ত। তিনি ভেবেছিলেন, এই নারীর তুলনা তিনি নিজেই।

তারপরও ভুরু কুঁচকে চিন্তান্বিত স্বরে বলেছিলেন, আব্বাকে বলতে সাহস পাচ্ছি না।

সেই একই হাসি মুখে রেখে রেণু বলেছিলেন, আব্বাতো আব্বাই। প্রথমে হয়তো রাগ করবেন। তারপরে ঠিক হয়ে যাবেন। তুমি যে রাজনীতি করো আব্বা তা জানেন। আব্বার তাতে সায়ও আছে। রাজনীতি করার জন্য তোমাকে কখনো বকেননি।

ঠিক বলেছো। তারপর হাসতে হাসতে বলেন, আমার আব্বাকে তুমি আমার চেয়ে বেশি চেনো।

রেণুর কথায় তাঁর ভয় কেটে যায়। তাঁর ভ্রমণের সব কথা আব্বাকে বলেন তিনি। বোঝা যায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, বিদেশে যাওয়ার সময় বেশি কাপড়চোপড়ের দরকার কি? কম কাপড়চোপড় নেয়া ভালো। সুটকেস-ভরা কাপড়চোপড় নিয়ে লোক-দেখানোর তো দরকার নাই। আর নিলেও এসবের দিকে খেয়াল রাখতে হয়। বাক্সটানেও থাকা উচিত। এসব বোঝার বয়স তোমার হয়েছে।

তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আব্বার অসন্তোষের সামনে তো কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। কলকাতায় ফেরার তাড়া দিয়ে টাকাপয়সা দিলেন। বললেন, আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না। শুধু ভালোভাবে বি.এ পাশ করতে হবে। অনেক সময় নষ্ট করেছ। পাকিস্তান আন্দোলন আমিও সমর্থন করি। সেজন্য তোমাকে বেশি কিছু বললাম না। এখন মন দিয়ে লেখাপড়া কর। আমি দেখতে চাই তুমি বি.এ. পাশ করে ফিরে এসেছো। আর কোনো কথা শুনবো না।

সেদিন আব্বা, আম্মা, ভাইবোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রেণুর ঘরে ঢুকেছিলেন। রেণুর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। ওর কাছ থেকে বিদায় নেয়া ছিল কঠিন। ওর আচরণে অদ্ভুত পরিমিত বোধ আছে। কোথাও বাড়াবাড়ি নেই। ও জানে কোথায় কতটুকু কি করতে হবে। তারপরও ওকে বিদায়ের কথা বলতে তাঁর থমকে যেতে হয়। সেদিন ঘরে ঢুকে দেখেন রেণু দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বেশ কিছু টাকা। তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, নাও। দরকার মতো খরচ করবে।

কোথায় পেলে টাকা?

তোমারই জন্য কিছু কিছু টাকা জমিয়ে রাখি। আমি তো জানি যে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় তোমার টাকার দরকার হতে পারে। আব্বার টাকা দিয়ে কি অনেককিছু করা যায়? তাইতো একটু-আধটু রাখি। আমারই তো তোমাকে বুঝতে হবে। সেই ফুলশয্যার পর থেকে আমার বোঝার শুরু হয়েছে। আমি তোমাকে বুঝতে ভালোবাসি।

ওহ রেণু, আমি খুশি যে তুমি আমার জীবনে আছ। তুমি না থাকলে আমার জীবনের নানাকিছু এলোমেলো হয়ে যেত। তুমি আমার ভালোবাসার জায়গা তৈরি করেছ।

রেণু কথা বলতে পারেন না। শুধু চোখের জল আটকান। তিনি জানেন অমঙ্গলের অশ্রুজল আটকে রাখতে হয়। আজ তাঁর অশ্রুজল আটকে রাখার দিন। একসময় অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন, কলকাতায় গেলে আসতে চাও না। হাজার রকম কাজে জড়িয়ে পড়। এবার কলেজ ছুটি হলে বাড়ি আসবে।

আসব, রেণু আসব। আমি তোমার কাছেই আসব। আমি যেখানেই থাকি না কেন, যতদূরেই থাকি না কেন আমাকে তো তোমার কাছেই আসতে হবে। আমাদের বন্ধনের গিটঠুতে সোনালি ফিতার যোগ আছে। ওটা ফাঁক হবার নয়। এই বাঁধন খুলবে না রেণু।

এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু দেখতে পান রাসেলকে বুকে জড়িয়ে ধরে রেণু তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছেন। অপলক দৃষ্টি তাঁর। মনে হয় ওই চোখে আর কোনো দিন পলক পড়বে না। হ্যাঁ, আর পড়বেনা। সামনে আর সময় নেই। তিনি দেখতে পান রাসেলের গায়ে নীল রঙের শার্ট। যেন রেণুর বুক জুড়ে আকাশের সবটুকু অধিকার। এত নীল রঙ আর কোথাও নেই। ওই নীল বুকে নিয়ে রেণু জীবনের আশ্চর্য সময় অতিক্রম করছেন। নীল ছাড়া রেণুর চারপাশে আর কোনো রঙ নেই।

রেণুর পাশে বসে আছেন সুলতানা। নির্ণিমেষ তাকিয়ে আছেন কোনো দিকে। না, তাও ঠিক নয়, কোনদিকে তাকিয়ে আছেন তা বোঝা যায় না। ওর দৃষ্টির শূন্যতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঘরে।

সেই শূন্যতা ছিন্ন করে প্রবল গুলির শব্দ ধ্বনিত করে চারদিক। শূন্যতার টুকরো টুকরো অংশ ছড়াতে থাকে। তখন বঙ্গবন্ধুর বারবার একটি কথা মনে হয় যে মৃত্যুর কোনো শূন্যতা নেই। প্রবহমান জীবনের তা একটি অংশ মাত্র। মৃত্যু না থাকলে জীবনের অরুণোদয় ঘটত না। মৃত্যুই তো জীবনের আর একটি ভোর আনে।

আমরা এখন আর একটি ভোরের জন্য তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪.

ট্যাংক যখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেইটের সামনে আসে তখন মেজর ফারুক সাহেব ট্যাংক হইতে নামিলে মেজর মুহিউদ্দিন, মেজর নূর, ক্যাপ্টেন হুদা, রিসালদার সারোয়ার আর্টিলারির সুবেদার মেজর এবং আরো কয়েজন আর্টিলারির লোক তাহার সামনে আসিয়া কি যেন কথাবার্তা বলে। কিছুক্ষণ পরে মেজর ফারুক সাহেব ট্যাংক নিয়া চলিয়া যায়।

মেজর ফারুক সাহেব চলিয়া যাইবার পরে আমি রাষ্ট্রপতির বাড়ির ভিতরে আম গাছের নীচে কয়েকজন সিভিলিয়ানকে লাইন আপ অবস্থায় দেখি। তাহাদের মধ্যে একজনকে হাতে মারাত্মক জখম অবস্থায় দেখি। ঐ সময় আমার রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট কিসমত হাশেম, রিসালদার মুসলেম উদ্দিন, দফাদার মারফত আলী, এল.ডি. আবুল হাশেম মৃধাকেও সেখানে দেখিতে পাই। একটু পরে আমি হাতে জখম প্রাপ্ত লোকটাকে দেখাইয়া রিসালদার সারোয়ারকে বলি, ঐ লোকটাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। তখন মেজর নূর সাহেব আমার উপর ক্ষিপ্ত হইয়া অস্বাভাবিক আচরণ করিতে থাকে। আমিও তাহার প্রতি কিছু ক্ষিপ্ত হইয়া বলি, আমার অফিসার জে.সি.ও. যাহারা এখানে আছেন তাহারা অর্ডার দিবেন। তখন মেজর নূর সাহেব আমার উপর আরো ক্ষিপ্ত হইলেন। তখন মেজর মুহিউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন হুদা সাহেব হস্তক্ষেপ করিয়া আমাকে বাহিরে পাঠাইয়া দেন। কিছুক্ষণ পরে একটি লাল রঙের কার পূর্বদিক হইতে কয়েকজন জোয়ান ধাক্কাইয়া আনিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতর পশ্চিম পাশে নিয়া রাখে। গাড়িটির ভিতর আমি একটি লাশ দেখতে পাই। পরে জানিতে পারি যে, উহা কর্ণেল জামিল সাহেবের লাশ।

কতটা সময় কেটে গেছে তার হিসেব রাখেননি আঞ্জুমান আরা। জামিল যাওয়ার পরে সেই যে বসে আছেন তো আছেনই। তিন মেয়ে ঘুমুচ্ছে। ওরা কিছুই টের পায়নি। ছোট বোন পারুল বেড়াতে এসেছে। ও এ ঘর ও ঘর পায়চারি করে। কখনো কাছে এসে বসে। বলে, বুবু, দুলাভাইয়ের দায়িত্ব অনেক। ভুলে যাচ্ছ কেন যে, তিনি ডিরেকটর, ফোর্সেস ইনটিলিজেন্স। কাজ শেষ হওয়া আগে তো বাড়িতে ফিরতে পারবেন না।

ভোর হয়ে গেছে। গোলাগুলির শব্দতো আসছে না রে। মনে হয় পরিস্থিতি বোধ হয় শান্ত হয়েছে। তাহলে ও আসছে না কেন? ওকে যারা নিয়ে গেছে তারা আটকে রাখেনি তো?

হ্যাঁ, আটকেতো রেখেছে। বলেছি না তাঁর অনেক কাজ। কাজ শেষ না হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসবে কি করে?

ঠিক আছে, তোর কথা বুঝলাম। কিন্তু একটাতো টেলিফোন করতে পারে। ফোনওতো করছে না। ও কি বুঝতে পারছে না যে আমি কত টেনশনে আছি।

আঞ্জুমান আঁচলে চোখ মোছেন। বলেন, মনকে বোঝাতে পারছি না।

পারুল কথা বলে না। বোনের কাছে বসে হাত ধরে রাখে। আকস্মিকভাবে আবার গোলাগুলির শব্দে ঝনঝন করে ওঠে বাড়ি। দুই বোন চমকে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে। থরথর করে কাঁপে দুজনে। দুজনে একসঙ্গে জোরে জোরে দোয়া পড়তে থাকে। আঞ্জুমান আরা দেখতে পান মেয়েদের ঘুম ভেঙে গেছে। ওরা দৌড়ে মায়ের কাছে আসে। গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। সবচেয়ে ছোট সাড়ে চার বছরের ফাহমিদার কান্না কিছুতেই থামে না। ও দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখ লুকায়। তাহমিনা আর আফরোজা কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করে, এত গুলি কোথায় হচ্ছে মা? রাস্তায়? নাকি কোনো বাড়িতে? কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে মা?

কিছুই বুঝতে পারছি না মারে। আয় তোরা আমার কাছে বোস।

আব্বু কোথায় গেলেন?

তাহমিনা মায়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়। মায়ের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আব্বু-আব্বু করে কাঁদতে আরম্ভ করে, আফরোজাও চিৎকার করে।

আমার আব্বু কোথায় গেল? আব্বু বাড়িতে নেই কেন? আব্বুকে বাড়িতে আসতে বলো মা। আব্বুকে ফোন করছো না কেন?

কোথায় করবো মা?

কেন আব্বু যেখানে আছেন, সেখানে। মা ফোন করো, মা –

তোমার আব্বু কোথায় আছে তাতো আমি জানি না।

আর কোনো শব্দ নেই। পারুল উঠে চলে যায়, এত কথা ও শুনতে পারছে না। আকস্মিকভাবে নিস্তব্ধ হয়ে যায় পুরো বাড়ি। ছোট ফাহমিদাও কাঁদছে না। ও বোবা হয়ে গেছে। মূঢ় বালিকার চেহারা দেখে বুক ভেঙে যায় আঞ্জুমানের। ভাবেন, কীভাবে বড় হবে এরা? কোন স্বপ্ন নিয়ে? ওদের চোখের জল কি আজকের দিন শেষ হলে পড়া বন্ধ হবে? নাকি এই চোখের জল পড়া ওদের জীবন থেকে কখনো শেষ হবে না? আঞ্জুমান মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ওর কাঁধে মুখ রাখেন।

তখন পারুল ট্রানজিসটার হাতে ছুটে আসে বোনের কাছে।

বুবু।

আঞ্জুমান মুখ তোলেন।

বুবু। বু-বু বু-বু। পারুলের মুখে বুবু ডাক আটকে যায়। জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়। এমন তোতলানো স্বরে তিন কখনো কথা বলেননি।

কি হয়েছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুবু শোন রেডিওতে কি বলছে।

শোনা যায় মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর, আমি মেজর ডালিম বলছি। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।

তখন চিৎকার করে কেঁদে ওঠে আঞ্জুমান আরা। বলতে থাকেন, তাহলে জামিল কোথায়? আমি কার কাছে জামিলের খবর পাব? ড্রাইভার বললো, জামিলকে আর্মির লোকেরা ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় ধরে নিয়ে গেল ওকে?

বুবু শান্ত হও। ধৈর্য ধর। দোয়া পড়।

পারুল তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন। কে কাকে শান্ত করবে, ঘরজুড়ে কান্নার শব্দ জমতে থাকে। শিশু থেকে বয়সীরা সবাই কাঁদছে।

কান্না এখন এই বাড়িতে একটি নিদারুণ সত্য। কান্না ছাড়া এই বাড়িতে কোনো ধ্বনি নেই।

কতক্ষণ যায় কেউ জানে না।

ফোন বাজে। আঞ্জুমান আরা চোখ মুছে ফোন ধরেন। ফোনের অপর প্রান্তে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ। ফোন ধরার আগে আঞ্জুমান আরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। একবার মনে হয়েছিল চারদিক ভেঙে পড়ছে। পরমুহূর্তে মন শক্ত করেন। স্থির কণ্ঠে সেনাপ্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, জামিল কোথায়? ড্রাইভার বলেছে ওকে নাকি সেনা সদস্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছে?

সেনাপ্রধানের কণ্ঠস্বর থমকে যায় প্রথমে। তারপরে বলেন, ভাবি কি বলব–জামিল ভাই– আপনাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব আমি জানি না– ভাবি জামিল ভাই–

আকস্মিক বিমূঢ়তায় তাঁর হাত থেকে রিসিভার পড়ে যায়।

বুবু কি হয়েছে? বুবু খবর কি?

তিনি পারুলের কথার উত্তর দিতে পারেন না। আবারও চারদিক তোলপাড় করে সবকিছু হুড়হুড় করে ভেঙে পড়তে থাকে। সেনাপ্রধানের সামান্য কথা তিনি ঠিকমতো বুঝতে পারেননি যে সেনাপ্রধান কি বলতে চেয়েছিলেন। না বোঝার অস্পষ্টতা তার ভেতরে গুমরে মরছিল।

আবারও নিস্তব্ধ সময় বাড়ির ঘরে-বারান্দায়-বাইরে থমকে থাকে। যেন সূর্যের আলো চারদিকে আছে ঠিকই শুধু এ বাড়িতে নেই। চারদিকে বাতাস বইছে, শুধু এ বাড়িতে বাতাস ঢোকে না। কেমন করে মানুষের জীবন সবকিছুর বাইরে চলে যায় তা এই প্রথম বুঝতে পারলেন আঞ্জুমান আরা।

কতক্ষণ কেটে যায় জানেন না। পারুল কিছু রান্না করে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াচ্ছে। ওদের খিদে পেয়েছে। কিছু একটা খেতে চাইছে, কিন্তু পরমুহূর্তে তা আর খেতে পারছে না। বড় দুই মেয়ে বাবার জন্য বেশি ভেঙে পড়েছে। পারুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় হাত বুলিয়ে বলে, খা, খেয়ে নে। এটুকু তো খেতে হবে। না খেলে বাবার জন্য অপেক্ষা করবি কীভাবে? তোদের তো ঘুম পাবে।

আমরা যে খেতে পারছি না। গলা দিয়ে নামছে না খালামণি।

সোনা আমার। এইটুকু শেষ কর। এর বেশি খেতে বলবো না।

তাহমিনা আর আফরোজা ওইটুকু খায়। খেতে খেতে বলে, খালামণি খাওয়া হলে তোমার কাছে আব্বুর গল্প শুনবো।

হ্যাঁ, তোদের আব্বুর গল্প আমি তোদের শোনাব।

মনে করো আমাদের আব্বু রাজপুত্র। আব্বুর পঙ্খীরাজ ঘোড়া ছিল। পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আব্বু সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে যেত–

হ্যাঁ সেই গল্পটাই তোদেরকে বলব।

ঠিক আছে তাহলে আমরা এক চুমুকে দুধের গ্লাস শেষ করব খালামণি।

পারুল বুঝতে পারে রাজপুত্র আব্বুর কথা শোনার জন্য ওদের চেহারায় সামান্য আলো ফিরে এসেছে।

ওদের খাওয়া শেষ হলে পারুল দুধের গ্লাস বুবুর সামনে ধরে বলে, বুবু এই দুধটুকু খাও।

দুধ? আমি কখনো দুধ খাইনি। কোনদিনও না।

কোনোদিন খাওনি তো কি হয়েছে? আজকে খাও।

এমন কালো কুচকুচে একটা জিনিস দুধের মতো সাদা জিনিস কেউ খায় না পারুল। একটু থেমে আবার বলেন, এমন দিন আমাদের জীবনে আসেনি পারুল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মানুষের মনে আনন্দ ছিল। দুঃখের মধ্যেও মানুষ স্বাধীনতার কথা বলেছে। স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে নিজেদের কষ্ট ভুলেছে। আজ আমাদের সামনে এ কেমন দিন পারুল? অন্ধকার ছাড়াতো আমি সামনে আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে কি ওরা স্বাধীনতা লাভের প্রতিশোধ নিল? ওহ আল্লাহ, আমার কিছু ভালোলাগছে না।

আঞ্জুমান কাঁদতে শুরু করেন। সেনা প্রধান কি বলেছেন সে কথা তাঁর কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি জামিলের নাম ধরে কিছু একটা বলেছেন। সবকিছু শোনার মতো ধৈর্য তার ছিল না। তিনি কি সেনা প্রধানকে ফোন করবেন? পারুলের দিকে তাকিয়ে বলেন, পারুল আমি কি সেনা প্রধানকে একটা ফোন করব?

ফোন? কেন?

জামিলের কথা তিনি কি যেন বলেছিলেন। আমি বুঝতে পারিনি।

আমরা দুলাভাই ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করি বুবু।

আঞ্জুমান বিড়বিড় করেন, অপেক্ষা? তুই বলছিস অপেক্ষা করতে!

সেটাই ঠিক হবে বুবু। আমার মনে হয় সেনা প্রধানকে এখন ফোনে পাওয়া যাবে না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর এখন অনেক কাজ। নিশ্চই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসে বা বাড়িতে নেই। বুবু তুমি এই দুধটুকু খাও।

তুই আমাকে জোর করছিস কেন পারুল? বলেছি তো দুধ খাবো না।

তোমাকে আর কোনোদিন দুধ খেতে বলবো না। শুধু আজকে।

অন্যকিছু খাবে? আনব?

তুই আমার সামনে থেকে সরে যা পারুল।

পারুল দুধের গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। যদি তিনি বলেন, আচ্ছা দে। এক চুমুকে শেষ করে ফেলি।

তিনি দোয়া পড়ছেন। তাঁর ঠোঁট নড়ছে। তিনি আরও কিছু করতে চাইছেন। পারছেন না। একসময় কান খাড়া করেন। পারুলের দিকে তাকিয়ে বলেন, আয়েনউদ্দিন কাঁদছে না? ও কাঁদছে কেন? ওর কেউ কি সেনাদের গুলিতে মারা গেছে?

পারুল দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে আসে। দেখতে পায় বাচ্চারা খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে।

কি রে খেলি না? এতটুকু খাবার খেতে এত সময় লাগে?

খেতে তো ইচ্ছে করছে না। আমাদেরকে জোর খেতে বলো না খালামণি। অন্তত আজকের দিন খেতে বলো না। আব্বু যখন বাড়িতে আসবে তখন একসঙ্গে অনেককিছু খাব। দেখো, ঠিক খাবো, প্রমিজ। আফরোজা আর আমি দু'টো রুটি খেয়েছি। শুধু খিদে তাড়ানোর জন্য।

উঁহু তা হবে না। আজকেও খেতে হবে। না খেলে মাথা ঘোরাবে। ঠিকমতো হাঁটতে পারবিনা। রূপকথার রাজপুত্র আব্বুর গল্প শুনতেও ভালোলাগবে না। মনে হবে ঘুম পাচ্ছে।

না, না, আব্বুর গল্প শোনার সময় আমাদের একটুও ঘুম পাবে না। দাও, আমাদেরকে যা দেবে তাই দাও। আমরা খাবো। খেতে না ইচ্ছা করলেও খাব।

কেঁদে ফেলে মেয়েরা।

ছোট্ট আফরোজা বিষন্ন কণ্ঠে বলে, আমি তোমার কথা শুনে সব খেয়েছি খালাআম্মু। তোমাকে আর কোনোদিন আমাদেরকে খেতে বলতে হবে না। আমরা নিজেরা ঠিকই সব খাবার খাবো। আমাদেরকেতো আব্বু রাজপুত্রের গল্পটা একদিন সবার কাছে বলতে হবে।

লক্ষ্মী মা আমার।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে চমকে তাকান পারুল। কারা আসছে? কান খাড়া করেন। শব্দ বুঝতে চান। ভাবেন এই ভয়াবহ সময়ে কার সাহস হলো এ বাড়িতে আসতে? এলোই বা কি করে? শহরের রাস্তায় মানুষ কি চলাচল শুরু করেছে? অল্পক্ষণেই সেই বাড়িতে হাজির হলো কয়েকজন সেনা। ওদের পেছনে পেছনে এসেছে আয়েনউদ্দিন। পাংশু, বিবর্ণ চেহারা নিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। মুখে কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। মাথা নিচের দিকে নোয়ানো। বেগম সাহেবের চোখে চোখ রাখার সাহস নেই।

আঞ্জুমান কালো পোশাক-পরা সেনাদের দিকে তাকান। ওদের হাতে অস্ত্র। ওরা উদ্ধত। ওদের আচরণে সৌজন্য এবং বিনয় নেই। ওরা সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করেন, আপনি তো মিসেস্ জামিল?

তিনি ঘাড় কাত করে মৃদু স্বরে বলেন, হ্যাঁ।

আপনাকে এই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

বাড়ি ছেড়ে দেবো? তিনি বিস্ময়ে মর্মাহত।

সেনারা বুট ঠুকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আবার বলে, এই বাড়িতে আপনি আর একদিনও থাকতে পারবেন না।

তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ওদের কথার উত্তর দিতে হবে এমন ভাবনাই তাঁর মাথায় আসে না। ওরা কে? কেন এমন কথা বলছে? ওদের এসব কথা বলার অধিকার আছে কিনা এটাই তার মাথায় মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাড়ি ছাড়বে কেন? এখন পর্যন্ত তো জানাই হলো না যে জামিল কোথায়? তার কাছ থেকে কোনো উত্তর শোনার অপেক্ষা না করে তারা বেরিয়ে যায়। হুকুম দিয়ে গেছে এটাইতো অনেক। তার আবার জবাবের প্রত্যাশা কি। ওদের পিছে পিছে আয়েনউদ্দিন নেমে যায়। তিনি তখনও দাঁড়িয়ে থাকেন। শুনতে পান পায়ের শব্দ। ভাগ্য ভালো যে এই বাড়িতে কোনো লঙ্কাকান্ড ঘটায়নি ওরা। ঘটাতেও পারতো। পাকিস্তানি আর্মির মতো বেয়োনেটের খোঁচায় তুলে নিতে পারতো শিশুদের– কিংবা দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে দিতে পারতো পুরো পরিবারকে।

আঞ্জুমান বুঝলেন তাঁর সামনে কঠিন নিস্তব্ধ সময়।

ফিরে আসে আয়েনউদ্দিন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। আঞ্জুমান আরা খানিকটুকু গলা উঁচু করে বলেন, ওরা কারা?

যারা শহরে ট্যাংক নামিয়েছে, গুলি করে শহর কাঁপাচ্ছে ওরা তাদের লোক। আমি আর বেশিকিছু জানি না বেগম সাহেব। আপনি কর্ণেল মাশরুরুল হক সাহেবের কাছে ফোন করেন।

না, কাউকে ফোন করার দরকার নাই। অপেক্ষা করে দেখি কি হয়।

বিকেল বেলা আর্মির পিক-আপ আসে সেই বাড়ির সামনে। বাড়ির সব মালপত্র নিয়ে সবাইকে পৌঁছে দেয় কর্ণেল জামিলের ভাই জালাল উদ্দিনের লালমাটিয়ার বাসায়। আয়েনউদ্দিন সঙ্গে থেকে সবকিছু দেখাশোনা করে।

আঞ্জুমান আরা তখনও জানেন না জামিলের কি হয়েছে। অনুমান নির্ভর করে মৃত্যুর মতো সরল সত্যের ব্যাখ্যা তখনও তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। যে লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িতে জামিল বের হয়েছিল সে গাড়ির ড্রাইভারতো তার সামনে। তার কি হয়েছে সে কথা তো ও ভালো জানে। ওতো বলেছে, ধরে নিয়ে গেছে। ফিরেওতো আসতে পারে। তারপরও ধরে নিতে হয় যে কিছু একটা হয়েছে। কি-কি হয়েছে! জালাল উদ্দিনের স্ত্রী তাঁকে বললেন, হতভাগী তুই আসলি!

ভাবী আপনার বাসায় আসব না কেন? কতবারইতো এসেছি। তখনতো এমন করে বলেননি। হতভাগী বলেন নি। আজ আমি হতভাগী কেন? ভাগ্য আমার কোথায় ভেঙে গেল? কোথায় আমি খুইয়ে এলাম আমার ভাগ্যের সুবর্ণরেখা? আঞ্জুমান আরা আপ্রাণ চেষ্টা করেন নিজেকে স্থির রাখতে। জামিলকে তো একবার দেখতে হবে তাঁর। না দেখে কেমন করে মেনে নেবেন যে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে!

শাশুড়ি বললেন, নামাজ পড়, দোয়া-দরুদ পড়।

তিনি শাশুড়িকে বলতে পারলেন না, আম্মা আমি তো দোয়া-দরুদ পড়ছি। যখন ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল তখন থেকেই পড়ছি। আপনারা কেন আমাকে নতুন করে পড়তে বলছেন। সেনারা আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার মানে জামিলের নামে বরাদ্দ বাড়িতে আমাকে আর থাকতে দেয়া হবে না। তাহলে আমাকে কি ধরে নিতে হবে যে জামিল নেই? না, এত তাড়াতাড়ি এভাবে আমি মানতে পারব না। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি দোয়াদরুদ পড়তে পড়তেই অপেক্ষা করব, যতক্ষণ আমি জামিলকে শেষবারের মতো দেখতে না পাব ততক্ষণের জন্য অপেক্ষা। অপেক্ষার সময় অনেক দীর্ঘ। আমার জন্য সেই সময় এখন মহাকাল।

বুক-ভাঙা কান্নায় তখন লালমাটিয়ার ঘরের বাতাস ভারী। মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে হেচকি তুলছে। কেউ ওদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরছে। কেউ স্তব্ধ হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। যেন এমন মুহূর্তে কি করতে হয় তা তাদের জানা নেই। এমন একটি দিন তাদের জীবনে কখনো তো আসেনি। তারা কি করে জানবে যে এত পাহাড়সমান শোক সামাল দেয়ার উপায় কি। দু'কান ভরে শিশুদের কান্না শোনার নিয়তি এখন এ বাড়ির সবার।

চারদিকে ঝকঝকে রোদ। আলো ঝলমলে দিন। নীলাভ আকাশে পেঁজো তুলার মতো মেঘের ভেসে যাওয়া যেন জীবনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। শ্রাবণের আকাশে মেঘের ভেসে থাকায়, আকাশের নীলে, মেঘের শুভ্রতায় মিশে যেতে সাধ হয় আঞ্জুমান আরার। বাইরে তাকালে মনে হয় যেন প্রকৃতি তৈরি হয়ে আছে কোথাও কাউকে বরণ করে নিতে। এইসব কোলাহল থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে সব ইচ্ছা পূরণ হবে। কারো কাছে তার আর কিছু চাইবার নাই। আঞ্জুমান আরার মনে হয় শব্দ থেকে দূরে থাকতে, যেন শব্দ তার বুকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মগ্নতা ছিন্ন না করে–যেন দোয়া পড়ার নিবেদিত সময় তার কাছ থেকে দূরে চলে না যায়। তিনি কারও মুখের দিকে তাকাতে পারেন না। শুধু ছোট মেয়েটি ঘুরে ঘুরে আসে। মায়ের মনোযোগ চায়। বুঝতে পারে না আজ কেন মা তাকে ঠিকমতো দেখছে না। মাতো কখনো এমন করেনি। কত আদরের মাখামাখি ছিল মায়ের সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। একসময় মেয়েটি মায়ের কোলে মুখ গুঁজলে মা ওকে প্রবল ব্যাকুলতায় জড়িয়ে ধরেন। তখন ওর কানে ভেসে আসে বাবার কণ্ঠস্বর, মামণি দুধ খেয়েছ তো? দুধের গ্লাসটা শেষ করলে আমি তোমাকে চকলেট দেব। খেয়ে ফেলো মামণি।

মেয়ে মুখ তুলে চারদিকে তাকায়। প্রবলবেগে মাথা ঘোরায়।

আঞ্জুমান আরা মৃদু স্বরে বলেন, কি হয়েছে সোনা?

আব্বু ডাকছে আমাকে। আব্বু কোথায়? আব্বু চকলেট এনেছেন আমার জন্য। আব্বু – আব্বু –

ওর চিৎকারে আবার স্তব্ধ হয়ে যায় ঘর। মায়ের বুকের ভেতরে মুখ রেখে কাঁদলেও সে শব্দ গুমরাতে থাকে বাড়িজুড়ে। বাড়ির প্রত্যেকের বুকের ভেতর তখন শোকের মাতম। চার বছরের মেয়েটি শোক বোঝে না। বোঝে কান্না। বড় অল্প বয়সে ওকে শোক না বুঝেই শোকের কান্না বুঝতে হলো। এই মুহূর্তে ও এক নিরুপায় শিশু।

কাঠগড়ায় সাক্ষী সিরাজুল হক বলে যাচ্ছেন, আমার ডিউটি পয়েন্টে কর্ণেল জামিল মারা যায় নাই। আমার ডিউটিকালীন কিছু সৈনিককে একটি লাল কার ঠেলিয়া ৩২ নম্বরের দিকে নিতে দেখিয়াছি।

আদালতের দেয়ালের গায়ে শিল্পীর আঁকা জলরঙের ছবি ফুটে ওঠে– একটি লাল গাড়ি, গাড়ির ভেতরে লাশ এবং লাশের পা বাইরে থাকার ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে একজন নারী এবং তিনটি শিশু। শিল্পীর আঁকায় তাঁদের বিস্মিত চেহারা এবং ফিগার দূরবর্তী পাহাড়ের গায়ে হেলান দেয়া মেঘ যেন। সাক্ষীর কণ্ঠস্বর নেপথ্য সঙ্গীতের মতো ধ্বনিত হয়। আদালতের ঘরে বসে থাকা মানুষেরা আকস্মিক বিমূঢ়তায় গলার কাছে আটকে যাওয়া কান্নার দলা ধরে রাখে।

২৫.

আমি সৈয়দ আহমদ। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

40. Hon. Lieutenant (Rtd.) Syed Ahmed
P. W. -40

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি ৬২ বয়স্ক, অনারারী লেফটেন্যান্ট (অবঃ) সৈয়দ আহামেদের জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৩/১১ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম অনারারি লেফটেন্যান্ট (অবঃ) সৈয়দ আহামেদ, বয়স– ৬২ বৎসর, আমার পিতার নাম– মৃত হাবিবউল্লাহ মুন্সি, গ্রাম– ইসলামপুর, থানা– দোয়ারা বাজার, জেলা– সুনামগঞ্জ। বর্তমান ঠিকানা– সি.বি ৫৩, কচুক্ষেত, পুরানবাজার, ঢাকা।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্টে আমি ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারে অনারারি ল্যাফটেন্যান্ট হিসাবে কর্মরত ছিলাম। পূর্বের টাইম অনুযায়ী ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্টে রাত্র ৮-৩০ টার দিকে আমি ফল-ইন করাই। তখন ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের কমান্ডার ছিলেন মেজর ফারুক রহমান। ফল-ইন হওয়ার পর মেজর মহিউদ্দিনকে (ল্যান্সার) আর্মি প্যারেড হস্তান্তর করি। মেজর মহিউদ্দিন প্যারেড মেজর ফারুক রহমানকে হস্তান্তর করেন। তারপর আমি তাহাকে স্যালুট করিয়া আমার শরীর ভাল নয় বলিয়া জানাই। তিনি আমাকে ছুটি দিলে আমি বাসায় চলিয়া যাই। এরপর নাইট প্যারেড আরম্ভ হয়। আমি কাছেই অর্থাৎ ২০০ গজ দূরে আমার বাসার বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া বিশ্রাম নিতেছিলাম। কারণ রাত্র ১২টায় নাইট প্যারেড শেষ হইবার কথা। আনুমানিক রাত্র ২/৩টার দিকে RDM আমার নিকট একজন সৈনিক পাঠায়। সৈনিক আসিয়া আমাকে বলিল, RDM আপনাকে JCO মেসে যাইতে বলিয়াছে। আমি বলিলাম RDM কে আমার কাছে আসিতে বল। ১০/১৫ মিনিট পর RDM আমার কাছে আসিয়া বলে, স্যার আর্টিলারি আসিতেছে এবং আমাদের ট্যাংকও রেডি হইতেছে তাহারা উভয় মিলিয়া Combined ট্রেনিং করিবে। তাহারা হাতিয়ার এবং এ্যামুনিশন চায়। তখন আমি বলিলাম কোয়ার্টার মাস্টার দেলোয়ার সাহেবের পারমিশন আছে কিনা। তারপর আমি আরো বলিলাম, কোয়ার্টার মাস্টার জেসিও (QMJC) এবং গার্ড কমান্ডারকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাছে নিয়া আস।

১০/১৫ মিনিট পরে ঐ দুইজন আমার কাছে আসিয়া কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন দেলোয়ার সাহেবের একটি স্লিপ আমার কাছে দেয়। তখন আমি KOTE-এর চাবি ও কোয়ার্টার মাস্টারের স্লিপ, কোয়ার্টার মাস্টার জে. সি. ও.-কে দিলাম এবং বলিলাম স্লিপটা ট্রেজারিতে রাখার জন্য। অনুমান আধাঘণ্টা পরে আমার খেয়াল হইল যে, ট্রেজারিতে অনেক টাকা আছে। এই ভাবিয়া আমি কোয়ার্টার গার্ডে যাই। ট্রেজারি কোয়ার্টার গার্ডের সাথে। সেখানে গিয়া আমি ট্রেজারীর তালা সিলগালা ঠিক পাই। তারপর কোয়ার্টার মাস্টার জে. সি. ও. এবং গার্ড কমান্ডার আমাকে জানায় যে kote হইতে সৈনিকরা হাতিয়ার ও এ্যামুনিশন নিয়া গিয়াছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি ট্যাংক বাহিরে গিয়াছে কি? গার্ড কমান্ডার বলিল সব ট্যাংক স্টার্ট আছে। বাহিরে যাইবার জন্য তৈয়ার আছে এবং সি. ও. ফারুক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ফারুক সাহেব গেলেই ট্যাংক চলিয়া যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম– ফারুক সাহেব কোথায়? উত্তরে বলিল, ঐ যে ফারুক সাহেব আর্টিলারির সি. ও. রশিদ সাহেবের সহিত কথা বলিতেছে। তখন আমি দেখিলাম ফারুক সাহেব এবং রশিদ সাহেব সেখানে কথা বলিতেছে– তার পাশে L. M. G. ফিটকরা একটা জিপ আছে। এরপর ফারুক সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিল, রেজিমেন্টের দিকে খেয়াল রাখিবেন এবং গেইট বন্ধ করিয়া দিবেন। আমি ফারুক সাহেবকে বলিলাম, স্যার কোথায় যাইবেন? তিনি বলিলেন, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করিতে যাইব। আমি আরো বলিলাম, স্যার এই খবর শফিউল্লাহ সাহেব জানেন কি না। তিনি বলিলেন, দরকার মনে করি না।

এরপর আমি কোয়ার্টার মাস্টার জেসিও-কেসিও সাহেবের আদেশ শুনাইলাম। আদেশ শুনানোর পরে ফজরের আজান পড়ে। এদিকে ফারুক সাহেব ট্যাংকের দিকে গিয়া ট্যাংকে উঠে এবং রশিদ সাহেব জিপ লইয়া চলিয়া যায়। তারপর আমি নিজের কোয়ার্টারে চলিয়া যাই। ফজরের নামাজ আদায় করার ১০/১৫ মিনিট পরে রেডিওতে মেজর ডালিমের ভাষণ শুনিলাম। ভাষণে বলেন, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করা হইয়াছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি খুব মর্মাহত হইলাম। সকাল অনুমান ৮টার সময় ইউনিটে যাই। সেখানে মেজর শরিফুল হোসেন আমাকে বলিল, মেজর ফারুক সাহেব বঙ্গভবনে ফোর্সের খানা পাঠানোর জন্য ফোন করিয়াছে। খানা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমি সৈনিকদের বেতন বিতরণ করিতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিসালদার মোসলেম একদিন লেফটেন্যান্টের ব্যাচ লাগাইয়া আমার কাছে বেতন নিতে যায়। আমি তাহাকে বলিলাম, লেফটেন্যান্ট পদে তোমার গেজেট বিজ্ঞপ্তি হয় নাই। তোমাকে বেতন দিতে পারিবনা।

তখন সে পিস্তল বাহির করিয়া বলে, আমি তোমার বিরুদ্ধে ফারুক সাহেবের কাছে নালিশ করিব। পরে ফারুক সাহেব তাহাকে বুঝাইয়া থামায়।

প্রমোশন!

শব্দটি চারদিকে তোলপাড় করে। একজনের কাঁধে আর একজন ব্যাচ লাগিয়ে দিলেই প্রমোশন হয়? আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাফায়েত জামিল বলেন, সেনা হেডকোয়ার্টারে ইন্টার সার্ভিস সিনিয়র অফিসারদের একটি মিটিং হয়। সেখানে বিডিআর ও পুলিশ প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। সেই মিটিংয়ে চেইন অব কমান্ডের বিষয় আলোচিত হয় এবং পরবর্তী কোনো বিষয়ে সংঘাত এড়ানোর বিষয় আলোচিত হয়। পরদিন ১৯শে আগস্ট সেনা হেডকোয়ার্টারের ঢাকাস্থ সিনিয়র আর্মি অফিসারদের একটি মিটিং হয়। সেই মিটিংয়ে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে মেজর ফারুক এবং রশীদ উপস্থিত থাকে। মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদের সেই মিটিংয়ে উপস্থিতি সেনা প্রটোকল বহির্ভূত বিধায় আমি বলি তাহাদেরকে চেইন অব কমান্ডে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলি– ইউ পিপল আর মিউটিনাস ডিসারটস অ্যান্ড কিলারস। ইউ উইল বি ব্রট ব্যাক টু দ্য চেইন অব কমান্ড অ্যান্ড ট্রাইড ফর ইওর ক্রাইম।

আমার কথা শুনিয়া তাহারা বাক্যহীন হইয়া পড়ে এবং বিষণ্ন মুখে বসিয়া থাকে।

১৫ই আগস্টের চক্রান্তকারী এবং হত্যাকারী অফিসাররা মেজর ফারুক এবং রশীদ সার্বক্ষণিকভাবে বঙ্গভবনে অবস্থান করিত। তাহাদের সঙ্গীয় অন্যান্য সহযোগী অফিসাররা রেডিও স্টেশনে অবস্থান করিয়া সার্বক্ষণিকভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে একটি অলিখিত রিভলিউশনারী কমান্ড কাউন্সিল গঠন করিয়া খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার পরিচালনা করিতেছিল।

বাতাসে উড়ে বেড়ায় তান্ডব উল্লাস।
স্থির হয়ে থাকে বাতাস।
কারণ হত্যাকান্ডের বিপরীতে বয় জলের স্রোত। বাতাসের গতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাকান্ডের বিপরীতে যায় সারিবদ্ধ মানুষের পথচলা। পাখিদের উড়ে যাওয়া। বাসা বাঁধা ডিম পাড়া। বাচ্চা ফোটানো।

হত্যাকান্ডের বিপরীতে চলে প্রকৃতির নিয়ম-কানুন। মানুষের তান্ডব উল্লাস তাই ক্ষণস্থায়ী। যে কারণে বাক্যহীন হয়ে যায় হত্যাকারীরা।

এখন এক উথাল-পাথাল সময়। নিয়ম ভঙ করে সময় আগে-পিছে ঘুরতে থাকে।

২৬.

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন সেনা প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ।

বুকের ভেতর প্রবল তোলপাড় চলছে। বারবারই বঙ্গবন্ধুর মুখ ভেসে ওঠে। একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন সম্ভব হয়েছিল এই মানুষটির জন্য। দেশভাগের আগে থেকেই রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল। দেশভাগের পরে রাজনীতিতে তাঁর প্রবল আসন ছিল সাধারণ মানুষের মনে। তিনি সাধারণ মানুষকে বুঝতেন। তিনি তাদের জন্য অন্যদের সঙ্গে আপোস করেননি। তিনি না হলে বাংলাদেশ নামক দেশটির জন্ম হতো না। তাঁর ডাকে এবং প্রেরণায় হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধ করেছিল। তিনি সরাসরি সামনে ছিলেন না। তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁর প্রেরণায় উজ্জীবিত ছিল মানুষ। তাঁর সাহস মানুষকে সাহসী করে তুলেছিল। তাঁরা অকুতোভয়ে যুদ্ধ করেছিল।

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আমার ব্যাটালিয়ন ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়া বিদ্রোহ করি এবং পাক-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করি। এই মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাথমিকভাবে প্রবাসী সরকার আমাকে সিলেট এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে আঞ্চলিক কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দেয়। পরবর্তীতে এই অঞ্চলকে ৩ নং সেক্টর হিসাবে নামকরণ করা হয় এবং আমি এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলাম। তখন এই সেক্টর ছাড়াও তিনটি নিয়মিত ব্রিগেড করা হয়। ঐ ব্রিগেডগুলির মধ্যে একটি ব্রিগেডের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয় এবং কমান্ডারদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়া ব্রিগেডের নামকরণ করা হয়। যেমন আমারটির নাম ছিল এস ফোর্স, জিয়াউর রহমানের ব্রিগেডের নাম ছিল জেড ফোর্স এবং খালেদ মোশারফ ব্রিগেডের নাম ছিল কে ফোর্স। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার কমান্ড প্রথমে ছিল অঞ্চল, তারপর সেক্টর এবং পরবর্তীতে ফোর্স ছিল। পক্ষান্তরে জিয়াউর রহমান প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কমান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। পরে জেড ফোর্সের কমান্ডার ছিলেন। তিনিও তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর হিসাবে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের টু আই সি ছিলেন। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল তখন চট্টগ্রামে ছিল। তিনিও সৈন্যদের নিয়া বিদ্রোহ করিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষে আমি আমার অর্থাৎ এস ফোর্স ৩ সেক্টর লইয়া ঢাকা প্রবেশ করি এবং যুদ্ধের পর ঢাকা গ্যারিশন কমান্ডার হিসাবে আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ঐ সময় জিয়াউর রহমানকে কুমিল্লা গ্যারিসন কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার আমাকে এবং জিয়াকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সনের মার্চ মাসে আমাকে এবং জিয়াকে আবার ফুল কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এই সময়ে আমাদের কমান্ডার ইন-চীফ ছিলেন এম. এ. জি. ওসমানী। ঐ বৎসরের ৭ই এপ্রিল আমাকে চীফ অব আর্মি স্টাফ হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমি এই নিয়োগের প্রতিবাদ করি। কারণ জিয়াউর রহমান এবং আমার একই রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তিনি by number-এ আমার আগে ছিলেন অর্থাৎ আমার ১ নম্বর সিনিয়র ছিলেন। আমি মেজর জেনারেল রবকে সাথে নিয়া বঙ্গবন্ধুর কাছে এই প্রতিবাদ জানাই। এই প্রতিবাদ দেওয়ার ব্যাপারে প্রায় ২ ঘণ্টা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সহিত আলাপ হয়। তিনি আমার সব কথা শোনার পর বলিলেন, তোমার সব কথা শুনেছি। There is something called political decision. উত্তরে আমি বলেছিলাম, From today and now onwards I am a victim of circumstances.

তিনি বলিলেন, তোমরা বড় বড় কথা বলিয়া যাও। কাল হইতে তুমি জেনারেল ওসমানীর নিকট হইতে দায়িত্ব বুঝিয়া নাও।

তারপর বঙ্গবন্ধুর অফিস হইতে বাহির হইয়া আমার অফিসে চলিয়া আসিয়া আমি প্রথমে কুমিল্লায় জিয়াউর রহমানকে ফোন করি। টেলিফোনে আমার দায়িত্ব পাওয়াসহ বঙ্গবন্ধুর সহিত আলাপের বিস্তারিত তাহাকে জানাই। আমার কথা শোনার পর জিয়া বলিলেন, Ok শফিউল্লাহ good bye.

ইহার সপ্তাহখানেক পর একটা নতুন পদ ডেপুটি চীফ-অব-আর্মি স্টাফ সৃষ্টি করিয়া ঐ পদে জিয়াকে পোস্টিং দেওয়া হয়। তিনি কুমিল্লা হইতে ঢাকায় চলিয়া আসেন। এই পদ পাওয়ার পর তাহার মনে ক্ষোভ থাকিয়া যায়।

১৯৭৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে আমাকে এবং জিয়াকে একই সময় মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার পরে হইতে দেশের আইন শৃংখলার কিছু অবনতি ঘটে। সেই প্রেক্ষিতে সারা দেশে অস্ত্র উদ্ধার করিতে পুলিশ ব্যর্থ হয়। কাজেই অস্ত্র উদ্ধারের কাজ আর্মিকে দেওয়া হইত। ইহাতে আর্মির ট্রেনিং ব্যাহত হইত। ঐ সময় আমি এই দায়িত্ব অন্য কাহাকেও দেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুকে বলিয়াছিলাম। সেটাকে লক্ষ্য রাখিয়া পুলিশকে শক্তিশালী করার জন্য রক্ষী বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী সম্বন্ধে কিছু মহল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এই বলিয়া যে, রক্ষীবাহিনী সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসাবে গঠিত হয় এবং এই মর্মে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এছাড়াও অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে যখন আর্মি নিয়োজিত ছিল তখন সেনাবাহিনীর অফিসার ছাড়া ২/১টি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। উল্লেখযোগ্য তখন মেজর ডালিম এই অস্ত্র উদ্ধারে কসবা এলাকায় ছিল। সেখানে তাহার ছাত্র জীবনের কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ছাত্রলীগের ২/১ জন লোককে মারধর করে। এছাড়াও এই অফিসারটি একজন উচ্ছৃংখল প্রকৃতির ছিল। ১৯৭৩ সনে এক বিয়েতে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সাথে তাহার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। তাহার জের হিসাবে সে কিছু সেনা অফিসারকে লইয়া গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়িতে হামলা করে। এইজন্য তাহাকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই প্রেক্ষিতে মেজর নূর যিনি ডেপুটি চীফ স্টাফের পি.এস. ছিল সরকারের বিরুদ্ধে কিছু সমালোচনাত্মক মন্তব্য করিলে তাহাকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এতে কিছু মহল সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে এবং সেই অপপ্রচার সেনাবাহিনীর মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তখন অস্ত্র উদ্ধারের নাম ছিল operation close door. রক্ষীবাহিনীকে কার্যকর করার জন্য তখন পার্লামেন্টে একটি আইন পাশ হয় যাহাতে রক্ষীবাহিনীকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই ক্ষমতা দানের ব্যাপারে অপপ্রচার হয় এবং সামরিক বাহিনীতে একটা অসন্তোষ দেখা দেয়।

সেই রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলার পরে আমি যখন জিয়া ও খালেদ মোশারফকে ফোন করি তখন তাহাদেরকে তাড়াতাড়ি আমার বাসায় আসার কথা বলি। ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে তাহারা আমার বাসায় আসিয়া পড়ে। জিয়া ইউনিফরম ও সেভ এবং খালেদ মোশারফ নাইট ড্রেসে নিজের গাড়িতে আসে। ঐখানে আমি দুইজনকেই ইতিমধ্যে আমার জানা পরিস্থিতি জানাইলাম এবং খালেদ মোশারফকে ৪৬ ব্রিগেডে তাড়াতাড়ি যাইয়া সাফায়েত জামিলকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেই। কারণ তখনও পর্যন্ত আমার পূর্বের দেওয়া নির্দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো তৎপরতা দেখিতে পাইতেছিলাম না। এক পর্যায়ে আমার ডিপুটি চীফ আমাকে বলিলেন Don't send him, he is going to spoil it. খালেদ মোশারফকে পাঠাইয়া দিয়া অতঃপর আমি আমার আর্মি হেড কোয়ার্টার চলিয়া যাই। পিছনে পিছনে জিয়াও আমার অফিসে চলিয়া আসে। আমি অফিসে পৌছার পর খালেদ মোশারফ বা তাহার নিকট হইতে কিছু খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকি এবং outside formation কমান্ডারদের সাথে টেলিফোনে কথা বলি। যাহাদের সাথে কথা বলি তাহাদেরকে শুধু আমি এটাই বলি, ঢাকাতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার অজান্তেই ঘটিয়াছে। ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডারকে নির্দেশ দিয়াছি এটা প্রতিহত করার জন্য। তোমরা পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাক।

সফিউল্লাহ ঘরে পায়চারি করতে করতে দু'হাতে মুখ ঢাকেন। ভাবেন, ওরা কি করলো? ওরা কি বঙ্গবন্ধুকে– । না তিনি এমন কথা ভাববেন না। পরক্ষণে মনে হয়, ওরা যদি তাকে হত্যা করে ফেলে তাহলে শরীরটাই শেষ হবে। বেঁচে থাকবে তাঁর দেশপ্রেম, সাহস, মানুষের জন্য ভালোবাসা, রাজনীতির আদর্শ, মূল্যবোধ। এসব কিছু কি হত্যা করতে পারবে কতিপয় হত্যাকারীরা? এ দেশের মানুষের কাছে তিনি রাজনীতির আদর্শের মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবেন। বাঙালির আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে থাকবেন তিনি। মৃত্যুই তাঁকে অমর করে রাখবে।

AMARBOI.COM

২৭.

কাঠগড়ায় সাক্ষী আবদুর রহমান শেখ (রমা) বলছেন:

এক পর্যায়ে কামাল ভাইয়ের আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। একই সময় বঙ্গবন্ধু দোতলায় আসিয়া রুমে ঢুকেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া দেন। প্রচন্ড গোলাগুলি এক সময়ে বন্ধ হইয়া যায়। তারপর বঙ্গবন্ধু দরজা খুলিয়া আবার বাহিরে আসিলে আর্মিরা তাহার বেডরুমের সামনে চারপাশে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমি আর্মিদের পিছনে ছিলাম। আর্মিদের লক্ষ্য করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন–

তোরা কি চাস। কোথায় নিয়া যাবি আমাকে?

তাহারা বঙ্গবন্ধুকে তখন সিঁড়ির দিকে নিয়া যাইতেছিল। সিড়ির ২/৩ ধাপ নামার পরে নীচের দিক হইতে আর্মিরা বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। গুলি খাইয়া সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়িতে লুটাইয়া পড়েন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তখন আর্মিদের পিছনে ছিলাম। তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি কর? উত্তরে আমি বলি আমি কাজ করি। তখন তাহারা আমাকে ভিতরে যাইতে বলে। আমি বেগম মুজিবের রুমের বাথরুমে গিয়া আশ্রয় লই। সেখানে বেগম মুজিবকে বলি বঙ্গবন্ধুকে গুলি করিয়াছে। ঐ বাথরুমে শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা, শেখ জামাল ও তাঁহার স্ত্রী রোজী, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব ও বঙ্গবন্ধুর ভাই নাসের এবং আমি আশ্রয় লই। শেখ নাসের ঐ বাথরুমে আসার আগে তাহার হাতে গুলি লাগে, তাহার হাত হইতে তখন রক্ত ঝরিতেছিল। বেগম মুজিব শাড়ির আঁচল ছিঁড়িয়া তাহার রক্ত মুছেন। ইহার পর আর্মিরা আবার দোতলায় আসে এবং দরজা পিটাইতে থাকিলে বেগম মুজিব দরজা খুলিতে যান এবং বলেন, মরিলে সবাই একই সাথে মরিব। এই বলিয়া বেগম মুজিব দরজা খুলিলে আর্মিরা রুমের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে এবং শেখ নাসের, শেখ রাসেল, বেগম মুজিব এবং আমাকে নীচের দিকে নিয়া আসিতেছিল। তখন সিঁড়িতে বেগম মুজিব বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখিয়া বলেন, আমি যাইব না। আমাকে এখানেই মারিয়া ফেল। এই কথার পর আর্মিরা তাহাকে দোতলায় তাঁহার রুমের দিকে লইয়া যায়। একটু পরেই ঐ রুমে গুলির শব্দসহ মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। আর্মিরা নাসের, রাসেল ও আমাকে নীচতলায় আনিয়া লাইনে দাঁড় করায়। সেখানে সাদা পোশাকের একজন পুলিশের লাশ দেখি। নীচে নাসেরকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তিনি শেখ নাসের বলিয়া পরিচয় দিলে তাহাকে নীচতলায় বাথরুমে নিয়া যায়। একটু পরেই গুলির শব্দ ও তাহার মাগো বলিয়া আর্তচিৎকার শুনিতে পাই। শেখ রাসেল মার কাছে যাইব বলিয়া তখন কান্নাকাটি করিতেছিল এবং P. A. মহিতুল ইসলামকে ধরিয়া বলিতেছিল, ভাই আমাকে মারিবে নাতো? এমন সময় একজন আর্মি তাহাকে বলিল, চল তোমাকে মায়ের কাছে লইয়া যাই।

এই বলিয়া তাহাকে দোতলায় লইয়া যায়। একটু পরেই কয়েকটি গুলির শব্দ ও আর্তচিৎকার শুনিতে পাই।

ঘটনার রাত্রে ঘটনার বাড়িতে কাহারা বাঁচিয়াছিল সেই খবর নেই নাই। ঘটনার বাড়িতে যাহারা পাহারায় ছিল তাহাদের খাকী পোশাক ছিল। এরা পুলিশ ও আর্মি ছিল। রক্ষীবাহিনী ছিল না। বিডিআর ছিল না। আনসার ছিল না। প্রথম গুলির শব্দ শুনিয়া ঘটনার বাড়িতে গুলির আশঙ্কা করিয়াছিলাম। লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় সেলিমের হাতে এবং পেটে দুইটি গুলির জখম দেখিয়াছিলাম। ইহার পর দেখিলাম কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক পরিহিত আর্মিরা আমাদের বাসার সব জিনিসপত্র লুট করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখন ডি.এস.পি নুরুল ইসলাম এবং পি.এ/রিসেপশনিষ্ট মুহিতুল ইসলামকে আহত দেখি। এরপরে আমাদের বাসার সামনে একটা ট্যাংক আসে। ট্যাংক হইতে কয়েকজন আর্মি নামিয়া ভিতরের আর্মিদের লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করে, ভিতরে কে আছে? উত্তরে ভিতরের আর্মিরা বলে, অল আর ফিনিশ্‌ড। অনুমান ১২টার দিকে আমাকে ছাড়িয়া দিবার পর আমি প্রাণ ভয়ে আমার গ্রামের বাড়ি টুঙ্গিপাড়া চলিয়া যাই।

টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকা শহরে চাকরি করতে এসে আবার টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে যান একজন রমা। প্রায় নিরক্ষর একজন মানুষ। সেদিন তিনি জানতেন না আবার একদিন তিনি এই বাড়ির প্রাঙ্গণে একটি ঘরে বাস করবেন। তার সংসার হবে। ছেলেমেয়ে হবে। সবকিছুর সঙ্গে থাকবে রক্ত ও মৃত্যুর স্মৃতি। খুব কাছে দাঁড়িয়ে থেকে দেখা মৃত্যু।

তখন রমা কিশোর বালক ছিল। চৌদ্দ কিংবা পনেরো বৎসর বয়স। বঙ্গবন্ধু দরজা খুলে বের হলে রমা দরজার সামনে সাত-আট জন আর্মি দেখেছিলেন। তিনি আরও দেখেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুর পরনে লুঙি ও পাঞ্জাবি ছিল। রমা বারবার নিজের স্মৃতির কাঠগড়ায় দাঁড়ান। পঞ্চাশ বছর বয়স পার হওয়ার পরও রমা অনবরত বলে যান, এটা সত্য নয় যে সে রাতে আমি কিছু দেখি নাই। বঙ্গবন্ধুর খুব কাছে দাঁড়াইয়া তাঁর মৃত্যু দেখিয়াছিলাম।

AMARBOI.COM

২৮.

আমার নাম মোঃ কুদ্দুস সিকদার। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

4. Habilder (Rtd.) Md. Quddus Sikder
P. W. -4

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং-৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দাজি ৫৮ বয়স্ক, হাবিলদার (অবঃ) কুদ্দুস সিকদার ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৮/৭ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম হাবিলদার (অবঃ) কুদ্দুস সিকদার, আমার পিতার নাম– গোলাম মুক্তার সিকদার, গ্রাম– পলববেগ, থানা– আলফাডাঙ্গা, জেলা– ফরিদপুর। বর্তমান ঠিকানা– বাড়ি নং– ৩, বাইশ টেকী, সেকশন– ১৩, মিরপুর, ঢাকা।

আমি একজন হাবিলদার (অবঃ) নং– ১২৫১০৮৭। ১৯৬০ সনের ১৭ই মার্চ পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে সিপাহি পদে যোগদান করি। যোগদানের পর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ক্যাম্বেলপুরে ট্রেনিং প্রাপ্ত হই। অতঃপর ৮ মিডিয়াম রেজিমেন্ট আর্টিলারিতে আমার পোস্টিং হয়। আমি পাকিস্তানের বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে চাকুরি করি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলাম। যুদ্ধের পরে ১৯৭৩ সনে ২৭শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশে ফেরত আসি। তারপর ২ মাসের ছুটিতে বাড়িতে যাই। ছুটি ভোগ করার পর ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে আমার পোস্টিং হয়। তখন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আলী আনছার কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। মেজর শরিফুল হক ডালিম সেকেন্ড কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। মেজর এ.বি.এম. ইলিয়াছ, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, ক্যাপ্টেন আবুল বাশার, সুবেদার মেজর আবদুল ওয়াহাব জোয়ারদার ঐ ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি অফিসার ছিলেন। ঐ ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি কুমিল্লায় ছিল।

১৯৭৫ সনের প্রথমদিকে শৃংখলা ভঙ্গের কারণে মেজর শরিফুল হক ডালিমকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। চাকুরি যাইবার পর মেজর শরিফুল হক ডালিমকে ঐ আর্টিলারিতে দেখিয়াছি। ১৯৭৫ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে ওয়ান ফিল্ড রেজিমেন্ট হইতে এক কোম্পানি রেজিমেন্ট ফোর্স ঢাকা গণভবনে এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে ডিউটির জন্য পাঠায়। ঐ কোম্পানিতে আমিও ছিলাম। ইতিমধ্যে আমি হাবিলদার পদে উন্নীত হই। ক্যাপ্টেন আবুল বাশারের নেতৃত্বে জুলাই মাসের শেষের দিকে আমরা ঢাকা আসিয়া গণভবনে পৌঁছি। ক্যাপ্টেন আবুল বাশার সাহেব আমাদের ডিউটি বন্টন করিয়া দেন। নায়েব সুবেদার আবুল মোতালেব, হাবিলদার আব্দুল গণি, নায়েক আব্দুল জলিল, সিপাহি সোরাব হোসেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও আমি হাবিলদার মোঃ কুদ্দুস সিকদার ও কয়েকজন এন.সি.ও. সিপাইসহ ২৫ জনের একটি দলকে ধানমন্ডিস্থ ৩২ নং রোডে ৬৭৭ নং বাড়িতে অর্থাৎ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের বাড়িতে ডিউটিতে পাঠায়।

তখন ধানমন্ডিস্থ ৩১ নং রোডে গার্ডদের জন্য নির্ধারিত একটি বাড়িতে আমরা থাকি। সেখান হইতে আমরা পালাক্রমে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ডিউটি করিতাম। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট ভোর ৬টায় আমার ডিউটি শেষ করিয়া আমার পরবর্তী হাবিলদার আব্দুল গনিকে ডিউটি বুঝাইয়া দিয়া আমি ৩১ নং রোডের বাড়িতে চলিয়া যাই। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট রোজ শুক্রবার আনুমানিক ভোর পৌনে ৫টার সময় ৩১ নং রোডের বাড়ি হইতে আমার সঙ্গীয় গার্ডদের লইয়া ৩১ নং রোডের গেইটের সামনে আসিয়া আমাদের রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদার সাহেবকে জিপ হইতে নামিতে দেখি। তিনি আমাদের মাসিক বেতন আনিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন। ইহার পর আমার সঙ্গীয় গার্ডদের ৮ জনকে লইয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। যথাসময়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আমরা পৌঁছাইয়া আমি ও আমার সঙ্গীয় গার্ডরা বিউগলের সুরে সুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে থাকি।

এই সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দক্ষিণে লেকের দিক হইতে লাগাতার গুলি আসিতে থাকে। তখন আমি এবং আমার গার্ডসহ দেওয়ালের আড়ালে লাইন পজিশনে যাই। গুলি বন্ধ হওয়ার পর পাল্টা গুলি করার জন্য আমার পূর্ববর্তী গার্ড কমান্ডারের নিকট গুলি খোঁজাখুজি করিতে থাকি। এই সময় কালো ও খাকী পোশাকধারী সৈনিক হ্যান্ডস-আপ বলিতে বলিতে গেইটের মধ্য দিয়ে বাড়িতে ঢুকে। তখন ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বারান্দায় আসিয়া সেখানে কামালকে দাঁড়ানো দেখিয়াই ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা হাতের স্টেনগান দ্বারা শেখ কামালকে গুলি করে। শেখ কামাল গুলি খাইয়া রিসিপশন রুমে পড়িয়া যায়। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা পুনরায় শেখ কামালকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহার পর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর বাড়ির পুলিশের ও কাজের লোকদেরকে গেইটের সামনে লাইনে দাঁড় করায়। ইহার পর মেজর মহিউদ্দিন তাহার ল্যান্সারের ফোর্স লইয়া গুলি করিতে করিতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দোতলার দিকে যায়। তারপর ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর কয়েকজন ফোর্স লাইয়া বাড়ির বারান্দা দিয়া দোতলার দিকে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সময় আমাদেরকে তাহাদের সাথে যাইতে হুকুম দিলে আমি তাহাদের পিছনে পিছনে যাই। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূর সিঁড়ি দিয়া চৌকির (slap) উপরে গেলে মেজর মহিউদ্দিন ও তাহার সঙ্গীয় ফোর্সকে বঙ্গবন্ধুকে নীচের দিকে নামাইয়া আনিতে দেখি। আমি ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও মেজর নূরের পিছনে দাঁড়ানো ছিলাম। এই সময় মেজর নূর ইংরেজিতে কি যেন বলিলেন। তখন মহিউদ্দিন ও তাহার ফোর্স এক পাশে চলিয়া যায়। এই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তোরা কি চাস? এর পরই ক্যাপ্টেন হুদা ও মেজর নূর হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু সিঁড়ির মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুবরণ করেন। তখন বঙ্গবন্ধুর পরনে একটা লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবী, একহাতে সিগারেটের পাইপ, অন্য হাতে দিয়াশলাই ছিল। অতঃপর মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাসহ সবাই নিচে নামিয়ে আসিয়া দক্ষিণ দিকে গেইটের বাহিরের রাস্তায় চলিয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেউদ্দিন ও ল্যান্সারের ফোর্স এবং টু-ফিল্ড আর্টিলারীর ফোর্স গেইটের সামনে আসে। তারপর মেজর আজিজ পাশা তাহার ফোর্স লইয়া গেইটের মধ্যে দিয়া বাড়ির দোতলার দিকে যাইতে থাকে। আমিও তাহাদের পিছনে পিছনে যাই। সিঁড়ি দিয়া দোতলায় যাইবার পরে দোতলায় সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদারকে দেখি। তারপর মেজর আজিজ পাশা তার ফোর্সসহ দোতলায় বঙ্গবন্ধুর রুমের দরজা খোলার জন্য বলে। দরজা না খুলিলে দরজায় গুলি করে। তখন বেগম মুজিব দরজা খুলিয়া দেন। দরজা খুলিয়া বেগম মুজিব রুমের ভিতরে থাকা লোকদের না মারার জন্য কাকুতি মিনতি করেন। কিন্তু তাহার কথা না রাখিয়া একদল ফোর্স রুম হইতে বেগম মুজিব, শেখ রাসেল, শেখ নাসের ও একজন বাড়ির চাকরকে রুম হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসে। বেগম মুজিব সিঁড়ির নিকট আসিয়া শেখ মুজিবের লাশ দেখিয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। এরপর বেগম মুজিবকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর বেড রুমে নিয়ে যায়। মেজর আজিজ পাশা, রিসালদার মোসলেমউদ্দিন হাতের স্টেনগান দ্বারা বঙ্গবন্ধুর বেড রুমে থাকা সবাইকে গুলি করে। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী ও শেখ কামালের স্ত্রী ছিল। তাহারা গুলি খাইয়া মৃত্যুবরণ করে।

তাহার পর তাহারা নীচে চলিয়া আসে। আমিও তাহাদের পিছনে চলিয়া আসিয়া রিসিপশনের বাথরুমের মধ্যে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় শেখ নাসেরের লাশ দেখি। এরপর গেইটের সামনে লাইনে সাদা পোশাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহিত একজন পুলিশের লাশ দেখি। তারপর মেজর আজিজ পাশা গেইটের বাহিরে গিয়া ওয়ারলেসে কথাবার্তা বলে। কথা বলিয়া গেইটের সামনে আসে। তখন শেখ রাসেল তাহার মায়ের কাছে যাইবে বলিয়া কান্নাকাটি করিতেছিল। মেজর আজিজ পাশা ল্যান্সারের একজন হাবিলদারকে হুকুম দিলেন, শেখ রাসেলকে তাহার মায়ের কাছে নিয়া যাও। ঐ হাবিলদার শেখ রাসেলের হাত ধরিয়া দোতলায় নিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর দোতলায় গুলির আওয়াজ ও কান্নাকাটির চিৎকার শুনিতে পাই। তারপর ঐ হাবিলদার নীচে গেইটের কাছে আসিয়া মেজর আজিজ পাশাকে বলে, স্যার সব শেষ। এরপর গেইটের সামনে একটা ট্যাংক আসে। মেজর ফারুক সাহেব ঐ ট্যাংক হইতে নামিলে মেজর আজিজ পাশা, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তাহার সহিত কথাবার্তা বলে। তারপর মেজর ফারুক ট্যাংক নিয়া চলিয়া যায়।

কিছুক্ষণ পরে একটা লাল কারে করিয়া কর্ণেল জামিলের লাশ বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতর লইয়া যায়। একই সময় দোতলায় কিছু ভাঙ্গাচুরার শব্দ শুনিতে পাই। তখন বাড়ির ভিতর পাশের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া বঙ্গবন্ধুর বেডরুমে যাই। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ জামালের স্ত্রী এবং শেখ কামালের স্ত্রীর লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখি। একই রুমে শেখ রাসেলের চোখ ও মাথায় মগজ বাহির হওয়া অবস্থায় তাহার লাশ দেখি। তখন রুমের মধ্যে ফোর্সদের মালামাল তছনছ করিতে দেখি এবং মূলবান মালামাল তাহাদের কাঁধের ব্যাগে ঢুকাইতে দেখি।

একই সময়ে সুবেদার আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদার সাহেবকে রুমের ভিতর আলমারী হইতে একটি ব্রীফকেস বাহির করিয়া উহাতে কিছু স্বর্ণালংকার ও কিছু বিদেশী মুদ্রা ঢুকাইতে দেখি। রুমের ভিতরে থাকা ফোর্স একটা ব্রীফকেস, একটা রেডিও, একটা টেলিভিশন নিয়া নীচে নামিয়া রাস্তার ধারে একটা জিপ গাড়িতে রাখে।

কিছুক্ষণ পরে মেজর ফারুক সাহেব ও মেজর শরিফুল হক ডালিম সাহেব গেইটের সামনে আসে। তখন মেজর নূর, মেজর আজিজ পাশা, মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদারও গেইটের সামনে উপস্থিত ছিলেন। মেজর ফারুক সাহেব, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ও সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব সাহেবকে কাছে ডাকেন। কাছে ডাকিয়া মেজর ফারুক সাহেব ক্যাপ্টেন বজলুল হুদার কাঁধের স্টার খুলিয়া সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবের হাতে দেন। এরপর মেজর ফারুক সাহেব সুবেদার মেজর জোয়ারদারের কাঁধের শাপলা খুলিয়া কাঁধে পরাইয়া দেন। ইহার পর মেজর ফারুক সাহেব তাহাকে মেজর হুদা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহার পর মেজর ফারুক সাহেব সুবেদার মেজর আব্দুল ওয়াহাব জোয়ারদার সাহেবের কাঁধে স্টার লাগাইয়া তাহাকে লেফটেন্যান্ট ডাকিলেন। তারপর সেখান হইতে সব অফিসার চলিয়া যায়।

যাইবার সময় মেজর হুদা আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পড়িয়া থাকা লাশ রক্ষণাবেক্ষণসহ গোটা বাড়ির দায়িত্ব দিয়া যান। আমিসহ ৮ জন ঐ বাড়িতে ডিউটিতে থাকি। জুমার নামাজের পূর্বে ক্যাপ্টেন আবুল বাশার সাহেবকে গেটের সামনে দেখি। ঐ দিন গিয়া রাত্রে মেজর হুদাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে দেখি। তিনি আমাকে মোহাম্মদপুর শের শাহ রোডে একটি কাঠের আড়তে লইয়া যায়। সেখানে মেজর বজলুল হুদা কাঠের দোকানদারকে ১০টি লাশের কাঠের বাক্স বানাইয়া দিবার জন্য বলে এবং বাক্সগুলি বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডস্থ বাড়িতে পৌছাইয়া দিতে বলে। সেখান হইতে মেজর বজলুল হুদা আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নামাইয়া দিয়া চলিয়া যান।

AMARBOI.COM

২৯.

বঙ্গবন্ধু এখন মরদেহ।

ভূখণ্ডের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর শরীরটির নান্দনিক শিল্প এখন আশ্চর্য নীরবতায় মহাকালের খেরোখাতায় ভরে ওঠার জন্য অপেক্ষমান। নীথর শরীরও যে কত বাঙময় হতে পারে ৩২ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে শায়িত তাঁকে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। প্রাণস্পদনে কাল্লোলিতহীন শরীর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে রক্ত।

কিছুক্ষণ আগে কতিপয় ঔদ্ধত্য সেনা সদস্যের আঠারোটি গুলি তাঁর শরীরকে বিদ্ধ করেছে। গুলির প্রতিটি ক্ষত থেকে তিনশত নদীর মতো বেরিয়ে আসছে রক্ত। যেন ভূখন্ডের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তিনশত নদী। প্রতিজ্ঞার মতো উচ্চারণ করছে, বঙ্গবন্ধু আপনার রক্তের স্রোতকে আমরা বুকে করে নিয়ে যাব সাত-সমুদ্র তের নদীর পথে।

তাঁর শরীর এখন আর বত্রিশ নম্বর বাড়ির সিঁড়িতে নেই। এই শরীর ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছে— দীর্ঘায়িত হয়েছে। ঢেকে দিয়েছে বাংলাদেশের সবটুকু জমিন। প্রতিটি গ্রাম, শস্যক্ষেত, কুঁড়েঘর, মেঠোপথ, খেলার মাঠ, শহর, রাজপথ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলিগলি, শহরতলি, দালানকোঠা, ফলের বাগান, টিলা-পাহাড়, বনভূমি। কোনো জায়গাই বাদ নেই। যে কেউ যে কোনো জায়গায় হাত রাখলে ছুঁতে পারে তার তর্জনী, কিংবা পায়ের বুড়ো আঙুল, হাতের কড়ে আঙুল, চোখ, নাক, বুক, পিঠ, চুল–শরীরের সবটুকু।

শুধু তাঁর কণ্ঠ থেকে অদৃশ্য শব্দরাজি নদীর মতো বয়ে যাচ্ছে, নাকি অজস্র পাখির কণ্ঠস্বর ঝরে পড়ছে বাংলাদেশের সবখানে। পাখির ঠোঁটে, নদীর স্রোতে বয়ে আসছে শব্দরাজি। তাঁর নিজের কথা। রেণুর দেয়া ডায়রির পাতায় জেলে বসে একদিন লিখেছিলেন, এখন সেইসব কথা উড়ছে। উড়ে আসছে তাঁর নিজের দিকে--আর বিপরীত দিকে উড়ে যাচ্ছে কোটি কোটি মানুষের কর্ণকুহরে। ঢুকে যাচ্ছে মানুষের বুকের ভেতরে।

ডায়রির পাতায় তিনি লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'

তখন টুঙ্গিপাড়ার ফসল-কাটা ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মান্নান শেখ। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, বন্ধু ছোটবেলায় তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি। তোমার বড় হওয়া আমি দেখেছি বন্ধু। ভালোবাসাই তোমার জীবনের সবটুকু। সেই ভালোবাসা তুমি দুঃখী মানুষের জন্য অকাতরে দিয়েছ। দিতে তোমার কার্পণ্য ছিল না। তোমার ভালোবাসা পেয়ে আমার দিনমজুরের হাতে শক্তি এসেছে। আমি মাটি চষি, ধান ফলাই, ধান কাটি, পাকা ধান ঘরে তুলি, মাড়াই করি। সেই ধান মাথায় করে বাজারে যাই। সুখে-দুঃখে আমি দিন গুজরান করি।

তখন চাঁপাই নওয়াবগঞ্জের মহানন্দা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে গফুর মিয়া। দু'হাতে চোখ মুছলেও চোখের জল শেষ হয় না। কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমার রাজনীতি আমি ছুঁয়ে দেখেছি নেতা। তোমার ভালোবাসা আমাকে ভিজিয়ে রাখে। আমি রাজনীতির সরল মানে বুঝি। তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি রাজনীতি মানে দুঃখী মানুষের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করা।

তখন কিশোরগঞ্জের হাওরের জেলে সুখেন দাস কাঁদতে কাঁদতে বিল থেকে জাল তুলতে ভুলে যায়। চোখের জলে ওর চারপাশ অন্ধকার হয়ে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, বন্ধু তোমার ভালোবাসা আমাকে ধর্মের উর্ধে নিয়ে যায়। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার মর্যাদা দেয়। আমি হাওরের জলে মাছ ধরে আনন্দে দিন কাটাই।

তখন ঢেঁকির ওপর দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলায় বরগুনার ডৌয়াতলা ইউনিয়নের লুৎফা বেগম। ঢেঁকিতে পাড় দেয়া হয়ে ওঠে না। একসময় আঁচলে চোখের পানি মুছে বলে, সোনা ভাই আমার তোমার ভালোবাসা পেয়েছি বলেইতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ঘর-দুয়ারে শান্তি আছে। তুমি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাক সোনা ভাই।

তখন ইউকে চিং মারমা, বীরবিক্রম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বান্দরবনের লাঙ্গিপাড়া গ্রামে। পাহাড়ের পাদদেশে নিজের বাড়ির ছোট ঘরে। ঘরের বেড়ার সঙ্গে লাগানো ছিল তাঁর যৌবন বয়সের ছবি যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একজন যোদ্ধা। ইউকে চিং সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরিয়ে আনার ভাবনায় আমি একজন পাকিস্তানি সেনাকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করেছিলাম প্রিয় মুজিব। আজ তোমার দেশের মানুষের কাছে তোমার এমন নৃশংস মৃত্যু হলো কেন? ওরা নিশ্চয় অন্য কোনো দেশ থেকে আসেনি? ওরা কারা? ওরা কি এদেশের মানুষ না?

সেই ১৯৫২ সালে আমি ইপিআর-এ যোগ দিয়েছিলাম। ১৯৭১ সালে তোমার যুদ্ধের ডাক শুনে আমার হাতের অস্ত্র গর্জে উঠেছিল। আমি তখন রংপুরের হাতিবান্ধায় ইপিআর-এর বর্ডার আউটপোস্টে হাবিলদার হিসেবে কাজ করছিলাম। আমার অধীনে পয়ষট্টি জন সৈন্য ছিল। আমরা অনেক অপারেশনে অংশগ্রহণ করি। একবার একজন পাকিস্তানি সেনাকে জীবিত গ্রেফতার করি। আমার সঙ্গের সবাই চেয়েছিল ওকে মেরে ফেলতে। কিন্তু আমি ওদের কথায় রাজি হইনি। ওদেরকে বলেছিলাম, পাকিস্তানের কারাগারে আমাদের নেতা শেখ মুজিব আছেন। আরো অনেক বাঙালি ওখানে বন্দি আছে। ও আটক থাকলে আমরা দর কষাকষি করতে পারব। বলব, ওকে আমরা ফিরিয়ে দেব, তার আগে আমাদের নেতাকে ফিরিয়ে দেবে, সঙ্গে আরও কুড়ি পঁচিশ জন বাঙালিকে।

আমি কি সেদিন ভুল করেছিলাম প্রিয় মুজিব?

স্তব্ধ হয়ে থাকা ইউকে চিং নড়ে ওঠে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। অরণ্য, পাহাড়ের প্রকৃতির মাঝে বড় হওয়া মানুষটি নিজেকেই বলে, ইপিআর-এ যোগ দেয়ার আগে আমি সমতলের মানুষের সঙ্গে মিশিনি। ওদের ভালো করে জানতাম না। তারপর আস্তে আস্তে জানতে শুরু করি। দেশের নেতাকে চিনতে শুরু করি। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছি।

প্রিয় মুজিব, যুদ্ধের পরে আমাকে বীরবিক্রম খেতাব দেয়া হয়। আমি গর্বিত। এই খেতাব আমার অহংকার।

তোমার বিদায়ের দিনে আমি তোমকে স্যালুট করছি, প্রিয় মুজিব। মৃত্যুই শেষ কথা না। মৃত্যুর পরও জীবন থাকে। আমি এটা বিশ্বাস করি– মৃত্যুই মানুষকে অমরতা দেয়।

ইউকে চিং বীর বিক্রমের মনে হয় তার কথাগুলো পাহাড়ের গায়ে ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাঁর জীবনের স্মরণীয় স্মৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ।

তখন এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ির পড়ার টেবিলে বসে চোখের জলে বুক ভাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইদুর রহমান। চোখের জল মোছার চেষ্টা না করে জলের ধারা গড়াতে দেয়। ভাবে এই ধারাটি তার বুক ভিজিয়ে দিলে সে ভাবতে পারবে ইতিহাসের মানুষ হারানোর মূল্য কি। তিনি পাকিস্তানি শাসনের ইসলামপন্থী অর্গল ভেঙে তার জীবনে বাঙালিত্বের সত্যকে স্থায়ী করেছিলেন। গণমানুষের জন্য কিছু করার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এই ভাবনার জন্য তাকে আর কোনোদিকে তাকাতে হয়নি। সাইদুর রহমান চেয়ারে মাথা হেলিয়ে দেয়। চোখের জলের ধারা তখনো গড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ হচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না। তখন নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ঘরের চারদিকে, তুমি আমাদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছাড়া রাজনীতি অর্থবহ হয় না, এ সত্য তোমার চেয়ে কে বেশি বুঝেছে বঙ্গবন্ধু। তুমি জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াও– তুমি দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনপদে নিজের জীবন বিপন্ন করে ছুটে যাও। মানুষের মর্যাদাকে তুমি ধর্মের বাইরে নিয়ে যাও। এমন মানুষ একটি জাতির সামনে না থাকা বড়ই মর্মান্তিক।

সাইদুর রহমান দু'হাত টেবিলে রেখে তার ওপর মাথা রাখে। তার বুকের ভেতরের দীর্ঘশ্বাস বাতাস ঘণীভূত করে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় শূন্যতার হাহাকার। আকস্মিকভাবে মাথা তোলে সাইদুর রহমান। বাথরুমে ঢুকে চোখের পানি ধুয়ে ফেলে। টেবিলের সামনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। রাস্তাঘাট প্রায় শূন্য। ছুটে যায় আর্মির গাড়ি। কালো পোশাকধারী সেনারা হা-হা উল্লাসে মেতে থাকে। সাইদুর রহমান চিৎকার করে বলতে থাকে, তোমার আয়ু আমাদের জীবনে অক্ষয় হোক। তুমি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকবে। আমরা জানি তোমার মৃত্যু নেই। তোমাকে মেরে ফেলা কি শত সহজ কাজ!

রোদ বাড়ে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। ভোর কেটেছে মাত্র। ঝকঝকে আলো চারদিকে। আক্কেলের মা প্রায় নব্বই বছর বয়সী নারী। ছেলেকে মুড়ি ভেজে দিলে ছেলে সেটা বাজারে বিক্রি করতে নিয়ে যায়। মুড়ি ভাজার প্রস্তুতি নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে আক্কেলের মা। হঠাৎ মনে হয় উঠোনে খোকার ছায়া। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আক্কেলের মা বলে, চোখে ছানি পড়েছে। ভালো দেখি না। তুই কি আমার উঠোনে দাঁড়িয়ে আছিস খোকা? খোকা রে–। কথা বলিস না কেন? তুই না বলিস, নানী আপনার ভাজা মুড়ি না হলে আমার পেট ভরে না। বাজারের মুড়ি খেয়ে মজাও পাই না। আপনি যেদিন মুড়ি ভাজবেন সেদিন আমি আসব নানী। খোকা রে কতবার মুড়ি ভাজলাম তোর আর আসার সময় হলো না। শুনেছি তুই দেশের রাজা হয়েছিস। আমি তো জানি রাজা হলেও গরিবের ঘরে তুই পিঁড়ি পেতে বসবিই। গরীবকে ভালোবেসেইতো তুই রাজা। তুই এখন কোথায় রে? রাজবাড়িতে? আমার খুব ইচ্ছা তোর বাড়িতে একবার যাই। আমি গেলে রেণু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার গলা জড়িয়ে বলবে, নানী আপনি এসেছেন। আমার খুব খুশি লাগছে। তোর বউ একটা সোনার টুকরো মেয়ে। নামাজ পড়ার সময় আমি তোদের হায়াতের জন্য দোয়া করি। উঠোনে তোর ছায়া দেখলাম মনে হলো। জানি তুই আসবি। আমি আজ মুড়ি ভাজবো।

আক্কেলের মা চুলোর পাশে গিয়ে বসে। শুকনো খড়ি ভেজা লাগছে। বৃষ্টিতো হয়নি। ভিজলো কেমন করে? চুলোটাও ভেজা ভেজা। শুকনো খরখরে না। আক্কেলের মা চুলোয় খড়ি দিয়ে আগুন জ্বালাতে চায়। দিয়াশলাই জ্বলে না। অনেক কষ্ট করে দিয়াশলাই একটু জ্বললেও খড়িতে আগুন জ্বলে না। অনবরত চেষ্টা করেও আগুন জ্বালানো যায় না। আক্কেলের মা মাথায় হাত দিয়ে ভাবে, তাহলে কি খোকার জন্য আজ আমার মুড়ি ভাজা হবে না। আক্কেলের মার দুঃখ হয়। চোখের পানি মুছতে মুছতে আঁচল ভেজায়। বারবার বলে, ও খোকা তুই কোথায়? আমার শুকনো খড়ি আর চুলো কেমন করে ভিজে গেলো? এত বছর ধরে মুড়ি ভাজার কাজ করছি, একদিনও তো চুলো এমন করে ভিজে থাকেনি। খড়িও না। শুকনো পাতা কুড়িয়ে কতদিন রান্না করেছি। আগুন তো ঠিকই জ্বলেছে। আজ আমার কপাল পুড়লো কেন, আল্লাহ রে–।

রান্নাঘরের দরজায় গালে হাত দিয়ে বসে থাকে আক্কেলের মা।

বেলা বাড়ে। উঠোনে রোদ ভেসে থাকে। শ্রাবণের আকাশে মেঘ নাই। কাঁঠাল গাছের মাথায় এক ঝাঁক চড়ুই লাফালাফি করে।

তখন ছুটতে ছুটতে বাড়িতে আসে আক্কেল। মাকে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে দু'হাত ধরে ঝাঁকি দেয়। মায়ের হাতে মাংস নেই। হাতজোড়া শুকনো কাঠির মতো। হাড্ডি-সর্বস্ব মায়ের জন্য মায়া হয় আক্কেলের। চেঁচিয়ে ডাকে, মা– মাগো –

কি হয়েছে রে? তুই এমন কাঁপছিস কেন?

আমাদের কপাল পুড়েছে মাগো।

কপাল পুড়েছে? কি বলিস বাবা?

হ্যাঁ গো মা, বাজারের রেডিওতে খবর শুনে এসেছি। কপাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

কি শুনেছিস বলবিতো? না বললে পোড়া কপালের ছাই কেমন করে ছুঁবো।

মনকে শক্ত করো মা। মনকে পাথর করো।

নাহ্, তোর সঙ্গে পারা যাবে না। মন শক্ত করে তোর কথা শুনতে চাই না রে পাগলা ছেলে।

তখন চিৎকার করে কাঁদে আক্কেল আলী। দু'হাতে রান্নাঘরের বেড়া পেটাতে থাকে। হাঁ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে আক্কেলের মা। ওর বউ ছেলেমেয়ে ছুটে এসে দাঁড়ায় ওর চারপাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি হয়েছে গো? ওগো তোমার কি হয়েছে?

আক্কেলের বউ ছেলেমেয়েরাও কাঁদতে থাকে আক্কেলের সঙ্গে। শুধু আক্কেলের মায়ের চোখে পানি নেই। বলে, আমি বাজারে যাই। শুনে আসি আমাদের কপাল পুড়লো কেন।

তখন আক্কেল আলী মাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা রে তুই কোথাও যাস না। বাজারে গিয়ে যে খবর শুনবি তা শুনে তুইও মরে পড়ে যাবি। একটু পর পর রেডিওতে বলা হচ্ছে, আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে।

মিথ্যা কথা বলবি না আক্কু। খবরদার, জিহ্বা সামলা বলছি।

মিথ্যা না মা। একটুও মিথ্যা না।

ছোটবেলা থেকে আমি খোকাকে চিনি। ওকে হত্যা করার সাধ্যি কোনো বাপের বেটার নাই। আমি ঠিকমতো শুনার জন্য বাজারে গেলাম। বউগো, তুমি গেলে আমার সঙ্গে আস। ওই তোরাও আয়। তোদের বাপের কথা এত সহজে কি বিশ্বাস হয় রে নাতি-নাতনিরা।

হেঁটে যায় ওরা। গ্রামের মেঠো পথ। আক্কেলের মায়ের মনে হয় হেঁটে যেতে কষ্ট হচ্ছে। পায়ে কি যেন বাঁধছে। কতকালের চেনা পথ–এই পথে হাজারবার হেঁটেছে খোকা। বেশি ছোটবেলায় শার্টের পকেটে মুড়ি নিয়ে দৌড় দিত। বলতো, বসে খাওয়ার সময় নেই।

আমিতো জানি ওই পকেটের মুড়িগুলো তুই পাখিদের খাওয়াবি?

মুখভরা হাসি নিয়ে দু'চোখ মেলে তাকিয়ে বলতো, সেতো আমার দিতেই হবে। ওদের কি ক্ষিধে পায় না নানী?

আক্কেলের মা মাথা নেড়ে বলতো, হ্যাঁ পায়তো। খোকা ততক্ষণে এক দৌড়ে উধাও হয়ে যেত। ওর মতো একটি ছেলে ছিল বলে গাঁয়ের লোকের বুকভরা আনন্দ ছিল।

হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ায় আক্কেলের মা।

কি হয়েছে মা? মাগো আপনার হাঁটতে ভালোলাগছে না?

আক্কেলের মা কথা না বলে সবাইকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলে, মরণ কি এত সোজা কথা? মরণ কি পান্তাভাত যে খাইলাম আর গিললাম? শোন তোরা, আমাদের খোকাকে যদি শয়তান–দস্যুরা মেরেই ফেলে তাহলে বুঝবি ওর মরণ ঘি-ভাত খাওয়ার মরণ। মানুষের বুক থেকে ওই মরণ মুছে যাবে না। মানুষ ওকে মনে রাখবে।

তারপর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে আক্কেলের মা। কাঁদে অন্যরাও। ওরা দেখতে পায় চারদিক থেকে গ্রামের মানুষ ছুটতে ছুটতে বাজারের দিকে যাচ্ছে। আক্কেলের মা শাড়ির ছেঁড়া আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বলে, আমি খোকার মরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খবর শুনতে বাজারে যাবনা রে আক্কু। আমার জানার দরকার নাই যে শয়তান-দস্যুরা খোকারে মেরে ফেলেছে।

আমার বুকের ধন বুকেই থাকুক। আমার কাছে ওর কোনো মরণ নাই।

ছোট দলটি নব্বই বছরের বুড়ির পেছনে পেছনে বাড়িমুখো হয়। যেতে যেতে বুড়ি ভাবে, আমার নব্বই বছর হয়েছে তো কি হয়েছে? এত আয়ু দিয়ে আমি কি করলাম? খোকা আমার অর্ধেক আয়ু নিয়ে দেশের রাজা হয়েছে। বিদেশের মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছে। ওর জনমইতো সার্থক। যে শয়তান-দস্যুরা ওকে মেরেছে ওরাতো লোকের ঘৃণা পাবে। ওদের আয়ু দিয়ে কি লাভ হলো।

খোকারে, মরে গিয়ে তোর আয়ু শেষ হয়নি। তোর হাজার বছরের আয়ু হয়েছে।

সেদিন আক্কেলের মায়ের চুলো আর জ্বললো না। আক্কেল আলী বাজার থেকে ভাত কিনে এনে সবাইকে খেতে দিল।

AMARBOI.COM

৩০.

সেলিমের গ্রামের নাম হাসানপুর, থানা মেহেদীগঞ্জ। জেলা বরিশাল। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কাজ করত। ও ছিল একুশ কি বাইশ বছরের যুবক। ওর নাম সেলিম হলেও বঙ্গবন্ধু ওকে আবদুল বলে ডাকতেন। ঘটনার দিন সেলিম আর রমা বঙ্গবন্ধুর বেডরুমের সামনে ঘুমিয়েছিল। গুলির শব্দ শুনে বঙ্গবন্ধু জোরে শব্দ করে দরজা খুললে ওদের দুজনেরই ঘুম ভেঙে যায়। ওরা দেখতে পায় বঙ্গবন্ধু লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরা অবস্থায় নিচের দিকে যাচ্ছেন।

ওই রাতে তিনতলায় ঘুমিয়েছিল কামাল ও তার স্ত্রী, দোতলায় জামাল ও তার স্ত্রী। দোতলায় বঙ্গবন্ধু, রেণু ও রাসেল। রেহানার রুমে ছিল শেখ নাসের।

বঙ্গবন্ধুর নিচে চলে যাওয়ার পরে রেণু তাঁর পাঞ্জাবি ও চশমা দিয়ে সেলিমকে নিচে পাঠান। তিনি পাঞ্জাবি পরে চোখে চশমা দেন। সেলিম পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন বাইরে থেকে একঝাঁক গুলি আসে। বঙ্গবন্ধু ক্যান্টনমেন্ট, রাজারবাগসহ কোথাও টেলিফোন লাইন না পেয়ে দোতলায় উঠে যান। সেলিম পেছনে পেছনে আসে। সে সময় ও শেখ কামালকে তিনতলা থেকে নামতে দেখে। গুলির শব্দ শুনে সেলিম দৌড় দিয়ে শেখ জামালের রুমের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমে গিয়ে ঢোকে। দু'জন কালো পোশাকধারী লোক গুলি করলে ওর হাতে ও পেটে গুলি লাগে। ও পড়ে যায়। পরে ও সিঁড়ির পাশে হেলান দিয়ে বসে থাকে। দেখতে পায় চার-পাঁচ জন সেনা সদস্য বঙ্গবন্ধুকে ধরে সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ওকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে বলেন, ছেলেটি ছোটবেলা থেকে আমাদের এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। ওকে কে গুলি করল? এই সঙ্গে তিনি বললেন, তোরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি? কি করবি? বেয়াদবি করছিস কেন?

এর কিছুক্ষণ পরে সিঁড়ির দিক থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ শুনতে পায় ও।

তার কিছুক্ষণ পর ও আবার দেখে আম্মা, নাসের কাকা, রমা আর রাসেলকে সেনা-সদস্যরা সিঁড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ও পাথরের মতো বসে থাকে। নিজের শরীরের কষ্টও ওর কাছে কষ্ট মনে হয় না। সিঁড়ির কাছে গিয়ে আম্মা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলেন, তোমরা আমাকে এখানেই মেরে ফেল। ওদের কয়েকজন আম্মাকে বেডরুমের দিকে নিয়ে যায়। আর নাসের কাকা, রাসেল ও রমাকে নীচের দিকে নিয়ে যায়।

সেলিম বেডরুম থেকে গুলি ও চিৎকারের শব্দ শুনতে পায়। ও দেয়ালে ঘাড় কাত করে মৃতপ্রায় বসে থাকে। একজন সেনা-সদস্য ওকে হাত ধরে টেনে বলে, নিচে আয়। হেঁচকা টান দিয়ে ওকে ওঠায়। ওর রক্তাক্ত শরীর যেন বাতাসে ভেসে যায়। পায়ের নিচে মাটি নাই। কারণ সেনা সদস্যরা ওকে বঙ্গবন্ধুর লাশের পাশ দিয়ে নামিয়ে নিয়ে যায়। কাঁদার অবস্থা নেই। লাবণ্যশূন্য এমন যুবক পৃথিবীতে কেউ হয় কিনা ও বুঝতে পারে না। শুধু এটুকু বোঝে যে ওকে অকৃতজ্ঞ হতে হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আগে ওর নিজের শরীর গুলিবিদ্ধ হয়েছে।

AMARBOI.COM

৩১.

ওহ, না। তোমরা আমাকে এখানে মেরে ফেল। আমি ওকে রেখে কোথাও যাব না। এমন করে তোমার মৃত্যু আমাকে দেখতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

বুদ্ধি হওয়ার পরে জেনেছি আমার বিয়ে হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। তখন আমার বয়স তিন বছর। তোমার বয়স বারো ছিল বলে পরে শুনেছি। শুনেছি আমার আব্বা মারা যাওয়ার পরে আমার দাদা তোমার আব্বাকে ডেকে বলেছিলেন, আমার সম্পত্তি আমার দুই নাতনিকে উইল করে দিয়ে যাব। তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনির বিয়ে দিতে হবে। আমার দাদা ছিলেন তোমার আব্বার চাচা। আমি পরে বুঝেছিলাম আমার তিন বছর বয়সের আগেই আমার জীবনে মৃত্যু আসে। আমার বাবার মৃত্যু আমি বুঝতে পারিনি। আমি কেঁদেছিলাম কিনা কেউ তা পরে আমাকে বলেনি। কিন্তু বড় হয়ে বুঝেছিলাম মৃত্যুর সঙ্গে উৎসবও থাকে। আমি পিতাহীন মেয়ে হয়ে গিয়েছিলাম বলেইতো আমার দাদা আমার বিয়ের কথা ভেবেছিলেন। এভাবেই মৃত্যুর সূত্র ধরে আমাদের দু'জনের একসঙ্গে হওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমিও কিছু জানলে না, আমিও কিছু বুঝলাম না। মুরুব্বিরা আমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রি করে ফেললেন।

তারপর আমার জীবনে মৃত্যু আবার এলো। আমার পাঁচ বছর বয়সে আমার মা মরে গেলেন। তখনও কি মৃত্যুর শোক বোঝার মতো বয়স আমার হয়েছিল? হায় মৃত্যু! আমি মা, মা করে কেঁদেছিলাম। মাকে খুঁজে বেড়াতাম। মা না থাকার কষ্ট তখন আমার মনে ঢুকে যায়। এভাবে বোঝা না বোঝার মধ্য দিয়ে আমি মৃত্যুর হাত ধরি।

মা মারা যাওয়ার পরে আমার জীবনের অবলম্বন ছিলেন দাদা। আমার সাত বছর বয়সে আমি দাদাকে হারাই। আবার মৃত্যু, আমি যেন মৃত্যুর ভেলায় উঠেছি। এক একটি ঘাটে থামি আর দেখি, মৃত্যু কেমন। কষ্ট কত গভীর।

মানুষের মৃত্যুতো হবেই, তাই বলে এভাবে, বাড়ির সিঁড়িতে? যে সিঁড়িটি তৈরি করতে আমাদের কয়েক বছর সময় লেগেছিল। তোমাকে আমি দেখতে চাইনি এ বাড়ির সিঁড়ির উপরে। তুমি যদি আমার আগে মারাই যেতে তাহলে তোমাকে দেখতে চাইতাম হাসপাতালে বা নিজের বাড়ির বিছানায়। প্রিয়জনের সামনে শান্তির মৃত্যুতে অমলিন স্নিগ্ধ তোমার মুখ। কেন আমি তোমার এমন মৃত্যু পেলাম না। এই দুর্ভাগ্য নিয়ে ওদের গুলিতে আমি বিদ্ধ হয়েছি।

তারপরও আমি ওদের কাছে পরাজিত হয়েছি একথা বলবো না। সব মানুষের মৃত্যু আছে। এ সত্য নতুন করে বলার কিছু নাই। কিন্তু আমরা মৃত্যুর কাছে জিতেছি। তোমার সাথে একই দিনে একই সঙ্গে আমার মৃত্যুর সত্য পূর্ণ করেছি।

আমরা ওদের কাছে হারিনি। আমরা মৃত্যুর কাছে পরাজিত মানুষ নই। আমি দেখেছি তুমি বুকে গুলি নিয়েছ। ওহ, আমার জীবন ধন্য। সুন্দর। সার্থক।

AMARBOI.COM

৩২.

তখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সেলিম বলতে থাকে: নীচে বারান্দা দিয়া গেটের দিকে নিবার সময় কামাল ভাইয়ের লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখি। তারপর আমাকে গেটের ভিতর লাইনে নিয়া বসায়। সেখানেও একজন সিকিউরিটি লোকের লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখি। লাইনে ডি.এস.পি নুরুল ইসলাম, মহিতুল ইসলাম, রমা, রাসেল ভাইকে দেখিলাম। রাসেল মহিতুল ইসলামের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। তারপর আমাকে লক্ষ করিয়া একজন আর্মির লোক অন্য একজন আর্মিকে বলিল, এর গায়ে গুলি লাগিয়াছে। একে হাসপাতালে লইয়া যাও। একটু পরেই একটা ট্যাংক এবং একটা জিপ আসিল। ট্যাংক হইতে কয়েকজন অফিসার নামিয়া অন্য আর্মিদের সাথে ইংরেজি এবং বাংলায় কি যেন কথাবার্তা বলিল। তখন রাসেলকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইনে দেখিয়া একজন আর্মি অফিসার ইশারা করিলে অন্য একজন রাসেলকে দোতলায় নিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরেই দোতলা হইতে গুলির শব্দ ও চিৎকার শুনিলাম। তারপর ট্যাংকের পিছনে আসা জিপে করিয়া আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়া যায়। সেখানে যাইবার পর শেখ সেলিম ও শেখ মারুফের সাথে আমার দেখা হয়। তাহারা আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করিলে আমি জানাই যে, সবাইকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

আমি পড়া-লেখা জানি না। তদন্তকারী অফিসারের কাছে আমি জবানবন্দি দিয়াছি।

৩৩.

তোমরা আমাকে হত্যা করেছ কেন? আমিতো ছোট্ট মানুষ।

আমার কি অপরাধ ছিল তোমাদের কাছে? আমি তো শুধু মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। তোমরা আমাকে মায়ের কাছে পাঠাবে বলে একজন হাবিলদারের সঙ্গে দোতলায় পাঠালে। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় আমার আব্বাকে দেখেছি। আমাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে আমার মাকে দেখেছি। আমার বাবা এবং মা তোমাদের কি ক্ষতি করেছিল বন্ধুরা?

আমাদের শোবার ঘরে দেখলাম ছোট ভাইয়া আর দুই ভাবীকে।

তোমরা আমাকে কেন উপরে এনে এভাবে সবাইকে দেখালে? তোমাদের বুকে কি মায়া ছিল না? তোমরা এতই নিষ্ঠুর?

তোমারাতো আমাকে নিচতলাতেই মেরে ফেলতে পারতে। যখন অমি মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলাম, ঠিক তখনই। উপরে এনে তোমরা আমাকে গুলি করে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলে। আমার মাথায় গুলি করলে। মগজ বেরিয়ে গলে পড়ল মেঝেতে। আমি আবারও বলছি আমি শুধু আমার মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। মানুষ কি কোনো বাচ্চাকে এভাবে মায়ের কাছে পাঠায়?

সেনা-বন্ধুরা তোমরা কি মানুষ?

তোমরা আসলে মানুষ না। মানুষ হলে কোনো বাচ্চাকে রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা মায়ের কাছে তাকে পাঠাতে না। তারপরও সেই মাকে দু'চোখ ভরে দেখে কাঁদার আগেই বললে, এই গুলি নিয়ে মায়ের কাছে যা। মায়ের কাছে যাওয়ার শখ তোর মিটিয়ে দিলাম।

কেন তোমরা হত্যা করলে আমাকে? আমি তো দেশের প্রেসিডেন্ট হতে চাইনি সেনা-বন্ধুরা। দেশের সেনা-প্রধানও না। ডেপুটি সেনাপ্রধানও না। আমি তো তোমাদের পথের কাঁটা ছিলাম না। তবে কেন আমাকে তোমাদের এত দরকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো? কিসের ভয় ছিল তোমাদের? এত ভয় নিয়ে তোমরা আমার বাবা-মাকে খুন করতে এসেছিলে? এখন কি তোমরা ভয় মুক্ত হয়েছ বন্ধুরা? আর কাউকে তোমাদের ভয় নাই? বন্ধুরা সুখে থাক, ভালো থাকো।

আমি পাখি ভালোবাসতাম বন্ধুরা। বাড়ির কবুতরগুলোকে খাবার দিতাম। ওদের বকম-বকম ডাক শুনতে খুবই ভালোলাগতো। ভাবতাম, আল্লাহ কেন আমাকে কবুতর বানিয়ে পাঠায়নি! আমার কথা শুনে তোমাদের হাসি পাচ্ছে? হেসো না। আমি এমন করেই ভাবতে ভালোবাসি। বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পাখিদের বলতাম, তোমরা কি আমার বন্ধু হবে? তোমাদের সঙ্গে উড়ে আমি আকাশ দেখতে চাই। মেঘে ভাসতে চাই। আমি চাঁদে যেতে চাই। কতকিছু যে চাইতাম পাখিদের কাছে! বন্ধুরা, আমার এই সামান্য ইচ্ছা তোমাদের সহ্য হলো না কেন? তোমাদেরকে আরও বলতে চাই আমি টুঙ্গিপাড়ায় গেলে পুকুরের হাঁসগুলো আমার কাছে চলে আসতো। ওরা আমাকে এমনই ভালোবাসতো। তোমাদের মতো নিষ্ঠুর ছিল না ওরা। অমি লেজ-ঝোলা ফিঙে পাখি দেখে বলতাম, বন্ধু তুমি কি ভাত খাও? নাকি পোকামাকড়? এসব কি খারাপ কথা বন্ধুরা? তোমরা বল, আমি তোমাদের কাছে থেকে শিখতে চাই।

আমি তোমাদেরকে বলতে চাই আমি ফুল ভালোবাসতাম। বাড়ির ফুলগাছে পানি দিতাম। পাতাগুলো ভিজিয়ে দিয়ে ওদের বলতাম, একদিন এই বাড়ি ছেড়ে দূরদেশে পড়ালেখা করতে গেলে তোমরা আমাকে মনে রেখো। তোমরা কি ফুল ভালোবাসো বন্ধুরা? ফুল আমার বন্ধু ছিল। আমি তোমাদেরকেও আমার বন্ধু মনে করছি। আমি কোনোদিন তোমাদের বুকে বন্দুক তাক করতাম না।

আমি গরুর বাছুর ভালোবাসতাম। আমাদের রাখাল ভাই ওদেরকে খাবার দিলে আমি বাছুরের গলা জড়িয়ে ধরে ওর মুখে খড় তুলে দিতাম। দুধ দোয়ানের সময় ভরে ওঠা বালতি দেখে ভাবতাম, ইস, কি সুন্দর। দুধের ওপর ফেনা ফুলের মতো ফুটে উঠত। বন্ধুরা ভেবে দেখো আমি কখনো খারাপ চিন্তা করিনি। আমি কোনো পোকা মারিনি। পিঁপড়াও না।

আমি ধানমন্ডি লেকের ধারে বসে মাছদেরকে খাবার দিতাম। মুড়ি নয়তো পাউরুটির টুকরো। মাছেরা সাঁতার কেটে এসে টুপ করে খাবারের টুকরো মুখে নিত। আনন্দে আমি হাততালি দিতাম। আমার খুশির সীমা থাকতো না। মাছেদের সাঁতার কাটা দেখে ভাবতাম আমি যদি এমন পানির নিচে থাকতে পারতাম! তাহলে আমার দিনগুলো কত না সুন্দরভাবে কেটে যেত। আমি নিজেকে তখন পৃথিবীর রাজা ভাবতাম। আমি জানি মাছগুলো আমাকে খুঁজবে। ওরা আমাকে দেখতে না পেয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। একদিন ওদের মাকে বলবে, আমাদের রাসেল কোথায় হারিয়ে গেল মাগো? ও আর আসে না কেন? ওদের মায়েরা বলবে, তোমরা বড় হও একদিন সব জানতে পারবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা কি আমার বুয়া খালা আর রাখাল ভাইকে মেরে ফেলেছ? বুয়া খালাকে ভাত খেতে দেখলে তার কাছে বসে বলতাম, আমাকে এক লোকমা দাও না খালা? বুয়া খালা চোখ গরম করে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, দুষ্টামি করে না রাসেল। তোমার মুখে ভাত দিলে আম্মা আমাকে বকবেন।

একটুও বকবেন না। আমিতো দুষ্টামি করছি না। তোমার হাতে ভাত খেতে চেয়েছি। তুমি ভাত না দিলে বুঝবো তুমি আমাকে একটুও ভালোবাস না।

ওরে দুষ্টু ছেলে। নে খা।

বুয়া খালা নিজের থালা থেকে ভাত না নিয়ে গামলা থেকে ভাত নিয়ে একটুখানি ঝোল মিশিয়ে আমার মুখে দিত। তারপর জিজ্ঞেস করত, মন ভরেছে? আমি বলতাম, না ভরেনি। তোমার থালার ভাত দাওনি। আবার দাও।

বুয়া খালা চোখ গরম করে বলতো, তুই আমাকে ভাত খেতে দিবি না? আমার পেট ভরেনি। তুই না গেলে আজ আমার খাওয়াই হবে না। তুই চাস যে আমি না খেয়ে থাকি?

আচ্ছা ঠিক আছে, যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলেও কাল আবার আসব। তখন কিন্তু তোমার ফুল-পাতা আঁকা থালা থেকে আমাকে ভাত দিতে হবে। তুমি না দিলে আমি নিজের হাতে উঠিয়ে গপগপিয়ে খাব। তখন বুঝবে মজা।

বুয়া খালা হাসতে হাসতে কপালে হাত দিত। আর আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে আমার তিন চাকার সাইকেলে চড়ে বসতাম। ছুটে আসতো কিশোরী। ও আমাদের বাড়িতে থাকত। আমার সঙ্গে খেলত।

ও ছুটে এসে বলত, ভাইয়া তুমি কি এখন সাইকেল চালাবে?

হ্যাঁ, চালাবো।

ভালোই হয়েছে, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলতে পারবো। তুমি পড়তে বসলে আমি ভাবি কখন তোমার পড়া শেষ হবে।

আমি তা দেখতে পাই কিশোরী। তখন আমার মনও তোমার সঙ্গে খেলার জন্য উসখুস করত। চলো সাইকেল উড়াই।

আমি বাঁই বাঁই সাইকেল ছুটাতাম। কিশোরী আমার পাশে পাশে দৌড়াত। ও খেয়াল রাখতো, সাইকেল যেন কোথাও ধাক্কা না খায়। আমি যেন পড়ে না যাই। ব্যথা না পাই। আমার হাত বা পা কেটে যেন রক্ত না বের হয়। কিশোরী আমাকে খুব ভালোবাসতো। আমি ওকে বলতাম, আমরা বড় হয়ে সাইকেলে করে পুরো বাংলাদেশে ঘুরবো কিশোরী। আব্বাকে বলবো, তোমাকে একটা সাইকেল কিনে দিতে।

সত্যি? আমার একটা সাইকেল হবে?

হবে, হবে। তুমি আমার এই সাইকেলে এখন একটু চড় কিশোরী, তাহলে আমি তোমার পাশে পাশে দৌড়াব। তুমি যেমন করে দৌড়াও ঠিক তেমন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, না ভাইয়া আমি এখন চড়ব না। আমি একবারে বড় সাইকেলে চড়ব। উহ্, কি মজা, আমার একটা সাইকেল হবে।

এখন আমার বন্ধু কিশোরীকে কে সাইকেল কিনে দিবে? আমি আমার হাসু আপাকে বলবো কিশোরীকে যেন একটা সাইকেল কিনে দেয়। কিন্তু আমাকে ছাড়া কি পুরো বাংলাদেশে ও সাইকেল নিয়ে ঘুরতে চাইবে? আমি ছাড়া কিশোরীর আর কে বন্ধু আছে তাতো আমি জানি না। তোমরা কেন এমন করে ওকে বন্ধুহীন করলে বন্ধুরা? কিশোরীর কি অপরাধ ছিল তোমাদের কাছে?

আমাকে মেরে ফেলার কি খুব দরকার ছিল তোমাদের? তোমরা আমার মগজটা পর্যন্ত ঝরিয়ে দিয়েছো। চোখ উপড়ে ফেলেছো। কেন তোমরা আমার দিকে তাক করেছিলে তোমাদের অস্ত্র? আমিতো ছোট্ট একটা মানুষ।

আমি শুধু আমার মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিলাম। মানুষ কি কোনো বাচ্চাকে এভাবে মায়ের কাছে পাঠায়?

তোমরা কি তোমাদের জীবনে কোনো বাচ্চা দেখোনি? কোনো মা-ও না? যদি দেখে থাক, তাহলে তোমরা কেমন মানুষ?

AMARBOI.COM

৩৪.

রমা তাকিয়ে থাকে শেখ নাসেরের দিকে।

সেনা সদস্যদের একজন জিজ্ঞেস করছে তাঁকে, তুমি কে?

আমি শেখ নাসের। শেখ মুজিবের ছোট ভাই।

তোমার হাতে গুলি লেগেছে দেখছি। শাড়ি ছিঁড়ে বেঁধেও দিয়েছে কেউ।

হ্যাঁ, আমার ভাবী বেঁধে দিয়েছেন।

হা-হা করে হেসে সেনা সদস্য বলে, তাতে তো রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি দেখছি। চলো তোমার রক্তপড়া বন্ধ করে দেই।

রমা দেখতে পায় তাঁকে ধরে নীচতলার বাথরুমে নিয়ে যায়। একটু পরে ভেসে আসে গুলির শব্দ। ওহ্ মাগো, বলে গোঙানির শব্দে চিৎকার করলে পুরো বাড়িতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

কতক্ষণ সময় কাটে তা জানে না রমা। দেখতে পায় সেনারা বাড়ির জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। ও আরও দেখতে পায় ডিএসপি নূরুল ইসলাম ও পি.এ/রিসেপশনিস্ট মহিতুল ইসলাম আহত। এরপর বাসার সামনে ট্যাংক আসে। ট্যাংক থেকে কয়েকজন অফিসার নেমে ভেতরের আর্মিদের জিজ্ঞেস করেন, ভেতরে কে আছে? তারা উত্তরে বলে, অল আর ফিনিশড।

প্রায় বারোটার দিকে রমাকে ছেড়ে দেয় ওরা। ও প্রাণভয়ে গ্রামের বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুঙ্গিপাড়ায় যাত্রা করে। ভাবে, ওখানে এত মৃত্যু এবং রক্ত নেই। ওখানে গেলেই ওর বুকের কাঁপুনি থামবে। ওর জন্য এই ঢাকা শহরে কোনো জায়গা নেই। যেখানে দু'দন্ড দাঁড়িয়ে ও বুকভরে শ্বাস নিতে পারে। টুঙ্গিপাড়ায় ওর বাবা-মা আছে। ওর বাবা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হেসেখেলে বেড়িয়েছেন। তাঁদের আনন্দের সময় ছিল তখন। ও ওর বাবাকে কেমন করে বলবে, এই হত্যাকান্ডের কথা। ওহ মাগো, আমাকে বাঁচাও। আবদুর রহমানের নিজেকে পাগলের মতো লাগে।

মধুমতী নদীর শাখা নদী ছিল বাইগার। সেই নদীর ধারের গ্রাম টুঙ্গীপাড়া। আবদুর রহমান সেই নদীর ধার দিয়ে ছুটছে। কীভাবে ওখানে ও পৌঁছেছে তা জানে না। সদরঘাট থেকে লঞ্চে উঠেছিল। তারপর কোথায় নেমেছে এই মুহূর্তে তা মনে নেই। শুধু টুঙ্গিপাড়ার নাম বুকে রেখেছিল। মুখে রেখেছিল। লঞ্চের লোকদের বলেছিল এইটুকু জানে। এখন ও শুনতে পায় ওর চারপাশে নদীর কল্লোলিত প্রবাহের মধ্যে গুলির শব্দ। বঙ্গবন্ধু বলছেন, তোরা কি চাস? তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে চারদিকে। টুঙ্গিপাড়ার আকাশে হাজার হাজার পাখি। অথচ শব্দ নেই। পাখিদের কণ্ঠ রুদ্ধ। রমার মনে হয় ওর শ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। ও নদীর ধারের বিশাল গাছের নিচে গড়িয়ে পড়ে। বুকভরা বাতাসের জন্য ও হাঁ করে থাকে। মনে হয় কোথাও কোনো বাতাস নেই। চারদিকে শুধু ক্রন্দন আর হাহাকার। চোখ বুঁজে আসে রমার। বুকের ভেতরে ধড়ফড় করে বাড়িতে পৌঁছানোর তাড়া। আর কতদূরে ওর বাড়ি? কতটা পথ হাঁটতে হবে ওকে? তখন পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কেউ একজন বলে, কি রে শুয়ে আছিস কেন?

রমা কথা বলে না।

কি হয়েছে তোর? হাত ধরলে উঠবি?

না, উঠব না। আপনি যান।

রমা আবার চোখ বুঁজলে দেখতে পায় বত্রিশ নম্বর রাস্তার বাড়ির সবটুকু। সিঁড়ি, শোবার ঘর, একতলা, বাড়ির প্রাঙ্গণ–। ও আর ভাবতে পারে না। ওর বুক চেপে থাকে। শুনতে পায় শেখ নাসেরের কণ্ঠ।

ভাবী তাঁর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে আমার আঙুল পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন রক্ত পড়া বন্ধ হওয়ার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন আমার আঙুলের রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব। রক্ত পড়তে পড়তে আমি মৃত্যুর কাছে চলে যাব না। এত গোলাগুলির মধ্যে তিনি বেঁচে থাকার কথাই ভেবেছিলেন। মৃত্যুর নয়। অথচ তিনি তো দেখেছিলেন কীভাবে শত শত গুলি আমাদের দিকে ছুটে আসছিল। আমার আঙুলে গুলি লেগেছিল। আমরা তাঁর বেড়রুমে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভাবীর পক্ষেই সম্ভব মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এভাবে অন্যের যত্ন নেয়া। জীবনভর তিনি এই কাজটি করেছেন। আত্মীয়স্বজন, পার্টির কর্মীরা তাঁর ছায়ায় এসে দাঁড়াতো যখন প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো তখনই। ভাবী আজও শেষবারের মতো তাঁর দেবরের যত্ন নিলেন।

তিনি আমাদের সবার জীবনের ধ্রুবতারা। যেদিকেই তাকাই দেখি তিনি জ্বলজ্বল করছেন। কি করে একজন মানুষ সবার জন্য এমন এক হতে পারেন? ছোটবেলায় তিনি আমাদের সঙ্গে বড় হয়েছেন। আমাদের সব ভাইবোনের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। আমরা বাড়ির উঠোনে একসঙ্গে খেলেছি। তখন ভাবিনি বড় হতে হতে তিনি বড়ই হতে থাকবেন– বুদ্ধিতে, চিন্তায়, যত্নে, মমতায় আমাদের সবার মাথার উপরে তাঁর মাথা উঁচু হয়ে যাবে। এই মৃত্যুপুরীর নৃশংসতায়ও তিনি নিজের দায়িত্বের কথা ভোলেননি। আমার উচিত ছিল শেষ মুহূর্তে তাঁর পা ছুঁয়ে সালাম করা। কিন্তু আমি সে সুযোগ পেলাম না।

হায়, সেনা-দস্যুরা তোমরা তাঁকে তাঁর উচ্চতা থেকে এক ইঞ্চিও নামাতে পারনি। তোমাদের সেই সাধ্যই নেই।

৩৫.

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নূরুল ইসলাম খান বলতে থাকেন: আমি খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে রিসেপশনের পাশে আমার রুমে যাই। সেখানে আমার রুমে এস.বি.এস.আই সিদ্দিকুর রহমান এবং আর্মির পুলিশ সাব ইনসপেক্টরকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দেখিতে পাই। পি. এ. মহিতুল ইসলামকে আমার রুমে আনিয়া বসাই। এই সময় দোতলায় বহু গুলির শব্দ শুনিতে পাই এবং মহিলাদের আর্ত চিৎকার শুনিতে পাই। বাহির হইতে একজন আর্মি বলিল, রুমে যাহারা আছ সবাই বাহিরে আস– নচেৎ ব্রাশ ফায়ার করিয়া সবাইকে মারিয়া ফেলিব।

আমরা সবাই রুম হইতে বাহির হইলে একজন আর্মি মহিতুল ইসলাম এবং সিদ্দিকুর রহমানের চুল ধরিয়া বাহিরে লাইনে নিয়া দাঁড় করায়। পরে একজন আর্মি আমাকেও অস্ত্রের মুখে নিয়া মহিতুল ইসলামের পাশে লাইনে দাঁড় করায়। তখন আমি মহিতুল ইসলামের জামায় রক্তের দাগ দেখি। সে জানায় তাহার গায়েও গুলি লাগিয়াছে। লাইনের ডাইনে বায়ে তাকাইয়া ইনসপেক্টর খোরশেদ আলী, আর্মড পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর, হেড কনস্টেবল ও অন্যান্য পুলিশও লাইনে আছে। ইলেক্ট্রিশিয়ান মতিন নামে একজনও লাইনে ছিল।

ইহার পর একজন আর্মি আমাকে লক্ষ করিয়া বলিল, তুমি গুলি করার হুকুম দিয়াছ– চল তোমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিব।

উক্ত অস্ত্রধারী আর্মি আমাকে গেটের বাহিরে নিয়া যায় এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে একটি আর্মির গাড়ীতে বসা একজন অফিসারকে বলিল, স্যার এই লোকটি গুলি করার জন্য বলিয়াছিল, হুকুম দেন তাহাকে গুলি করি। তখন বাহিরে ৪/৫ জন কালো পোশাকধারী আর্মিসহ একটি ট্যাংক দেখিতে পাই।

আর্মড গাড়িতে বসা অফিসারটি আমার নাম পরিচয় জানিয়া আমাকে চলিয়া যাইতে বলে। আমি চলিয়া যাইতে থাকিলে ঐ অস্ত্রধারী আর্মিটি আমাকে নিয়া আবার বাড়ির ভিতরে লাইনে দাঁড় করায়।

তখনও বাড়ির দোতলা হইতে থাকিয়া থাকিয়া গুলির আওয়াজ ও আর্তচিৎকার শোনা যাইতেছিল। এই সময় হঠাৎ আর্মির একজন লোক বলিল, লাইনে থাকা সব লোককে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল। ঠিক তখনই একটি গুলি মঞ্জুর সিদ্দিকুর রহমানের বুক বিদ্ধ করিলে সে পড়িয়া যায় এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এরপর পাকঘর হইতে কাজের বুড়ি এবং রাখাল ছেলেকে আনিয়া লাইনে দাঁড় করায়। তারপর শেখ নাসেরকে একজন অস্ত্রধারী লাইনের উত্তর দিকে দাঁড় করায় এবং কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া রিসেপশন বাথরুমের দিকে লইয়া যায়। বাথরুমে নেওয়ার সময় তাহাকে রক্তাক্ত দেখি। পরে বাথরুম হইতে গুলির শব্দ শুনি। শেখ নাসের পানি পানি বলিয়া চিৎকার দিতে থাকিলে একজন আর্মি আর একজন আর্মিকে বলিল, পানি দিয়া আয়। তখন দ্বিতীয় জন গিয়া শেখ নাসেরকে আবার গুলি করে।

AMARBOI.COM

আমিতো শুধু তোমাদের কাছে পানি চেয়েছিলাম সেনা-দস্যুরা। মুসলমানরাতো মৃত্যু পথযাত্রী মানুষের মুখে পানি দেয়। তোমরা কি মুসলমান না? নাকি ভেবেছিলে আমি তোমাদের গুলি খাওয়ার পরও বেঁচে যাবো? তাই পানির বদলে গুলি দিয়ে তোমরা আমার পানি খাওয়ার সাধ ফুরিয়ে দিয়েছ।

আমি না হয় পানি না খেয়েই মরে যেতাম! তবুতো আমার চারপাশের মানুষেরা ভাবতে পারতো যে মুসলমানেরা পানির বদলে গুলি দেয় না। মুসলমানরা ধর্মীয় বিধান পালন করে। ক্ষমতার জন্য উন্মত্ত হলেও তারা ধর্মের অবমাননা করে না।

তোমরা কেমন মুসলমান সেনা-দস্যুরা? আমিতো তোমাদের কাছে জমজমের পানি চাইনি। বাংলাদেশের খাল-বিল-নদীর পানি চেয়েছি। ধানমন্ডি লেকের পানিও তোমরা আমাকে দিতে পারতে। দাওনি। আসলে তোমরা তখন মুসলমান ছিলে না। মানুষরূপী দানব হয়ে গিয়েছিলে। তোমাদেরকে জানাই আসসালামু আলাইকুম ইয়া রহমাতুল্লাহে বরকাতুহু–।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬.

আমি রমা। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

ঘটনার দিন আমি পুনরায় বাড়িতে ঢোকার পরে পনেরো-কুড়ি মিনিট পর আর্মিরা ঘটনার বাড়িতে ঢোকে। পুরা ঘটনাটি আনুমানিক এক-দেড় ঘন্টার মধ্যে ঘটে। আমি লেক হইতে বাসায় ঢুকিয়া দেখি বঙ্গবন্ধু রিসেপশনে কথা বলিতেছেন। ইহার কতক্ষণ পরে তিনি দোতলায় যান তাহা আমি বলিতে পারিব না। শেখ কামাল নীচে নামিয়া কোথায় কতোক্ষণ কি করিয়াছেন তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে নীচে তাহার আর্তচিৎকার শুনিয়াছি। আমি দোতলায় বেগম মুজিবকে একা ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি।

আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল হামিদ। এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

আমি ঘটনার বাড়িতে দোতলার বাম দিকের দেউড়িতে বেগম মুজিবের এবং রুমের ভেতরে শেখ জামাল, মিসেস্ জামাল, মিসেস্ কামাল, শেখ রাসেলের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখি।

AMARBOI.COM

৩৭.

আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আমাকে একা মারো। ওদেরকে মেরো না। তোমরা আমার কথা শোননি। শুনবে কেন? তোমরা তো হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে উম্মত্ত ছিলে। কাকে মারবে, আর কাকে মারবে না সেই বিচারের বোধ তোমরা হারিয়ে ফেলেছিলে। তোমরা মৃত্যুর উৎসবে মেতেছিলে। কেউ কেউ এভাবে মৃত্যুকে উৎসব বানিয়ে ফেলে।

মৃত্যুকে আমার ভয় নাই। আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি। নিজের মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। তোমাদের বলেছিলাম ওদেরকে মেরো না। ওরা এই পরিবারে এসেছিল পুত্রবধু হয়ে। এক মাসেরও বেশি সময় ওরা ওদের বিবাহিত জীবন পায়নি। জীবনের কাছে ওদের অনেক পাওনা বাকি ছিল, সশস্ত্র বাহিনীর ছেলেরা। তোমরা এইটুকু ভাবতে পারোনি। আবারও প্রশ্ন করি মেয়ে দু'টোকে মারলে কেন? যে মেয়েদুটো ঘর আলো করে আমার কাছে এসেছিল? ওদের কি অপরাধ ছিল তোমাদের কাছে?

আমার দশ বছরের ছোট্ট রাসেলের কি অপরাধ ছিল তোমাদের কাছে? তোমরা ওর মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করেছ? তোমাদের বুকে একটুও বাধল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমরা একটি শিশুর সঙ্গে এই নিষ্ঠুরতা করতে পারলে? হ্যাঁ, পারলে তো। জিজ্ঞেস করি কেমন করে পারলে? এর বেশি কিছু তো ও তোমাদের কাছে চায়নি। ও তোমাদের কাছে আবদার করেছিল ওকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। এত ক্ষুদ্র চাওয়া কি মানুষকে খুন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে? তোমার কি ভেবেছিলে ও শুধুই একটি পিঁপড়া!

আমার ছেলেদের কি অপরাধ ছিল তোমাদের কাছে? ভীরু-কাপুরুষের মতো রাতের অন্ধকারে মারতে এলে কেন? ওদের অন্যায় থাকলে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে? সেটা না করে নিজেরা আর একটি অন্যায়ের পথে পা রাখলে?

আমার স্বামীর যদি কোনো অপরাধ থাকতো, তাহলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য একটি গণআন্দোলনই যথেষ্ট ছিল। তিনি সাধারণ মানুষের দাবি মাথা পেতে নিতেন, সাধারণ মানুষের কথা শুনতে শুনতেই রাজনীতি করতে শিখেছিলেন। নেতা হয়েছিলেন। সেটি খুব সহজ কাজ ছিল না। জীবন দিয়ে তিনি এই কাজের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। দেশের প্রেসিডেন্টকে মারার জন্য তোমরা যদি এত শক্তিধর হয়ে থাক তাহলে রাতের অন্ধকার বেছে নিলে কেন? গুপ্তহত্যা তো কোনো সম্মানজনক বিবেচনা ছিল না।

তোমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনকে মেরেছ কেন? এতবড় অপরাধ করার সাহস তোমরা কোথায় পেলে? কোন স্বার্থে তোমরা এমন একটি উদাহরণ তৈরি করলে?

এখন আমাকে বলতে দাও।

আমার দাবির কথা আমি এ দেশের মানুষের সামনে চিৎকার করে বলতে চাই।

আমি তোমাদের এই অপরাধের বিচার চাই।

আমি বেগম ফজিলাতুননেসা মুজিব তোমাদের বিচার চাই।

অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে, সেটা যেন না হয় আমি সে দাবি জানাই। এ দেশের মানুষের কাছে এ দাবি জানিয়ে যাচ্ছি। একদিন তারা যেন এই অপরাধের বিচারের দাবি নিয়ে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায় জেগে ওঠে।

আমি বিচার চাই। বিচার চাই। বিচার চাই।

৩৮.

সাক্ষী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবুল বাশারের জবানবন্দী :

7. Lt. Col. Abul Bashar B. A. 901.
P. W. -7

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং-৩১৯/৯৭

আন্দাজি- ৫১ বয়স্ক, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবুল বাশার জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১৩/৮ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম- লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল বাশার, বি. এ.-৯০১, আমার পিতার নাম মরহুম আব্দুল ওহাব, আমার বাসস্থান- গ্রাম উত্তর জুরকাঠি, পুলিশ স্টেশন- থানা নলছিটি, বয়স- ৫১ বৎসর। জেলা- ঝালকাঠি,

বর্তমান ঠিকানা- ৫৬৬/৩ কচুক্ষেত অফিসার্স কোয়ার্টার, ঢাকা সেনানিবাস।

আমি বর্তমানে এল. পি. আর. এ আছি। আমি ১৯৭০ সনের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীতে যোগদান করি। ১৯৭০ সনের ৬ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন লাভ করি। ট্রেনিং শেষে ১২ মিডিয়াম আর্টিলারি রেজিমেন্টে শিয়ালকোটে যোগদান করি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমি পাকিস্তানে ছিলাম। ১৯৭৩ সনের ২৯শে ডিসেম্বর রিপ্যাট্রিয়েশনে আমি বাংলাদেশে আসিয়া আর্মিতে যোগদান করি। ১৯৭৪ সনের ৪ঠা জুন আমি ওয়ান ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট, কুমিল্লায় যোগদান করি। ঐ সময় আমার ইউনিটের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আলী আনসার। সেকেন্ড ইন-কমান্ড ছিলেন মেজর শরিফুল হক ডালিম এবং এডজুটেন্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা। ঐ সনের জুলাই/আগস্ট মাসে আমি ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পাই। ১৯৭৫ সনের জুলাইয়ের শেষ দিকে ঢাকায় গণভবন এবং তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডিস্থ ৩২ নং রোডের বাড়িতে ডিউটি করার জন্য আদেশ/বদলি পাই। ১৯৭৫ সনের জুলাই ২৭/২৮ তারিখে আমি ১০৫ জনের একটি কোম্পানি/ব্যাটারি লইয়া ঢাকায় আসি। ১লা অথবা ২রা আগস্ট আমি ফার্স্ট বেঙ্গল ল্যান্সার হইতে দায়িত্ব বুঝিয়া নেই। ঐ ল্যান্সারের তখন স্কোয়াড্রান কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান। আমার ব্যাটারির মেইন বডি গণভবনে থাকিত এবং আনুমানিক ২৫ জনের একটি প্লাটুন বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নং রোডস্থ বাড়িতে ডিউটি করার জন্য ৩১ নং রোডস্থ একটি বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে। গণভবনে মেইন বডির দায়িত্ব ছিল সুবেদার কবির এবং ৩১ নং রোডে অবস্থানরত প্লাটুনের দায়িত্বে ছিল নায়েব সুবেদার মোতালেব। তাহার অধীনে গার্ড কমান্ডার হিসাবে হাবিলদার গনি ও হাবিলদার কুদ্দুস নিয়োজিত ছিল। গণভবনে আমার থাকার জায়গা না দেওয়ায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মিলিটারি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার মাশরুরুল হক সাহেবের অনুমতিক্রমে আমার মামার বাসা অজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ে আমার থাকার ব্যবস্থা করি।

১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট দুপুর বেলা রেজিমেন্টাল সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার আমার ব্যাটারীর সৈনিকদের (ঢাকায় কর্মরত) বেতন নিয়া ঢাকায় আসে। আমি ১৯৭৪ সনে কুমিল্লায় যোগদানের পর মেজর শরিফুল হক ডালিম চাকুরিচ্যুত হন। ১৪ই আগষ্ট/৭৫ তারিখ বিকাল বেলা সুবেদার মেজর কবির বেতন বিতরণ করে। ঐ দিন বিকাল বেলা যথারীতি দায়িত্ব পালনের পর আমার আজিমপুর বাসায় চলিয়া যাই। ১৪/১৫ই আগস্ট রাত্রিতে আমি আমার বাসায় অবস্থান করি। ১৫ই আগস্ট সকাল বেলা আমার বাসার কাজের ছেলে আব্দুল দোকানে রুটি আনিতে যায়। ফিরিয়া আসিয়া জানায়, আজ রুটি পাওয়া যাইবে না, দেশে মার্শাল 'ল' হইয়াছে।

তখন আমার মামা মোহসিনুল আলম রেডিও অন করিলে শুনিতে পাই, আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে, সরকার উৎখাত করা হইয়াছে, দেশে মার্শাল 'ল' জারী করা হইয়াছে ইত্যাদি।

আমি সাথে সাথে টেলিফোনে গণভবনে যোগাযোগ করি এবং আমার গাড়ি পাঠাইতে বলি। কিন্তু গাড়ি আসে নাই। ১৫ই আগস্ট আনুমানিক ১০/১০-৩০ টার দিকে সুবেদার মেজর আব্দুল ওহাব জোয়ারদার জিপযোগে আমার বাসায় আসিয়া আমাকে জানায় ল্যান্সারের সৈনিকরা সকাল বেলা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে। তাহাদের সাথে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ছিলেন। পরে তাহারা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। তিনি আরো জানান যে, আমার ব্যাটারির ল্যান্স নায়েক শামসুও এই ঘটনায় নিহত হয় এবং অপর একজন সৈনিক আহত হয়– নাম মনে নাই। তিনি সবশেষে বলেন, স্যার যা হবার হয়ে গেছে। বাতাসের উল্টো দিকে যাওয়া ঠিক হবে না। আমি তখন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাইতে চাহিলে তিনি বলেন, স্যার আপনার এখন যাওয়ার দরকার নেই– আমি পরে গাড়ি পাঠাচ্ছি– তখন আপনি আসিবেন। পরবর্তীতে বেলা অনুমান ১২/১২-৩০ টার দিকে গাড়ি আসিলে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতাড়ি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে রওনা দেই। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাইবার আগে রাস্তার মধ্যে ল্যান্সার এবং আর্টিলারির কিছু সৈন্য দেখিতে পাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দক্ষিণ দিকে লেকের পাশে ক্যাপ্টেন বজলুল হুদার সাথে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠলেন, Sorry Bashar. I could not inform you earlier for obvious reason-it was not possible.

এই সময় আমি ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাকে মেজরের ব্যাজ (শাপলা) পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাই এবং সুবেদার মেজর আবদুল ওহাব জোয়ারদারকেও তখন লেফটেন্যান্টের র‍্যাংক ব্যাজ পরিহিত অবস্থায় দেখি।

তখন মেজর বজলুল হুদা আমাকে বলিলেন, সুবেদার মেজর আবদুল ওহাব জোয়ারদারকে তাহার কাজের জন্য পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে।

ইহার কিছুক্ষণ পর আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ঢুকি। আমার সাথে ওহাব জোয়ারদার ও একজন এন. সি. ও. (খুব সম্ভব হাবিলদার কুদ্দুস) ছিল। ঢোকার পথে রিসেপশনিস্ট রুমে শেখ কামাল এবং সাদা পোশাক পরিহিত একজন পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ দেখিতে পাই। পার্শ্ববর্তী একটি বাথরুমে শেখ নাসেরের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ দেখিতে পাই।

দোতলায় উঠার পথে সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর গুলিবিদ্ধ লাশ দেখিতে পাই। তারপর দোতলার একটি বেডরুমের সামনে বেগম মুজিবের গুলিবিদ্ধ লাশ এবং ঐ বেডরুমে শেখ জামাল, শেখ রাসেল, মিসেস্ কামাল, মিসেস্ জামালের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখিতে পাই।

আমাকে সুবেদার মেজর আবদুল ওহাব জোয়ারদার বলে, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বেগম মুজিব কান্নাকাটি করিতেছিলেন– তখন আমি (আবদুল ওহাব জোয়ারদার) বেগম মুজিবের সাথে কথা বলিতেছিলাম– তখন আমার পাশ হইতে ল্যান্সারের কিছু সৈনিক বেগম মুজিবকে গুলি করে এবং পরে রুমে ঢুকিয়া বাকীদের গুলি করিয়া হত্যা করে। আমি তখন কিছুটা বিচলিত হইয়া তাহাকে বলি, এস. এম. (সুবেদার মেজর) সাহেব করেছেনটা কি?

উত্তরে জোয়ারদার বলিল, স্যার যা হবার হয়েছে। করেছি।

পরবর্তীতে তিনি জানান হত্যাকাণ্ডের পরপর ল্যান্সারের ছেলেরা (সৈনিকরা) বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হইতে কিছু মূল্যবান দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছে।

তারপর আমি নীচে নামিয়া আসিয়া বাড়ির উত্তর-পশ্চিম পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যারেজে একটি গাড়িতে কর্ণেল জামিলের মৃতদেহ দেখি। এই সময় একজন এ. সি. ও. আমাকে বলে যে, বঙ্গবন্ধু এবং তাহার পরিবারের হত্যাকাণ্ডে মেজর বজলুল হুদা, মেজর নূর এবং মেজর মহিউদ্দিন ল্যান্সার অংশগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে দেখিয়াছে। (আসামী পক্ষের আপত্তিতে এই বক্তব্য রেকর্ড করা হয়)। ঐদিন বিকাল ৪/৪-৩০ টার দিকে একটি সশস্ত্র জিপে মেজর ডালিম বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং রোডের বাড়িতে আসে এবং বাড়িতে ঢুকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখে।

১৬ই আগস্ট/৭৫ তারিখ সকাল বেলা আমি গাড়িতে পেট্রোল নিবার জন্য মোহাম্মদপুর (মিরপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে) পেট্রোল পাম্পে যাই। তখন পেট্রোল পাম্প বন্ধ দেখিতে পাই। কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারি যে, ১৫ই আগস্ট রাত্রে ৪টার দিকে ঐ পাম্পের একজন কর্মচারি একটি গোলার আঘাতে তাহার বাসায় মারা যায়। পরবর্তীতে জানিতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত টু-ফিল্ডের একটি ব্যাটারি যাহারা ঘটনার সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দক্ষিণ দিকে লেকের পাড়ে অবস্থান নেয়– তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতেই ঐ পাম্পের কর্মচারি তাহার বাসায় নিহত হয়। (আসামীর পক্ষের আপত্তিতে রেকর্ড হয়)।

পরবর্তীকালে এও জানা যায় যে, এই ব্যাটারির কমান্ডার ছিলেন আর্টিলারির মেজর মহিউদ্দিন (আপত্তিতে রেকর্ড হয়)।

১৬ই আগস্ট সকালে কুমিল্লা সেনানিবাসে যাই এবং আমার রেজিমেন্টাল কমান্ডার আমীর আনসারকে ঘটনার বিবরণ দেই। বিশেষ করিয়া আমার রেজিমেন্টের ল্যান্স নায়েক শামসু নিহত এবং অপর সৈনিকের আহত হওয়ার কথা বলি।

ইহা সত্য নহে যে, ১৫ই আগস্ট বিকাল বেলা মেজর ডালিম ঘটনার বাড়িতে যান নাই বা আমি তাহাকে দেখি নাই বা আমি রাষ্ট্রপক্ষের একজন সাজানো সাক্ষী বা অসত্য সাক্ষ্য দিলাম।

XX-D. দফাদার মারফত আলীর পক্ষে জেরা ঃ–

পূর্ববর্তী জেরা গ্রহণপূর্বক অতিরিক্ত জেরা ঃ–

আমরা রাষ্ট্রপতির ভবনে ডিউটি করার জন্যই কুমিল্লা হইতে আসিয়াছিলাম। আমার ব্যাটারিতে কতজন জে. সি. ও. ও কতজন এন. সি. ও. ছিল তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে অনেকের নাম মনে আছে। যেমন– সুবেদার কবির, নায়েক সুবেদার মোতালেব, হাবিলদার গনি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালিদার কুদ্দুস, নায়েব জলিল, ল্যান্স নায়েক শামসু, নায়েক সোহরাব প্রমুখ। ঘটনার পরে মেজর এবং লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে পদোন্নতি পাই।

ইহা সত্য নহে যে, আমি এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলাম বিধায় হত্যাকাণ্ডের পরে আমাকে ২টা পদোন্নতি দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরে আমার অধীনস্থ জে. সি. ও., এস. সি. ও. ও সৈনিকেরা কে কখন কি পদোন্নতি পাইয়াছে তাহা আমি জানি না। ইহা সত্য নহে যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম বা আমার অধীনস্থদের নিকট হইতে ঘটনা সম্পর্কে কিছুই শুনি নাই।

XX-D. আসামী আবদুল ওহাব জোয়ারদারের পক্ষে জেরা ঃ–

১৩-১১-৯৬ তারিখে ডি. জি. এফ. আই. দফতরে তদন্তকারী অফিসারের কাছে জবানবন্দি দেই। তদন্তকারী অফিসারের কাছে ৩/৪ ঘন্টা জবানবন্দি দেই। সৈনিকদের বেতন পে-বুকে এবং একাউনটেন্সি রুলের মাধ্যমে Paying Officer পরিশোধ করে। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট সৈনিকদের বেতন Paying Officer সুবেদার কবির পরিশোধ করে। আমি Pay Book যতদূর মনে পড়ে সই করি নাই। ১৪ই আগস্ট বেলা ২টার সময় আমি গণভবন হইতে যাই। পরে আবার ৪টার সময় আসি। ৪টার কাছাকাছি সময় সৈনিকদের বেতন দেওয়া শুরু হয়। কয়টা পর্যন্ত গণভবনে বেতন দেওয়া হয় তাহা স্মরণ নাই। তবে ৩১ নং রোডে যাহারা ছিল তাহারা বাদে অন্যদেরকে ঐ দিন বেতন দেওয়া হয়। সুবেদার মেজর ওহাব জোয়ারদার ৪জন বা কতজন Pay clerk নিয়া বেতন দিবার জন্য ঢাকা আসেন তাহা আমার জানা নাই। এই আর্টিলারি রেজিমেন্টের বেতন কুমিল্লা হইতে দেওয়া হয়। আর্মিতে লেফটেন্যান্ট হইতে উপরের দিকে সকল পদোন্নতির গেজেট নোটিফিকেশন হয়। স্বাধীনতার বা বিজয় দিবসে অনারারী পদোন্নতিগুলি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু প্রসেস হয় আগে হইতে। ১৯৭৪ সনে ওয়ান ফিল্ড রেজিমেন্টে যোগদানের পর হইতে আবদুল ওহাব জোয়ারদারের সহিত পরিচয় হয়। তিনি পাকিস্তান আমল হইতেই আর্টিলারিতে সুবেদার মেজর। তিনি মার্চ/৭৭ হইতে লেফটেন্যান্ট হিসাবে পদোন্নতি পাওয়ার গেজেট নোটিফিকেশন হইয়াছে কিনা তাহা আমি জানি না। পরে নিজে থেকে বলেন যে, তাহাকে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট তারিখে লেফটেন্যান্টের ব্যাজ পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। তিনি অনারারি ক্যাপ্টেন হিসাবে অবসর গ্রহণ করার কথা শুনিয়াছি। লেফটেন্যান্ট হিসাবে কুমিল্লায় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন বেতন নিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই।

বঙ্গবন্ধু বাসভবনে আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিয়া পতাকা অর্ধনমিত করি নাই।

১৫ই আগস্ট সকাল৬/৬-৩০ টার সময় টেলিফোনে গণভবনে যে ডিউটি ক্লার্কের সহিত আমার আলাপ হয় তাহার নাম জানি না।

তারপরও একাধিকবার গণভবনের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কাহাকেও পাই নাই। ১৫ই আগস্ট সকাল বেলা যতক্ষণ বাসায় ছিলাম ততক্ষণ মাঝে মাঝে রেডিওর ঘোষণা শুনিয়াছি।

৩৯.

আমি তোমার চশমা বঙ্গবন্ধু।

এই মুহূর্তে সিঁড়িতে তোমার পাশেই আছি। তুমি হাত বাড়ালেই আমাকে পাবে। সেই ছোটবেলা থেকেইতো তোমার চশমার খুব দরকার ছিল। ষোল বছর বয়সে তোমার চোখে গ্লুকোমা হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য তোমার আব্বা তোমাকে নিয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। তোমাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দশ দিনের মধ্যে তোমার দুই চোখের অপারেশন হলো। ডাক্তার কিছুদিন তোমার পড়াশোনা বন্ধ রাখতে বললেন। চশমা পরতে বললেন। সেই ষোল বছর বয়স থেকে তুমি চশমা পরছো বঙ্গবন্ধু। কতভাবে আমি তোমার সঙ্গে দিন কাটিয়েছি তা তুমি যেমন জানো, আমিও জানি। আমিতো তোমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও থাকিনি।

তোমার জীবনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। সবই আমি দেখেছি। তোমার সঙ্গে জেলখানায় থেকেছি। পাকিস্তানের জেলেও। তবে তোমার দু'টো ঐতিহাসিক সময় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ৭ মার্চ ভাষণের সময় যেমন আমার কাছে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, তেমন মৃত্যুর সময়ে কাছে থাকতে পারাকেও আমি সৌভাগ্য মনে করছি বঙ্গবন্ধু। পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সেসব বস্তুর সবসময় এমন সৌভাগ্য হয় না।

৭ মার্চের ভাষণের সময় তুমি আমাকে চোখ থেকে খুলে তোমার সামনের পোডিয়ামের উপরে আমাকে রেখেছিলে। রেসকোর্স ময়দানের কয়েক লক্ষ মানুষের লক্ষ লক্ষ চোখ তোমার মুখে আটকে ছিল তা আমি বলতে পারব না। যখন তুমি ভাষণ দিচ্ছিলে তখন এক আশ্চর্য নীরবতায় থমথম করছিল পরিবেশ। মানুষের কানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল তোমার বজ্রকণ্ঠ। মানুষ নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিতে, সাহসে, প্রেরণায় বুকভরে তুলে নিচ্ছিল তোমার কণ্ঠস্বর। আমি শুধু আশ্চর্য হইনি। আমি দেখেছিলাম তোমার মাথা উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে, আর নত হয়ে আসছে আকাশ। নত হওয়া আকাশ তোমার মাথার উপরে ছাউনির মতো থমকে ছিল। আকাশের স্পর্ধা ছিল না তোমার মাথা স্পর্শ করার। সেই এক আশ্চর্য বিকেলে তোমাকে দেখেছিলাম লক্ষ মানুষের স্বপ্নের অসাধারণ মানুষ হিসেবে। বাড়ি ফিরে যাওয়া মানুষের কণ্ঠে শুধুই ছিল তোমারই বন্দনা।

এখন আমি আবার তোমার সঙ্গে আছি। তোমার মৃত্যুর স্মারক-চিহ্ন হিসেবে থাকব। শয়তান-দস্যুরা যদি আমাকে ভেঙে না ফেলে তাহলে তোমার নামে গড়ে ওঠা জাদুঘরে আমাকে রাখা হবে। যারা জাদুঘর দেখতে আসবে তারা বলবে, ওই দেখো বঙ্গবন্ধুর চশমা। যারা তোমার সাত মার্চের ভাষণ রেসকোর্সে বসে শোনেনি তারা আমাকে তোমার ছবির সঙ্গে দেখবে।

তোমার জীবনের দু'টি ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমাকে ধন্য করেছে বঙ্গবন্ধু। তোমার ৭ মার্চের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি এই মুহূর্তে বুকে গুলি নিয়ে সিঁড়িতে শুয়ে থাকা সময়ের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

আমি জানি আর কেউ আমাকে তোমার নাকের ডগায় দেখবে না। আমি তোমার দৃষ্টিকে প্রখর করব না। তারপর যদি আবার নতুন দিন আসে। আবার যদি তোমার নতুন করে পৃথিবী দেখার ইচ্ছা হয় তখনও আমি তোমার কাছে থাকব। হাত বাড়ালে আমাকে পাবে। আমাকে তোমার খুঁজতে হবে না।

বঙ্গবন্ধু আমি তোমার টোবাকোর কৌটা আর আমি পাইপ। কত গুরুত্বপূর্ণ সময় তুমি আমাদের সঙ্গে কাটিয়েছ। যখন তোমাকে গভীর করে কিছু ভাবতে হয়েছে, তখন তুমি রুম থেকে সবাইকে যেতে বলে নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তখন আমরা দু'জনে তোমার সঙ্গে থাকতাম। আমাদের সাহচর্যে তোমার চিন্তার দরজা খুলে যেত। এখন তোমার শেষ বিদায়ের সময় আমরা তোমার কাছে আছি। দস্যুরা আমাদেরকে তোমার পাশ থেকে সরাতে পারেনি। যখন সেনারা তোমাকে গুলি করে তখনও তোমার একহাতে আমি ছিলাম, অন্যহাতে একটি দিয়াশলাই। তুমি কত অসংখ্য দিন তামাক ভরে দিয়াশলাই দিয়ে জ্বালিয়েছিলে। আমি পরম উষ্ণতায় তোমার সেই আনন্দ উপভোগ করেছি। তোমার মগ্নতার প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে আছে। স্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেনারা মুখোমুখি হওয়ার সময়ও তুমি আমাকে ছাড়নি। আমরাতো জানি তুমি কীভাবে টোবাকোর গন্ধে ডুবে গিয়ে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে। তোমার সঙ্গে আমাদের গভীর যোগাযোগ ছিল এভাবেই।

আমরা তোমার পোষা কবুতর বঙ্গবন্ধু। তোমার চারপাশে জড়ো হয়ে বসে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবো না এই সিঁড়ির ওপরে তুমি একা। আজ আমাদের কণ্ঠে ডাক নাই। আমরা বকমবকম শব্দে তোমার চারদিক মাতিয়ে তুলতে পারছি না। আমাদের কণ্ঠ বন্ধ হয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধু তুমি আমাদেরকে ভালোবাসতে। তোমার ভালোবাসা বুকে নিয়ে উড়ে যাব সারা দেশে। ঘরে ঘরে পৌঁছে দেব তোমার কথা। সবাইকে বলবো, গুলি তোমার বুক ঝাঁঝরা করেছে ঠিকই, কিন্তু মৃত্যু তোমাকে হারাতে পারেনি। তোমার পরাজয় নেই। আমরা তোমাকে ঘিরে বসে আছি। আমাদের পাহারায় উষ্ণতা আছে। তুমি ঘুমাও বঙ্গবন্ধু। শান্তির চিরনিদ্রায় তোমার অমরত্ব অমৃতের সাধনা হোক।

৪০.

সাক্ষী লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবদুল হামিদের জবানবন্দি :

9. Lt. Col. (Rtd.) Abdul Hamid
P. W. -9
জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৪

AMARBOI.COM

আন্দাজি– ৬৫ বৎসর, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আব্দুল হামিদ– এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৬/৮ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল (অবঃ) মোঃ আব্দুল হামিদ, বয়স– ৬৫ বছর, আমার পিতার নাম মৃত আলহাজ্ব মোঃ সৈয়দ আলী, আমার বর্তমান বাসস্থান- ৫১ নং ডি. ও. এইচ. এস. ক্যান্টনমেন্ট, জেলা– ঢাকা।

আমি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আমি ১৯৫৩ সনে অফিসার ক্যাডেট হিসাবে যোগদান করিয়া পাঞ্জাব সেনাবাহিনীতে ১৯৬৫ সনে কমিশন পাই। ১৯৭১ সনে পেশোয়ারে ৬ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে মেজর হিসাবে কর্মরত ছিলাম।

১৯৭২ সনে পাকিস্তানের ক্যাম্প হইতে পলায়ন করিয়া বাংলাদেশে আসি। এখানে আসিয়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মিলিটারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্রেটারী হিসাবে যোগদান করি। ১৯৭৩ সনে লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল হিসাবে পদোন্নতি পাই। ১৯৭৫ সনে ঢাকায় স্টেশন কমান্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। তখন চীফ অব স্টাফ ছিলেন মেজর জেনারেল শফিউল্লা। উপ-চীফ ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। চীফ অব স্টাফ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, ডি. এম. ও. ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল নূর উদ্দিন খান। ডি. এম. আই. লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল সালাউদ্দিন, ডি. জি. এফ. আই. ছিলেন ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ, ৪৬ নং ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন কর্ণেল সাফায়েত জামিল।

আমরা সিনিয়র অফিসাররা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট টেনিস কোর্টে নিয়মিত টেনিস খেলিতাম। ১৪ই আগস্ট বিকাল বেলা জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল মামুন, কর্ণেল খোরশেদ এবং আমি টেনিস খেলিতেছিলাম। তখন আমি লক্ষ করিলাম চাকুরিচ্যুত মেজর ডালিম এবং মেজর নূর টেনিস কোর্টের আশেপাশে ঘোরাফেরা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এদের ২ জনকে ঐ আগস্টের প্রথম হইতে এইরূপভাবে টেনিস কোর্টের আশেপাশে দেখিতে পাই। ইহা আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। কারণ তাহারা ছিলো চাকুরিচ্যুত জুনিয়ার অফিসার। একদিন জেনারেল শফিউল্লাহ আমাকে বলিলেন, এরা চাকুরিচ্যুত জুনিয়র অফিসার, এরা কেন এখানে টেনিস খেলিতে আসে এদেরকে মানা করিয়া দিবেন এখানে যেন না আসে।

খেলা শেষে আমি মেজর নূরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কার অনুমতি নিয়া এখানে খেলিতে আস। জবাবে জানাইলেন, আমরা জেনারেল জিয়ার অনুমতি নিয়া এখানে খেলিতে আসি।

পরের দিন সকাল অর্থাৎ ১৫-৮-৭৫ তারিখ সকাল আনুমানিক ৬টার দিকে অফিসে যাইবার প্রস্তুতি নিতেছিলাম। তখন কর্ণেল আবদুল্লা আমাকে টেলিফোনে জানাইলেন কিছু শুনেছেন? আমি বলিলাম, না আমি কিছু জানি না। তখন সে বলিল, আপনি রেডিও অন করেন। রেডিও অন করিতেই মেজর ডালিমের কণ্ঠ শুনিলাম– সে ঘোষণা দিতেছে– শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে– শুনিয়া আমি চমকে উঠিলাম এবং তাড়াতাড়ি অফিসে যাইবার জন্য তৈরি হইতেছিলাম। এমন সময় জেনারেল শফিউল্লাহ টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্যান্টমেন্ট হইতে আর্টিলারি আরমার বাহির হইয়া হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছে, তুমি কিছু জান? আমি বলিলাম, কিছুই জানি না। তবে রেডিওতে ঘোষণা শুনিতেছি, আরও বলিলাম অফিসে যাইতেছি যদি কিছু থাকে আমি তোমাকে জানাইব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আমি অফিসে গেলে আমার ফোর্সরা জানাইল, ট্যাংক লইয়া ওরাতো ৪৬ ব্রিগেডের ভিতর দিয়াই গেল– তাহারা যে হত্যাকাণ্ড ঘটাইবে আমারতো কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

তখন তাহাদেরকে আতংকগ্রস্ত দেখিয়াছি। তারপর আমি আর্মির জিপ লইয়া হেড কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিলাম। সেখানে পৌঁছাইয়া দেখিলাম, লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল নূর উদ্দিনের অফিসের সামনে অনেক অফিসার জড়ো হইয়া আলোচনা করিতেছে। আমি জিপ হইতে নামিয়া সেখানে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বেঙ্গল ল্যান্সারের কমান্ডিং অফিসার কর্ণেল মমিনের সাথে কথা বলিতেছিলাম। এমন সময় লক্ষ করিলাম কালো পোশাক পরিহিত কিছু সৈনিকসহ দুইটি জিপ ঘোঁ-ঘোঁ করিয়া প্রধান গেইট দিয়া আর্মি হেড কোয়ার্টারে ঢুকিয়া পড়িলো। একটি জিপ আমাদের সামনে আসিতেই কর্ণেল মমিন হাত দিয়ে ইশারা করিয়া আমাকে বলে সঙ্গে সঙ্গে জিপ হইতে উন্মুক্ত স্টেনগান হাতে মেজর ডালিম নামিয়া পড়ে এবং চিৎকার করিয়া বলে– Shut up, get away from here– এতে তখন এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অফিসাররা আতংকগ্রস্থ হইয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে যে দিকে পারিলো ছুটিয়া পালাইলো। তারপর মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায় সরাসরি জেনারেল শফিউল্লাহর রুমে ঢুকিয়া পড়ে। তখন আনুমানিক সময় ৮-৩০টা। ইহার কিছুক্ষণ পর দেখিলাম স্টেনগানের মুখে জেনারেল শফিউল্লাহকে মেজর ডালিম রুম হইতে লইয়া আসে। পিছন পিছন জেনারেল জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, কর্ণেল নাসিম ছিলেন। সেখানে অপেক্ষমান প্রথম গাড়িতে জেনারেল শফিউল্লা উঠিলেন এবং ২য় গাড়িতে (জীপ) মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায়, ৩য় গাড়িতে জেনারেল জিয়া, ৪র্থ গাড়িতে মেজর ডালিমের লোকজন উঠিলেন। ৪টি গাড়ির কনভয় সেনা সদরের আউটার গেইট দিয়ে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে ৪৬ ব্রিগেডে চলিয়া গেল।

১০/১৫ মিনিট পরে আমি সেনা সদর ত্যাগ করিয়া আমার অফিসে চলিয়া গেলাম। সেখানে রেডিও খুলিয়া সংবাদ শুনিতেছিলাম। আনুমানিক ১০-৩০টার দিকে তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশ ও বি. ডি. আর. প্রধানের আনুগত্য ঘোষণার কথা শুনি।

আনুমানিক ১১টার দিকে সি. জি. এস. খালেদ মোশারফ টেলিফোনে ৪৬ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে পৌঁছিতে বলিলেন। সেখানে তিনি বলিলেন, তাড়াতাড়ি করে একট সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করুন। কারণ পরিস্থিতি অনিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসে ফেরত আসিয়া সিকিউরিটি প্ল্যান তৈরি করিতে বলিয়া গেলাম। আনুমানিক ৩টার দিকে জেনারেল শফিউল্লাহ টেলিফোনে আমাকে শহরের এবং বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অবস্থা দেখিয়া রিপোর্ট দিতে বলিলেন। তার নির্দেশ মতো বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাইয়া দেখি চর্তুদিকে সশস্ত্র আর্টিলারি ও আরমারের লোকজন অবস্থান করিতেছে। আমার পরিচয় পাইয়া তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া দেয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেইটে মেজর আজিজ পাশা এবং মেজর হুদা আমাকে রিসিভ করিলেন। আমি তখন বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতরে যাইতে চাহিলে মেজর আজিজ পাশা মেজর হুদাকে নির্দেশ দিল আমাকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে। হুদা তখন আমাকে রিসেপশন রুমে নিলে সেখানে শেখ কামাল এবং একজন পুলিশ অফিসারের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখি। তার দোতলার সিঁড়িতে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখি। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমি এবং মেজর হুদা দোতলায় যাই। সেখানে বাম দিকের রুমের দেউড়িতে বেগম মুজিবের এবং রুমের ভিতরে শেখ জামাল, মিসেস্ জামাল, মিসেস্ কামাল, শেখ রাসেলের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখি। দেওয়ালে গুলির চিহ্ন দেখি। তারপর নীচে মাথকমে শেখ নাসেরের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখি। বাহিরে বাড়ির পশ্চিম দিকে আসিয়া একটি লাল গাড়িতে কর্ণেল জামিলের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখি।

এই দেখাশোনার পরে অফিসে ফিরিয়া আসিয়া জেনারেল শফিউল্লাহকে টেলিফোনে বঙ্গভবনে পরিস্থিতির বর্ণনা দেই।

AMARBOI.COM

৪১.

সময়ের স্তব্ধ হয়ে থাকা এবং এগিয়ে যাওয়ার ভেতরে চলমান জীবনের ওলোটপালোট চলছে।

সময়টিই এমন। সময়ের হিসাব এখানে অবান্তর। কেউ হিসাব করতে পারবে না। কেউ হিসাব মেলাতে পারবে না। কোন সময়ের কতটুকু কোথায় কীভাবে গড়াচ্ছে এখন এই মুহূর্তের বাংলাদেশে হিসেবের বই নেই। অল্প সময়ে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনায় আগেপিছে হয়ে যায় সময়। থমকে যাওয়া সময় আবার সচল হয় ওদের জীবনে।

এক অদ্ভুত সময় ফিরে আসে ওদের কাছে। এমন সময় মোকাবেলা করা কঠিন। কারণ সেনাবাহিনীর কেউ কেউ একটি লাল গাড়িতে গুলিবিদ্ধ কর্নেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামিলকে দেখতে পায়। এটি শুধুমাত্র একটি মৃত্যুর খবর নয়। এটি একটি অনৈতিক হত্যাকান্ড। এই হত্যাকান্ড পরিবারের পক্ষে মেনে নেয়া সহজ নয়।

এই অনৈতিক পরিস্থিতি বুকের মধ্যে রেখে কর্ণেল জামিলের লাল গাড়ি থেকে লাশ নামায় তপন আর খোকন। ওরা দুই বন্ধু। তপন আনজুমান আরার ছোট ভাই। লাল গাড়ি ৩২ নম্বর রোডের বাড়ির ভেতরে। সেনা সদস্যরা গাড়ি ঠেলে ওই বাড়িতে নিয়ে গেছে। লাল গাড়ি থেকে লাশ বের করে একটি ল্যান্ডরোভারে তোলা হয়। গাড়ি লাশ নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবে।

লালমাটিয়ার বাড়ির সামনে তখন কয়েকজন সেনা সদস্য এসেছে। আনজুমান আরা আর মেয়েদের শেষবারের মতো প্রিয় মানুষটির মুখ দেখানোর জন্য ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাবে। যেতে হবে ওদের তত্ত্বাবধানে। তাই ওরা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষমান। অপেক্ষার সময় দিতে ওরা নারাজ। এক একটি মুহূর্ত গুনছে। তাগাদা দিচ্ছে, যেন ওরা এখন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে। শত্রুর মুখোমুখি। কিন্তু কোনোদিক থেকে শত্রুর গুলি ছুটে যায় না। বড়ই নীরব এই শহর। যা কিছু ঘটছে তার সবটুকু বড় বেশি একতরফা। লালমাটিয়ার প্রতিবেশিরাও জানালা খুলে পাশের বাড়ির দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। তাহলে ওদের কাকে ভয়? এত তাড়াহুড়ো কেন?

বাড়িতে লাশ আনতে দেয়া হবে না। পুরো রাস্তাইতো ফাঁকা। ফাঁকা নয় আক্রমণকারীদের দখলে। তাদের নানা ধরণের গাড়ি আছে রাস্তায়। তারপরও বাড়িতে আনা হবে না বাড়ির মানুষকে। এতই যদি তোমাদের ক্ষমতা তবে ভয় পাচ্ছ কাকে? আঞ্জুমান মেয়েদের নিয়ে গাড়িতে ওঠেন। লালমাটিয়া থেকে ক্যান্টনমেন্ট। ফাঁকা রাস্তায় দ্রুত গতিতে ছুটে যায় গাড়ি। যেন একটি দীর্ঘশ্বাসের সমান গাড়ির গতি। তাঁরা ক্যান্টনমেন্ট পৌঁছে গেলেন। নির্ধারিত স্থানে গাড়ি এসে থামে।

কর্কশ কণ্ঠের হুকুম, নামুন। তাড়াতাড়ি নামুন। সময় নষ্ট করবেন না।

গাড়ি থেকে নামলে আঞ্জুমান দেখতে পান সামনে ল্যান্ডরোভার। তিনি আরো দেখলেন ল্যান্ডরোভার থেকে জামিলের দু'পা বেরিয়ে আছে। শরীরের পুরোটা দেখা যাচ্ছে না। সেটা আড়াল হয়ে আছে। কতবার দেখা ফর্সা পা-জোড়া যেন নতুন করে দেখলেন। তিনি জ্ঞান হারালেন। জামিল কোথাও না কোথাও আছে, এই বিশ্বাস মুহূর্তের মধ্যে চুরমার হয়ে গেল। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না। কোনোকিছু ভেবে কুলিয়ে ওঠারও সাধ্য ছিল না। তিনি ঘটনার ভয়াবহতা একদম বোঝেননি তা তো নয়, তবু ক্ষীণ আশা ছিল যে, জামিল হয়তো কোথাও আছে। কোথাও আটকে রাখা হয়েছে ওকে। কিন্তু শেষ মুহূর্তটি আবার সময়ের অনন্তকাল হয়ে যায়।

চারদিকের ভয়ঙ্কর পরিকল্পিত সাজানো সময়ের হোতারা মেরে ফেলেছে জামিলকে কিন্তু মরদেহ দাফনের প্রকৃত ব্যবস্থা নেই। কাফনের কাপড় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় মতে গোসলের ব্যবস্থা নেই। জানাজা হবে না। অথচ যেতে হবে শেষ ঘুমে। ধর্ম পালনকারী মানুষেরা ধর্মের অবমাননা এভাবেই করে। তারা বিবেক-তাড়িত হয় না। তারা ধর্মের অনুশাসন মানে না। তাদের সামনে এখন কোনো সত্য নেই। লালমাটিয়ার বাড়ি থেকে কফিনের কাপড় হিসেবে সাদা চাদর আসে। কোনো বাড়ি থেকে লোবান-আতর আসে। যেনতেনভাবে গোসল দেয়া হয়। এই অবসরে জ্ঞান ফেরে আনজুমান আরার। তাঁকেতো শেষ দেখা দেখতেই হবে। কিন্তু সেনা সদস্যদের হুমকি, শেষ বারের মতো লাশ দেখানো যাবে না।

একজন উত্তেজিত স্বরে বলে, সোবহানবাগ মসজিদের সামনে তাঁর গাড়ি থামানো হয়েছিল। তাঁকে আমরা নিষেধ করেছিলাম সামনে এগোতে। বলা হয়েছিল, আর এগোলে তাঁর নিজের জীবনের হুমকি হবে। তিনি আমাদের কথা শোনেন নি।

আর একজন আরও উত্তেজিত স্বরে বলে, তিনি বললেন আমাকে বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে যেতে হবে। আমি কারো কথা শুনবো না।

ব্যঙ্গ ঝরে আর একজনের কণ্ঠে, ওনার বঙ্গবন্ধুকে বাঁচানো যেন এত সহজ! তাহলে আমরা কি এই রাতের শহরকে এমনি এমনি মাথায় তুলেছি। যারা তুফান বোঝে না, তুফানেই তাদের মরতে হয়। সেজন্য তাঁকে সেখানেই হত্যা করা হয়। কথা না শোনার শাস্তি মৃত্যু।

বুটের শব্দ দাপিয়ে নিজেদের দম্ভ প্রকাশ করে ওরা। আনজুমান আরার মেয়েরা ভয়ে-আতঙ্কে মাকে জড়িয়ে ধরে। আনজুমান আরা স্থির কণ্ঠে বলেন, আমি তাঁকে শেষবার দেখতে চাই।

কোনো কান্নাকাটি করা চলবে না। আমরা কান্নাকাটি সহ্য করব না।

তিনি আবারও স্থির কণ্ঠে বলেন, আমার মেয়েরা ভয় পেয়েছে। ওরা ভয়েই কাঁদবে না। আর সব হারানোর ভয়ে আমি কাঁদব না। তবু শেষবারের মতো তাকে আমি দেখতে চাই।

দেখানো হলো তাঁকে।

সাদা চাদরে ঢাকা লাশ নীথর পড়ে আছে। মৃত্যু এভাবে মানুষকে নীথর করে দেয়। মানুষকে আর কোনো চৈতন্যের দ্বারস্থ হতে হয় না। তাঁকে আর সাহস নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হতে হয় না। শুধু কলুষিত হয় অপরাধীর হাত। মানবতাবিরোধীর জন্য অপরাধ। মানুষ সেই অপরাধের দায় নিয়ে দাঁড়ায় না বলে সংঘটিত করে অপরাধ।

অপরাধের এক ব্যাপ্ত মুহূর্ত কালো পোশাকপরা সেইসব সেনা সদস্যদের সামনে। ওরা প্রচন্ড দম্ভে আত্মহারা। ওদের সামনে শুধু কালো দিন। কারো কারো সামনে প্রবল কৃষ্ণরাত পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখন এইসব মূর্খ মানুষেরা অমাবস্যাকে পূর্ণিমা ভাবছে। তারা জানে না মিথ্যাকে আড়াল করা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তাই তারা শিশুদের কান্না বন্ধ করে রাখার হুমকি দেয়। তারা অস্ত্র হাতে ওদের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

আনজুমান আরা দেখতে পান সাদা চাদর তখনও রক্তের ধারায় ভিজে যাচ্ছে। দাফনের গোসল দেয়ার পরও সে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়নি। বাবার লাশের দিকে তাকিয়ে বড় দুই মেয়ে দুহাতে মুখ ঢাকে। আর ছোটটি মাকে জড়িয়ে ধরে। আঞ্জুমান আরা মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে কান্না সামলান।

নিষ্ঠুর মানুষগুলো সময়ের ক্ষণকে নিস্তব্ধ করে রেখেছে।

প্রিয়জনের জন্য কান্নার ধ্বনি এই ক্ষণে উচ্চারিত হবে না। শিশুরা শুধু জানে বাবা নেই। আর কোনোদিন ওদের আব্বু ডাকে আর কেউ সাড়া দেবে না। তারপরও ওরা ভয়ে-আতঙ্কে ম্রিয়মান। কারণ আব্বু ডেকে চিৎকার করে কান্না এই মুহূর্তে নিষেধ। ওদের নিষেধ না শুনে কাঁদলে ওদের অস্ত্র থেকে গুলি ছুটে আসবে। ঝাঁঝরা করে দেবে শিশুদের শরীর। এই মুহূর্তে ওরা নিষেধ অমান্য করে গুলিবিদ্ধ হতে চায় না। ওদের মা সবটুকু শক্তি দিয়ে ওদেরকে বেড় দিয়ে রাখেন। তিনি জানেন, একদিন এই শিশুরা বড় হবে। একদিন তারা বাবার এই অন্যায় মৃত্যুর বিচার চাইবে। প্রবল ক্ষত বুকে নিয়ে বড় হতে হতে ওরা একদিন পূর্ণ মানুষ হবে। মানুষের অনৈতিক কাজের জন্য ওরা সেইসব মানুষকে ঘৃণা করবে। আঞ্জুমান নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর মনে হয় তাঁর চোখের পলক বুঝি পড়ছে না। ওই চোখ পলক ফেলতে পারছে না। অসাড় হয়ে গেছে। এখন তাঁর চোখের সামনে স্বামীর নীথর দেহ ছাড়া আর কিছু নাই।

একটুপরে লাশের কফিন গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কয়জন মানুষ কালো পোশাক পরা সেনা সদস্যদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, ওদের জীবনে কোনোদিন কি এমন সময় আসবে, যখন রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে কেউ ওদেরকে বলবে, কাঁদতে পারবে না। এখানে কান্না নিষেধ, প্রিয়জনের শোক যতই বুকের ভেতর গুমরে মরুক না কেন! কাঁন্নার জন্য পারমিশন নিতে হবে। তোমরা এ কেমন অদ্ভুত সময় বানিয়েছ কালো পোশাকধারীরা? তোমরা কান্না বন্ধ রাখার হুকুম দেয়ার কে? কান্নার পারমিশন দেয়ার অথরিটি তোমাদেরকে কে দিয়েছে? এমন একটি আজব সময় বানানোর অধিকার তোমাদেরকে কে দিলো? তোমরা কোথা থেকে এত ক্ষমতা পেলে?

তোমাদের কালো পোশাক আর অস্ত্র দেখে মনে হচ্ছে এখন এমনই দুঃসময় চারদিকে।

কর্ণেল জামিলের বড় দুই মেয়ের কণ্ঠে ঘড়ঘড় শব্দ ধ্বনিত হয়। ওরা বলতে চায়, তোমরা কেমন মানুষ? তোমাদের বুকের ভেতরে এমন নিষ্ঠুরতা কেন? তোমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরকে বাবার জন্য কেঁদে বুক ভাসাতে দাও। তোমাদের কাছে আমরা আর কিছু চাইব না। এই দেশের মানুষের কাছে আমরা আর কিছু চাইবো না। আমরা শুধু আমাদের বাবার জন্য কেঁদে বুক ভাসাব।

সেটাই হয়। পিতার লাশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ভেসে যায় ওদের চোখ। গাল বেয়ে জল গড়ায়।

একসময় ওরা তাক করে রাখা রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। ওদের চিৎকারে মথিত হয় ক্যান্টনমেন্ট এলাকা।

যে যেখানে ছিল মাথা তুলে কান খাড়া করে বুঝতে চায় কোথায় এমন শোকের মাতম? কোথায় ভাঙছে কার বুক? এই বুকভাঙা কান্নার বিপরীতে কারও হাতে অস্ত্র নেই? কেন গর্জে উঠছে না রাইফেল? শিশুদের কান্না উপেক্ষা করে কালো পোশাকধারীদের নিষেধ। শিশুদের কান্না অস্ত্রধারীদের অস্ত্রের বিপরীতে মানবিক চেতনার ঢাল হয়ে দাঁড়ায়।

কালো পোশাকধারীদের পা কাঁপে থরথর করে। ওরা বিমূঢ় হয়ে যায়। যে হাতের অস্ত্র তাক করা কঠিন ছিল ওদের দিকে ওটা মাটিতে নেমে যায়।

শিশুদের কান্নাভরা কণ্ঠস্বর গর্জে ওঠে, একদিন বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে তোমাদের। কোথায় পালাবে তোমরা?

ওদের সমানে দিয়ে কফিনবাহী লাশের গাড়ি চলে যায় গোরস্থানের পথে।

মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আঞ্জুমান। গাড়ি চোখের আড়ালে চলে গেলে সবার ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, আব্বুকে কোথায় নিয়ে গেল ওরা?

ওর প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না।

আমিও আব্বুর সঙ্গে যাব। আমাকে আব্বুর গাড়িতে তুলে দাও। থামাতে বল গাড়ি।

কালো পোশাকধারী একজন কর্কশ কণ্ঠে বলে, তোমাকে এই গাড়িতে উঠতে হবে। এসো।

পোশাকধারী শিশুটির হাত ধরলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বড় দুই বোন বলে, ছাড় ওর হাত। ওকে আমরা গাড়িতে ওঠাব।

দুই বোন ওর হাত ছাড়িয়ে নেয়। পোশাকধারীরা বুঝে যায় যে ওদের সাহস ফিরে এসেছে। ওদের ভয় কেটে গেছে। বাবাকে বিদায় দিয়ে ওরা সাহসী হয়ে উঠেছে। কারণ এখন থেকে বাবাকে ছাড়া ওদের বড় হতে হবে।

ওরা আঞ্জুমান আরার দিকে তাকালে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর গাড়িতে ওঠেন। যে গাড়িতে করে লালমাটিয়া থেকে এসেছিলেন সেই গাড়ি। গাড়ি ছোটে আবার সাঁই সাঁই করে। সেই একই পথ। সাধারণ যানবাহনহীন– শুধু সামরিক বাহিনীর গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যায় আর একটি সামরিক বাহিনীর গাড়ি।

ভেতরে বসে থাকা কয়জন পথের দিকে তাকাতে পারে না। আঞ্জুমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবেন, এ পথ আমাদের নয়, ঘাতকদের। এই পথেই জীবন দিয়েছে জামিল তাঁর দৃষ্টি মেয়েদের মুখের ওপর ফিরে আসে। ওরা মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের চোখে পানি। আঞ্জুমান ওদের জড়িয়ে ধরেন।

গাড়ি এসে লালমাটিয়ার বাড়ির সামনে থামে। সুনসান এলাকা। ওরা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি গাড়ি চলে যেতে দেখে। গাড়িটি ওদেরকে বহন করেছে। এটি কোনো লাশবাহী গাড়ি ছিল না। তারপরও ওদের মনে হয় দ্রুতগামী গাড়িটি পালাচ্ছে। কতদূর যাবে ওরা? কোথায় গেলে ওদের ভয় কাটবে? কোথায় ওরা নিরাপদ থাকবে?

আঞ্জুমান মেয়েদের হাত ধরে বাড়িতে ঢোকেন।

৪২.

আমি কর্ণেল সাফায়েত জামিল সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছি।

44. Col. (Rtd.) Shafayet jamil
P. W. -44
জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৬/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

AMARBOI.COM

আন্দাজি ৫৭ বয়স্ক কর্ণেল (অবঃ) সাফায়েত জামিল– এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৮ সালের ৫/১ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম কর্ণেল (অবঃ) সাফায়েত জামিল, বয়স–৬৫ বছর, আমার পিতার নাম– আবুল হোসেন মোঃ কলিমুল্লা,

বাড়ি নং– ৯, রোড– ১৪সি, সেক্টর– ৪, উত্তরা, ঢাকা।

আমি অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল। আমি ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হই এবং ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টে আমার পোস্টিং হয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ আমি একজন মেজর হিসাবে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের কম্পানী কমান্ডার হিসাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় থাকি। সেখান হইতে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধের পরে আমি লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল হিসাবে রংপুর ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে বদলি হই।

১৯৭৪ সালে আমাকে ঢাকাস্থ ৪৬ ব্রিগেডের কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। ৪৬ ব্রিগেডে তখন ৪টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, ১টি আর্টিলারি রেজিমেন্ট এবং ৬টি সাপোর্টিং এবং সারভিসেস কম্পানি ছিল। পদাতিক ব্যাটালিয়নের নাম ছিল ১ম বেঙ্গল, ২য় বেঙ্গল, ৪র্থ বেঙ্গল এবং ১৬ বেঙ্গল রেজিমেন্ট।

আর্টিলারির নাম ছিল টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট।

১, ২, ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এবং ১৬ বেঙ্গল ছিল জয়দেবপুরে। টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট ছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমান, ২য় বেঙ্গলের সিও ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল আজিজুর রহমান, ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল অমিনুল হক এবং ১৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল চৌধুরী খালেকুজ্জামান। আমি তখন ফুল কর্ণেল ছিলাম।

আমি ৪৬ ব্রিগেডে যোগদানের সময় টু ফিল্ড আর্টিলারির সিও ছিলেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল আলাউদ্দিন। এরপর আসেন লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল আনোয়ার হোসেন। সম্ভবত মে'৭৫ মাসের শেষ দিকে মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ এই রেজিমেন্টে অফিসিয়েটিং সিও হিসাবে পোস্টিং প্রাপ্ত হইয়া জুলাই/৭৫-এ যোগদান করে। আমি ৪৬ ব্রিগেডে যোগদান করার সময় ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাংক রেজিমেন্ট) এই ব্রিগেডের অধীনে ছিল। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের ৫/৬ মাস আগে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সার ৪৬ ব্রিগেড হইতে সরাইয়া আর্মি হেড কোয়ার্টারের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং ইহা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর সিগন্যাল রেজিমেন্টের পাশে মোতায়ন করা হয়। ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের (ট্যাংক রেজিমেন্ট) সিও লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল হোসেন এবং টু-আই-সি. ছিলেন মেজর ফারুক রহমান। মেজর ফারুক রহমান আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন।

বাংলাদেশের অন্যান্য ব্রিগেডের ন্যায় ৪৬ ব্রিগেডেও ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ছিল। কিন্তু ১৫ই আগস্টের ঘটনার আগে এই ফিল্ড ইনটেলিজেন্সকে ৪৬ ব্রিগেড অর্থাৎ আমার নিকট হইতে সরাইয়া নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে পাকিস্তান হইতে রিপাট্রিয়েটেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিসারদের আসা শুরু হয়। তাদের আগমনের সাথে সাথে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের পদোন্নতি, বদলি ও সুযোগ-সুবিধা লইয়া মত বিরোধ দেখা দেয়। পাশাপাশি জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা সাজসরঞ্জাম ও বাজেট লইয়া নানা রকম অপপ্রচার চলে। এই সময় সেনাবাহিনী অস্ত্র উদ্ধারের বেশ কয়েকটি অভিযানে অংশ নেয়। এইরূপ একটি অভিযানে মেজর শরিফুল হক ডালিম পূর্ব শত্রুতার জের হিসাবে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে লাঞ্ছিত ও নাজেহাল করেন।

পারিবারিক কলহের জের হিসাবে মেজর ডালিম গাজী গোলাম মোস্তফার ঢাকার বাড়িতে একজন সহযোগী অফিসার ও সেনাসদস্যসহ হানা দিয়ে তাহাকে ও তাহার পরিবারকে লাঞ্ছিত করে।

মেজর ডালিমের উচ্ছৃংখল কার্যকলাপ ও সেনা আইন ভঙ্গের জন্য তাহাকে চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ইহার জের হিসাবে মেজর নূর চৌধুরী সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে। তারপর মেজর নূরকেও চাকুরি হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। মেজর ডালিম এবং মেজর নূর ১৯৭১ সনে পাকিস্তান হইতে পালাইয়া আসিয়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সেই কারণে তাহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ছিল।

চাকুরীচ্যুতির কারণে তাহারা উভয়েই বঙ্গবন্ধুর পরিবার এবং সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল।

মেজর ফারুক রহমান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করায় ২ বৎসরের সিনিয়রিটি পায় নাই। সেই কারণে সেও বঙ্গবন্ধু পরিবারের ও সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল।

মেজর খন্দকার আব্দুর রশিদ এবং মেজর ফারুক রহমান পরস্পরের ভায়েরা ভাই ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের আগে হইতেই প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে নাইট ট্রেনিং প্রোগামের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং শুক্রবার ছিল প্রশাসনের তারিখ।

দুইটি ইউনিট একত্রে নাইট ট্রেনিং করার কোনো বিধান ছিল না। নাইট ট্রেনিং লাইভ এ্যামিনিশন লইয়াও ট্রেনিং করার বিধান ছিল না। নাইট ট্রেনিংগুলি সিওগণ নিজ দায়িত্বে নিজেদের ট্রেনিং এলাকায় নিজেদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী পরিচালনা করিতেন।

ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারের বার্ষিক ট্রেনিং নীতিমালা অনুযায়ী সিওগণ তাহাদের নিজ নিজ রেজিমেন্টের ট্রেনিং প্রোগ্রাম তৈরি করিতেন।

১৯৭৫ সালের ১৪ই আগস্ট দিবাগত ১০/১০-৩০ টার সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বিবাহের অনুষ্ঠান হইতে বাসায় ফিরিয়া আসি। আমার প্রতিবেশী ব্রিগেডিয়ার সি. আর. দত্ত (যিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব-লজিস্টিক ছিলেন) আমাকে জানাইলেন যে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত আমাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যে কর্মরত একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার নোয়াখালির চরাঞ্চলে বিধ্বংস হয়। বিধ্বংস হেলিকপ্টারের নিহত ক্রুদেরকে ঢাকায় সি.এম.এইচ-এ আনা হইয়াছে। তিনি আমাকে তাহার সাথে সি. এম. এইচ এ লাশগুলি ডিসপোজাল করার জন্য যাইতে বলিলে আমি তাহার সাথে যাই এবং গভীর রাতে বাসায় ফিরিয়া আসি।

১৫ই আগস্ট আনুমানিক সকাল ৬টায় আমার বাড়ির দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার আওয়াজ শুনিয়া দরজা খুলিয়া দেখি টু-ফিল্ড আর্টিলারির অফিসিয়েটিং সিও মেজর খন্দকার আব্দুর রশীদ সশস্ত্র অবস্থায় অর্থাৎ সেন্টগান কাঁধে সাথে নিরস্ত্র দুইজন অফিসার একজন আমার ব্রিগেড মেজর হাফিজ এবং অপর জন আর্মি হেড কোয়ার্টারের অফিসার লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল আমিন আহমদ চৌধুরী, গেটের বাহিরে সশস্ত্র সেনা দলকে গাড়ি ভর্তি অবস্থায় দেখি।

আমাকে দেখা মাত্র মেজর রশীদ বলেন, We have captured state power under Khandaker Mustaque. Sheikh is killed; do not try to take any action against us.

তখন আমি হতচকিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই। সেই মুহূর্তে একটা টেলিফোন আসে। বেডরুমে গিয়া টেলিফোন ধরিলে অপর প্রান্ত হইতে মেজর জেনারেল শফিউল্লা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জানি কিনা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কাহারা ফায়ার করিতেছে। সেই মুহূর্তে আমি জানি না বলিয়া উত্তর দেই। তবে মেজর রশীদ হইতে প্রাপ্ত খবরে আমি বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর জানাই। তখন মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বলিলেন, বঙ্গবন্ধু তাহাকে (শফিউল্লাহ) টেলিফোনে জানাইয়াছেন শেখ কামালকে আক্রমণকারীরা সম্ভবত মারিয়া ফেলিয়াছে।

তখন জেনারেল শফিউল্লাকে খুবই বিষণ্ন এবং ভারাক্রান্ত বলিয়া মনে হইল।

জেনারেল শফিউল্লাহর সাথে টেলিফোন করিয়া আমার তিন কমান্ডিং অফিসারকে ব্যাটালিয়ন গ্রুপে stand to (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া) হওয়ার নির্দেশ দেই। এই নির্দেশ দিয়া বৈঠকখানায় যাই। সেখানে মেজর হাফিজকে পাই কিন্তু মেজর রশীদ এবং কর্ণেল আমিন আহামদ চৌধুরীকে পাই নাই।

আমি দ্রুত ইউনিফরম পরিয়া মেজর হাফিজসহ ব্রিগেড হেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোয়ার্টারের দিকে রওনা দেই। পথিমধ্যে জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাসায় যাই এবং তাহাকে শেভরত অবস্থায় পাই।

আমার নিকট হইতে ঘটনা শোনার পর তিনি বলিলেন, So what, President is killed; Vice President is there, up hold the constitution.

তারপর আমি জেনারেল জিয়ার বাসা হইতে বাহির হইয়া তাহার জিপ গাড়ি পাই এবং ঐ জিপ নিয়া মেজর হাফিজসহ ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে যাই।

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে ঢোকার মূলে একটি ট্যাংক আক্রমণাত্মক অবস্থায় দেখি। উহার উপরে মেজর ফারুক রহমান বসা ছিল।

মেজর ফারুক রহমান এই হইতে আমার সাপ্লাই এবং ট্রান্সপোর্ট কম্পানির সারিবদ্ধ গাড়িগুলির উপরে হেভী মেশিনগান দ্বারা ফায়ার করে। যার ফলে কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কয়েকজন সেনা সদস্য আহত হয়।

১ম বেঙ্গল ইউনিট লাইনের ভিতরে রাস্তার উপর আরো তিনটি ট্যাংক আক্রমণাত্মক অবস্থায় দাঁড়ানো দেখি। তাৎক্ষণিকভাবে ঐ আক্রমণাত্মক ট্যাংকগুলির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব ছিল না।

কৌশলগত কারণে এবং ফায়ার পাওয়ারের বিচার পজিশনে অবস্থানরত ট্যাংক বাহিনীর বিরুদ্ধে পদাতিক সেনাদল কিছুই করিতে পারে না।

আমি ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যাইবার আধা ঘন্টার মধ্যে সেনাবাহিনীর সি. জি. এস. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ ইউনিফরম পরিহিত অবস্থা ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আসেন।

তিনি আমাকে চীফ আব স্টাফের বরাত দিয়া জানাইলেন যে তিনি ৪৬ ব্রিগেডের যাবতীয় অপারেশন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করিবেন। সেখানে তখন ১ম বেঙ্গলের সিও লেফেটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমানসহ কয়েকজন জুনিয়র অফিসার ছিল। সকাল অনুমান ৮টার সময় চাকুরিচ্যুত মেজর ডালিম ইউনিফরম ও সশস্ত্র অবস্থায় একটি জিপে হেভী-মেশিনগান ফিট করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র সেনাসহ মেজর জেনারেল শফিউল্লাকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসে লইয়া আসে। তাহাদের পিছনে পিছনে ডিপুটি আর্মি চীফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও আরো কয়েকজন সেনা হেডকোয়ার্টোরের অফিসে আসেন। অল্প কিছুক্ষণ পরে বিমান বাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার এবং নৌ বাহিনী প্রধান এম. এইচ. খান ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারা কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর মেজর ডালিম চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল শফিউল্লাকে সশস্ত্র অবস্থায় রেডিও-স্টেশনে লইয়া যায়।

পরে বিমান/নেভী-চীফও পিছনে পিছনে রেডিও স্টেশনের দিকে যায়।

আমি এবং মেজর হাফিজ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে চলিয়া যাই। আধ ঘন্টা পরে ব্রিগেডিয়ার মোশারফ আমার ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে আসেন। ইতিমধ্যে আমরা সেনা-নৌ-বিমান বাহিনী প্রধান, পুলিশ, বি. ডি. আর প্রধান এবং রক্ষীবাহিনীর মেজর আবুল হাসানের আনুগত্য ঘোষণা রেডিওতে শুনি।

আমরা সারাদিন ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। সন্ধ্যার দিকে বঙ্গভবন হইতে প্রত্যাবর্তনকারী অফিসারদের কাছ হইতে জানিতে পারি যে মেজর রশীদ, মেজর ফারুক ও খন্দকার মোশতাকের চক্রান্তে এবং নেতৃত্বে মেজর ডালিম, মেজর নুর, মেজর শাহরিয়ার, মেজর শরিফুল হোসেন, মেজর মহিউদ্দিন (আর্টিলারি), মেজর মুহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর রাশেদ চৌধুরী, মেজর পাশা, মেজর হুদা, রিসালদার সারোয়ার, রিসালদার মোসলেম এদের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে তাহার পরিবারসহ অন্যান্য এবং সেরনিয়াবাতের বাড়িতে আক্রমণ করিয়া পরিবারসহ তাহাকে ও অন্যান্য, শেখ মনির বাড়িতে আক্রমন করিয়া স্ত্রীসহ তাহাকে হত্যা করে এবং অবৈধভাবে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

আরো জানিতে পারি যে, ১৫ই আগস্ট ভোর বেলা চাকুরিচ্যুত মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায় কতিপয় সশস্ত্র সেনাসহ জিপের উপর হেভী মেশিনগান ফিট করিয়া সেনা হেড কোয়ার্টারে প্রবেশ করিয়া জোরপূর্বক সেনা প্রধান জেনারেল শফিউল্লাকে ১ম বেঙ্গল ইউনিট অফিসে লইয়া আসে।

আরো জানিতে পারি যে, মেজর মহিউদ্দিন (আর্টিলারি) বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রমণের সময় কয়েকটি ফিল্ড আর্টিলারির গোলা বর্ষণ করে। (আপত্তি সহকারে রেকর্ড করা হয়)। লক্ষ্যভ্রষ্ট ঐ গোলাগুলি মোহাম্মদপুর সিভিল এলাকায় পড়িয়া কয়েকজন সিভিলিয়ান হতাহত হয়।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আক্রমণকালে একতরফা গুলি বর্ষণের ফলে কর্ণেল জামিল এবং কর্তব্যরত কিছু সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হন।

আরো জানিতে পারি যে, চক্রান্তকারী ও ষড়যন্ত্রকারী অফিসাররা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহাদের সেনাদলসহ ১৪ই আগস্ট দিবাগত গভীর রাতে ১ম বেঙ্গল ল্যান্সারের ইউনিট লাইনে জমায়েত হয়। সেখানে মেজর ফারুক রহমান সকলকে ব্রীফিং দেয় এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া হত্যা অপারেশনে যায়।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আবুল বাশার বলেন, বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আসিয়া তাঁহাকে মৃত দেখিয়া পতাকা অর্ধনমিত করি নাই। ১৫ই আগস্ট সকাল ৬/৬-৩০টার সময় টেলিফোনে গণভবনে যে ডিউটি ক্লার্কের সহিত আমার আলাপ হয় তাহার নাম জানি না। তারপরও একাধিকবার গণভবনের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কাহাকেও পাই নাই। ১৫ই আগস্ট সকালবেলা যতক্ষণ বাসায় ছিলাম ততক্ষণ মাঝে মাঝে রেডিওর ঘোষণা শুনিয়াছি।

১৫ই আগস্ট সকালে সেনা বাহিনী প্রধান শফিউল্লাহ, নেভী প্রধান এম. এইচ. খান বিমান বাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার, বি. ডি. আর. প্রধান মেজর খলিলুর রহমান, রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান এবং আই. জি. পি. রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার ঘোষণা সকালবেলা রেডিওতে শুনিয়াছি। ঐ দিন সকাল বেলা হইতে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তৎপূর্বে তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের আনুগত্য প্রকাশ অনুষ্ঠান সকাল ১০টায় হইয়াছে কিনা স্মরণ নাই।

শহর জুড়ে রেডিওর ঘোষণা মানুষের কাছে খবরের একটি তরঙ্গ। মানুষ রেডিওর খবরে স্তম্ভিত হয়েছে, শঙ্কিত হয়েছে, মর্মাহত হয়েছে– অনিশ্চয়তার দোলাচলে পড়েছে। ঘরে ঘরে রেডিও খোলা, দোকানে রেডিও খোলা, রাস্তায় ছোট ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে তরঙ্গের প্রচার শুনছে মানুষ। কিন্তু সেদিনের রেডিওর প্রচারে নেপথ্যের কথা তো আসে না। এই অন্তরালের কথা উঠে আসে সাক্ষীর জবানবন্দিতে।

৪৩.

সাক্ষী প্রণব চন্দ্র রায়ের জবানবন্দি :

38. Pronob Chandra Roy.
P. W. -38

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৫২ বয়স্ক প্রণব চন্দ্র রায় এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি প্রণব চন্দ্র রায় সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ১০/১১ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম– প্রণব চন্দ্র রায়, বয়স– ৫২ বছর। আমার পিতার নাম– মৃত প্রথম চন্দ্র রায়, আমার বাসস্থান সাং ও থানা– নবীনগর, জেলা– ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বর্তমান ঠিকানা- ২৮ শ্রী শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

আমি বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের প্রধান কার্যালয় শেরে বাংলা নগরস্থ অফিসে উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী পদে কর্মরত আছি। আমি ১৯৬৬ সনে তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তানের সাভারস্থ উচ্চ শক্তি প্রেরণ কেন্দ্রে টেকনিক্যাল অপারেটর পদে যোগদান করি। ১৯৭৫ সনে শাহবাগস্থ প্রচার ভবনে বেতার প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত ছিলাম। এই প্রচার ভবনে ৬টি স্টুডিও ও ৪টি বুথ আছে। বুথগুলি স্টুডিও কন্ট্রোল করে। স্টুডিওতে বসিয়া ভাষণ প্রচার করা হয়। ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগষ্ট দিবাগত রাত্র ১২টা হইতে ১৫ই আগস্ট ভোর ৬টা পর্যন্ত শিফটিং চার্জ হিসাবে ডিউটিতে ছিলাম। আমার সাথে মোহাম্মদ আলী নামে একজন টেকনিক্যাল অপারেটর, আনোয়ার হোসেন নামে একজন মেকানিক ছিল। আরো একজন ছিল যাহার নাম এখন মনে নাই। ১৪ই আগস্ট দিবাগত রাত্র অনুমান ২টার সময় External Service-এর অনুষ্ঠান শেষ হইবার পর আমি আমার শিফট ইনচার্জের কক্ষে বিশ্রাম নিতেছিলাম। আনুমানিক রাত্র ৪-৩০ টায় রেডিও অফিসের বাহিরে গোলাগুলির শব্দে আমি ঘুম হইতে জাগিয়া উঠি। ১৫ই আগস্ট আনুমানিক ভোর পৌনে ৬টায় সেনাবাহিনীর বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য অস্ত্রশস্ত্রসহ রেডিও অফিসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং রেডিও অফিসের ভিতরে অবস্থিত পুলিশ ব্যারাকের পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে অস্ত্রশস্ত্র উঁচাইয়া ধরিয়া আত্মসমর্পণ করায় যাহা আমার কক্ষের জানালা দিয়া দেখিতে পাই। আনুমানিক ২/৩ মিনিট পর সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার ও জোয়ান অস্ত্রশস্ত্র উঁচাইয়া এফ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম, ট্রান্সমিটারের কক্ষের মধ্য দিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করে। তাহাদের মধ্যে একজন নিজেকে মেজর ডালিম বলিয়া পরিচয় দিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন, শিফট ইনচার্জ কে? তখন আমি নিজেকে শিফট ইনচার্জ বলিয়া পরিচয় দিলে মেজর ডালিম অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় অস্ত্র উঁচাইয়া ধরিয়া আমাকে বলে, Sheikh Mujib and all his gang has been killed and army has taken power মেজর ডালিম আরো বলিলেন, আমরা এখন বেতারে ঘোষণা দিব। সব কিছু অন করিয়া দেন।

তখন আমি ভয়ে আমার সহকর্মীদের সহায়তায় সব যন্ত্রপাতি অন করিয়া দেই। তখন তিনি কাগজে একটি ঘোষণা লেখেন এবং মেজর ডালিমের হাতে রক্ষিত একটি রেডিও রিসিভার দেখাইয়া আমাকে বলেন, এখন বেতারে আমি একটি ঘোষণা দিব যদি এই ঘোষণা রেডিওতে শোনা না যায় তবে তোমাদেরকে শেষ করিয়া দিব।

তখন আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলি যে, রেডিওর কল্যাণপুরস্থ ট্রান্সমিটার অন না করিলে ঘোষণা শোনা যাইবে না। তখন মেজর ডালিম বলিলেন, তবে কি করিতে হইবে? উত্তরে আমি বলি, কল্যাণপুরের শিফটিং চার্জ দ্বারা ট্রান্সমিটার অন করাইলে ঘোষণা শোনা যাইবে। তখন মেজর ডালিম আমাকে কল্যাণপুরে টেলিফোন করার নির্দেশ দেন। নির্দেশের ভয়ে বেতারের কোথাকার টেলিফোন লাইনে কল্যাণপুর কেন্দ্রের শিফটিং চার্জ আবদুল লতিফের সাথে যোগাযোগ করি এবং তাহাকে বলি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা আমার সামনে আছে। আপনি ট্রান্সমিটার অন করিয়া দেন। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই এবং আমি পাগল হইয়াছি কিনা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমাদের কথোপকথন বুঝিতে পারিয়া মেজর ডালিম আমার হাত হইতে টেলিফোন রিসিভারটি কাড়িয়া লইয়া কল্যাণপুর কেন্দ্রের শিফটিং চার্জ আবদুল লতিফকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। এর কিছুক্ষণ পর লতিফ ট্রান্সমিটার অন করিয়া দেন। তখন মেজর ডালিম যতদূর মনে পড়ে এই মর্মে ঘোষণা দেন, আমি মেজর ডালিম বলছি। স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে। খন্দকার মোশতাক আহামদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে। কারফিউ জারি করা হইয়াছে।

কিছুক্ষণ পর পর তিনি এই ঘোষণা বেতারে প্রচার করিতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পরে মেজর ডালিম বলেন, কমার্শিয়াল বৈদ্যুতিক লাইন চলিয়া গেলে আপনাদের নিজস্ব জেনারেটরে অনুষ্ঠান চালানো যাইবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা। তখন আমি বলি, আমাদের জেনারেটর আছে কিন্তু ব্যাটারি খারাপ তাই চালানো যাইবে না।

তখন মেজর ডালিম আমাকে স্টুডিওর বাহিরে আঙ্গিনায় লইয়া যান। আঙ্গিনায় সম্ভবত একজন সুবেদারকে বলেন, রক্ষী বাহিনীর ট্রাক হইতে উনাকে একটি ব্যাটারি খুলিয়া দেন। তখন ঐ সুবেদার রেডিও অফিসের গেইটের বাহিরে দাঁড়ানো ২টি রক্ষী বাহিনীর ট্রাকের মধ্যে একটি ট্রাক হইতে একটি ব্যাটারি খুলিয়া দেন। ইহার পর আমরা একজন মেকানিক দ্বারা ঐ ব্যাটারিটি জেনারেটরে সংস্থাপন করি। ব্যাটারিটি সংস্থাপনকালে জেনারেটর রুম হইতে দেখিতে পাই রক্ষী বাহিনীর সদস্যদেরকে সেনাবাহিনীর লোকেরা নিরস্ত্র করাইয়া পুলিশ ব্যারাকের সামনের মাঠে বসাইয়া রাখে।

১৫ই আগস্ট আনুমানিক ভোর ৭টায় খন্দকার মোশতাক সাহেব বেতার ভবনে আসেন। কিছুক্ষণ পর তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেবকে খন্দকার মোশতাক সাহেবের পাশে বসিয়া খন্দকার মোশতাক সাহেবের ভাষণ লিখিয়া দিতে দেখি। আনুমানিক সকাল ৮টায় তাহের উদ্দিন ঠাকুর কর্তৃক লিখিত এবং খন্দকার মোশতাক আহামদ সাহেবের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত ভাষণটি বেতারে প্রচার করা হয়। ঘন্টাখানেক পরে তিন বাহিনীর প্রধান, বি. ডি. আর প্রধান, পুলিশের আই. জি. পি., রক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ এদেরকে ২নং স্টুডিওতে খন্দকার মোশতাক আহামদের সাথে কথাবার্তা বলিতে দেখি। ইহার পর পরই তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেব আনুগত্যের ভাষণ লিখিয়া দেন। এই আনুগত্যের ভাষণটি তিন বাহিনী প্রধান যথা মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, রিয়ার এডমিরাল এম. এইচ. খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার ও বি. ডি. আর. প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, পুলিশ প্রধান নুরুল ইসলাম এবং রক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান-এর স্ব-স্ব কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয় এবং পর্যায়ক্রমে এই ভাষণ বেতারে প্রচার করা হয়।

আনুমানিক সকাল ১০টায় মেজর শাহরিয়ারের কাছ হইতে অনুমতি নিয়া আমি আমার বাসায় চলিয়া যাই। ১৪ই আগস্ট রাত্র ১০টায় রিয়াজুল হক হইতে আমি শিফটের চার্জ বুঝিয়া লই। যাইবার সময় রিয়াজুল হককে শিফটের চার্জ দিয়া যাই। তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং মেজর শাহরিয়ার সাহেব এখন কাঠগড়ায় আছেন। (সঠিকভাবে সনাক্ত)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

XXD. লেঃ কর্ণেল রশিদের পক্ষে জেরা ঃ–

তখন রেডিও বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দায়িত্বে আমি ছিলাম। সকাল ৬টা বাজার ১০ মিনিট আগে আমাকে কন্ট্রোল রুমে লইয়া আসে। অনুমান ৭টার কয়েক মিনিট আগে পর্যন্ত কন্ট্রোল রুমে ছিলাম। তখন মোহাম্মদ আলী, আনোয়ার হোসেন ও আরো একজন আমার সাথে ছিল। অর্থাৎ আমরা চারজনই কন্ট্রোল রুমে ছিলাম।

XXD.

১। মেজর হুদা, ২। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল নূর, ৩। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আজিজ পাশা, ৪। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রাশেদ চৌধুরী, ৫। মেজর এ, কে, এম, মহিউদ্দিন, ৬। রিসলদার মোসলেম উদ্দিন, ৭। মেজর আহামদ শরিফুল হোসেন, ৮। ক্যাপ্টেন কিসমত হাশেম, ৯। ক্যাপ্টেন মাজেদ, ১০। ক্যাপ্টেন নাজমুল হোসেন আনসার ১১। দফাদার মারফত আলী ১২। এ. ডি. আবুল হাশেম মৃধা- এর পক্ষে জেরা ঃ–

ডিক্লাইন্ড।

চলিবে

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট

১০-১১-৯৭ ইং।

AMARBOI.COM

XXD. লেঃ কর্ণেল ডালিমের পক্ষে জেরা ঃ–

রেডিও স্টেশনের বাহিরে পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে ভোর ৪-৩০ - ৫টা পর্যন্ত গোলগুলির শব্দ শুনিয়াছি। রেডিও স্টেশনে যে সব পুলিশ পাহারায় ছিল তাহারা আর্মি এবং রক্ষী বাহিনীর প্রতি কোনো গুলি ছোঁড়ে নাই। শুধু পুলিশ সেখানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করিত। সাক্ষী দিবার জন্য ৪-১১-৯৭ তারিখে সমন পাই। আদালতে সাক্ষী দিবার জন্য ৫-১১-৯৭ তারিখ হইতে আসিতেছি। আদালতে আসিয়া আদালত সংলগ্ন কক্ষে অপেক্ষা করিতে থাকি। ঘটনার রাত্রে শিফট ইনচার্জ হিসাবে সবগুলি স্টুডিও ও বুথে আমি ডিউটি করি। কথিক মেজর পরিচয় দানকারী মেজর ডালিম আমার পূর্ব পরিচিত ছিল না। তাহার পরিচয় যাচাই করার কোনো অবকাশ আমার ছিল না। রেডিও স্টেশনে সংবাদ প্রস্তুত করিয়া দিবার লোক থাকে। ঐ দিন আমি সেই রকম কোনো লোক দেখি নাই। ১৫ই আগস্ট সকাল ৭টার সময় খবর পাঠক সরকার কবির উদ্দিন মেজর ডালিমের নির্দেশে ৫ মিনিট exterior খবর পাঠ করেন।

ইহা সত্য নহে যে, ১৫ই আগস্ট ভোরে কেহ আমাকে মেজর ডালিম বলিয়া পরিচয় দেয় নাই বা মেজর ডালিম এবং তাহার সঙ্গীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র উঁচু করিয়া শিফট ইনচার্জকে তাহা বলে নাই বা মেজর ডালিম এই কথাও বলেন নাই যে, Sheikh Mujib and all his gang killed বা তিনি এই কথাও বলেন নাই আমরা ঘোষণা দিব, ট্রান্সমিশন অন করিয়া দেন বা মেজর ডালিম আমার কথিত মতে কোনো ঘোষণা দেন নাই বা ঘোষণা প্রচার না হইলে তোমাদেরকে শেষ করিয়া দিব এই কথা বলেন নাই বা তিনি শাহাবাগস্থ প্রচার ভবনে যান নাই বা কোন প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই বা কোন প্রকার যোঘণা দেন নাই বা আমি সত্য গোপন করিয়া বাদী পক্ষের কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

XXD. লেঃ কর্ণেল শাহরিয়ার রশিদের পক্ষে জেরা ঃ-

রেডিও স্টেশনের সংলগ্ন উত্তরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল (বর্তমানে শেরাটন) হোটেল। সেই সময় ইহাই ছিল একমাত্র আন্তর্জাতিক মানের হোটেল। বিদেশী সাংবাদিকসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশে আসিলে ঐ হোটেলে অবস্থান করিত কিনা আমি জানি না। রেডিও স্টেশনের আধা মাইল উত্তরে রমনা থানা। হাতিরপুলে তৎকালে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল। ঢাকা পি. জি. হাসপাতালের পিছনেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র। গোলাগুলির শব্দ শুনিয়া আমি কোথায়ও যোগাযোগ করি নাই। প্রায় আধা ঘন্টা থামিয়া থামিয়া গোলাগুলি হয়। তখন রেডিও স্টেশনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় নাই। রেডিও স্টেশনে গোলগুলি হয় নাই। রেডিও স্টেশনে তৎকালে কন্ট্রোলরুমে ২টা টেলিফোন ছিল। বিভিন্ন কর্মকর্তাদের রুমে আরো অনেক টেলিফোন ছিল। তখন ঐ সব রুম বন্ধ ছিল। তখন চৌকিদার ছিল। কিন্তু চৌকিদারের কাছে রুমের চাবি থাকিত কিনা বলিতে পরিব না। আর্মির লোকজন দেখিয়া পুলিশ সাথে সাথে অস্ত্র ফেলিয়া হাত উঁচাইয়া সারেন্ডার করে। গতকাল রিয়াজুল হক আদালতে সাক্ষ্য দেয়। তখন আমি আদালতে সাক্ষ্য দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঐ সময় রেডিও স্টেশনে একটা ছোট ক্যান্টিন ছিল। ১৫ই আগস্টের পরের দিন আমি যথারীতি ডিউটি করি এবং আমার ডিউটি অব্যাহত থাকে।

খালেদ মোশাররফ সাহেবকে রেডিও স্টেশনে খন্দকার মোশতাক সাহেবের সাথে কথা বলিতে দেখিয়াছি। তিনি তখন C. G. A ছিলেন কিনা জানি না। রেডিও স্টেশনের ২/৩ টা বাড়ি পরেই ঢাকা ক্লাব। তারপরেই বাসার বিপরীতে পুলিশ কন্ট্রোল রুম। তখন পুলিশ কন্ট্রোল রুম হইতেও কেহ রেডিও স্টেশনে আসে নাই। ১৯-১০-৯৬ তারিখে আমি তদন্তকারী অফিসারের নিকট জবানবন্দি দেই। রেডিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের অন্যান্য সাক্ষীদের আগে অর্থাৎ প্রথম আমি তদন্তকারী অফিসারের কাছে জবানবন্দি দেই কিনা জানি না।

আমার জবানবন্দি দিতে ১/১-৩০ ঘন্টা সময় লাগে। আমার জবানবন্দি কাহার সাহেবের কাছে দেই। অন্য একজন ইন্সপেক্টর আমার জবানবন্দি লিখেন। আমার জবানবন্দিতে মেজর শাহরিয়ারকে ১৫ই আগস্ট কোন পর্যায়ে রেডিও স্টেশনে দেখার কথা তদন্তকারী অফিসারকে না বলা সত্য নহে। মেজর শাহরিয়ারের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া বাসায় যাই, এই কথা তদন্তকারী অফিসারকে না বলা সত্য নহে। ইহা সত্য নহে যে, কাহারো শেখানো মতে মেজর শাহরিয়ারকে কাঠগড়ায় সনাক্ত করিয়াছি।

XXD. অনারারি ক্যাপ্টেন জোয়ারদারের পক্ষে জেরা:– ডিক্লাইন্ড

XXD. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ফারুক রহমানের পক্ষে জেরা ঃ–

রেডিও স্টেশনের স্টুডিও কন্ট্রোল রুম ও বুথগুলি Sound Proof. প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কন্ট্রোল রুম, স্টুডিও বুথের মধ্যে হইয়া থাকে। বাদ বাকী রুমগুলি Sound Proof-এর বাহিরে। শিফট ইনচার্জ হিসাবে তদারকির জন্য ট্রান্সমিশনের সময় আমি Sound Proof এলাকায় থাকি। নন ট্রান্সমিশনের সময় আমি বাহিরে শিফটিং চার্জের কক্ষে যাই। ট্রান্সমিশনের সময় কমার্শিয়াল বৈদ্যুতিক লাইন চলিয়া গেলে Sound Proof এলাকার বাহিরে জেনারেটর চালু করার জন্য আমাকে জেনারেটর রুমে যাইতে হয়। তখন জেনারেটর চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রচার বন্ধ থাকে। ১৫ই আগস্ট কখনও বিদ্যুৎ বন্ধ হয় নাই। শিফট ইনচার্জের রুম Sound area-র বাহিরে। শিফট ইনচার্জের রুম কন্ট্রোল রুমের মধ্যে নহে। ১৫ই আগস্ট মেজর ডালিমের নির্দেশে আমি ট্রান্সমিশন চালু করি। তাহার নির্দেশের উৎস কোথায় তাহা জানার অবকাশ আমার ছিল না। ভারত হইতে এই ঘটনার কোন শোকবার্তা আসে কিনা তাহা আমার জানা নাই। ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশে বেতারের ট্রান্সমিশন বন্ধ ছিল না। ১৫ই আগস্ট পূর্ব নির্ধারিত সিডিউল প্রোগাম প্রচার হয় নাই। পূর্বে নির্ধারিত সিডিউল প্রোগ্রাম অনেক সময় পরিবর্তন হইতে পারে।

১৫ই আগস্ট বাহিরে রক্ষী বাহিনীর ট্রাক হইতে ব্যাটারি আনার সময় বাদ বাকী ট্রান্সমিশন চালু থাকা আবস্থায় আমি সব সময় Sound Proof-এর মধ্যে ছিলাম। ঐ দিন আমি সামরিক শাসনের আওতায় কাজ করি নাই। ঐ দিন ট্রান্সমিশনে মেজর ডালিমের ঘোষণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার বিষয় প্রচার হইয়াছে। এই ট্রান্সমিশন চালুর মধ্যে আমি ছিলাম।

XXD. লেঃ কর্ণেল মুহিউদ্দিনের পক্ষে জেরা :– ডিক্লাইন্ড

XXD. তাহের উদ্দিন ঠাকুরের পক্ষে জেরা :–

১৪ই আগস্ট আমার বাসা ছিল ২৮ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার। আমি বি.এস.সি পাস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের একজন কর্মী ছিলাম। ১৫ই আগস্ট আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আশফাকুর রহমান। ১৫ই আগস্টের পরেও তাহারা উক্ত পদে বহাল ছিল। আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ট্রান্সমিশন অন করা হয়। আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রোগ্রাম প্রডিউসার থাকে। ঘোষক/ ঘোষিকাকে ফিট করার জন্য নির্ধারিত লোক থাকে। তাহাদের আলাদা আলাদা ডেস্ক থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইথারে যাহা যাইবে তাহা আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত থাকে। তবে সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে বার্তা সম্পাদকের অনুমোদন থাকে। সম্প্রচারিত অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আমরা সংশি-ষ্ট নই। সম্প্রচারিত হইবার পর স্ক্রিপ্ট/ড্রাফট ইত্যাদি সংরক্ষণের দায়িত্ব আমাদের নয়।

স্পীকার মাইক্রোফোনে কণ্ঠ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইথারে প্রচারিত হইলে ইহাকে Live programme বলা হয়। ইহা স্টুডিও হইতে করা হয়। পূর্বে ধারণকৃত কোন অনুষ্ঠানও প্রচার করা হয়। এইগুলি প্রোগ্রাম বিভাগ হইতে আমাদের কাছে আসে। সম্প্রচারিত বিষয়াদির মেটেরিয়াল সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কতদিন সংরক্ষণ করা হয় তাহা প্রোগাম বিভাগে থাকে। সিডিউলে পরিবর্তিত প্রোগ্রামের রেকর্ড রাখা হয় কি না তাহা আমি জানি না। এটা প্রোগ্রাম বিভাগ বলিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে আমরা রেকর্ড মেইনটেইন করি না। প্রচারিত বিষয়গুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। স্পীকারের যে কণ্ঠ সরাসরি ইথারে দেওয়া হয় সেইগুলি সব সময় টেপ করা হয় না। কোনগুলি টেপ করা হইবে তাহা আঞ্চলিক পরিচালক বা তা কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি সিদ্ধান্ত দিয়া থাকে। টেপ হইবার পর কি হইবে তাহা অনুষ্ঠান বিভাগের ব্যাপার। আমি জানি না। আমার সামনে এখন কোনো লিখিত কাগজ বা টেপ নাই। আমাদের ট্রান্সমিটিং মেশিনে টাইম ইনডিকেটার নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ব্যক্তিগত ডাইরি মেইনটেইন করি না। ১৫ আগস্টের বেতারের কার্যক্রম সম্পর্কে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করি নাই। ১৫ই আগস্ট ভোর হইতে আমি বেতার ভবনে থাকাকালীন আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ফোন করি নাই। সেই দিন আমার উর্ধ্বতন কোনো কর্তৃপক্ষকে বেতার ভবনে দেখি নাই। তখন বেতার ভবন সম্ভবত তিন তলা ছিল। আমাদের বহু সংখ্যক স্টাফ আছে। আমাদের প্রকৌশলী বিভাগে ট্রান্সপোর্ট পুল ছিল। গাড়িতে লগবুক থাকে। বেতারে তখন তিনটা অধিবেশন ছিল। শিফট ইনচার্জের জন্য একটা স্বতন্ত্র রুম আছে। বেতার ভবনের সর্ব পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় শিফট ইনচার্জের রুম। এই রুম হইতে অফিস দেখা যায় না। এই রুম হইতে বুথে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই।

সম্প্রচারের মেশিনারি বুথ থাকে। যন্ত্র ছাড়া এক রুম হইতে অন্য রুমে শব্দ শোনা যায় না। ১৫ই আগস্ট সকালে কিছু Live programme হয়। পরে কিছু programme টেপ করে সম্প্রচার করা হয়। ঘটনার ২১ বৎসর পরে তদন্তকারী অফিসারের কাছে জবানবন্দি দিয়াছি এবং এই জবানবন্দির সমর্থনে তদন্তকারী অফিসারের কাছে কোন কাগজপত্র দেই নাই। আজ হইতে ১ বৎসর আগে তদন্তকারী অফিসারের কাছে জবানবন্দি দিয়াছি। ঐ জবানবন্দির সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা আছে। ইহার পর পরই তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেব আনুগত্যের ভাষণ লিখিয়া দেন। এই আনুগত্যের ভাষণটি তিন বাহিনী প্রধান যথা মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, নৌবাহিনীর এডমিরাল এম. এইচ. খান, এয়ার ভাইস মার্শাল এ. কে. খন্দকার ও বি. ডি. আর. প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান, পুলিশ প্রধান নুরুল ইসলাম এবং রক্ষী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত প্রধান-এর স্ব-স্ব কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয় এবং পর্যায়ক্রমে এই ভাষণ বেতারে প্রচার করা হয়। এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারের নিকট না বলা সত্য নহে।

"কিছুক্ষণ পরে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেবকে খন্দকার মোশতাক সাহেবের পাশে বসিয়া খন্দকার মোশতাক সাহেবের ভাষণ লিখিয়া দিতে দেখি।" এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারের কাছে না বলা সত্য নহে।

"তাহের উদ্দিন ঠাকুর কর্তৃক লিখিত এবং খন্দকার মোশতাক আহামদ সাহেবের কণ্ঠে রেকর্ডকৃত ভাষণটি বেতারে প্রচার করা হয়" এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকের না বলা ঠিক নহে।

তদন্তকারী অফিসারের কাছে জবানবন্দি দিবার সময় কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসঙ্গে রিয়াজুল হকের নাম উচ্চারণ করিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

"১৫ তারিখ সকাল আনুমানিক ১০টায় মেজর শাহারিয়ারের কাছ হইতে অনুমতি লইয়া আমি আমার বাসায় চলিয়া যাই। যাইবার সময় রিয়াজুল হককে শিফটের চার্জ দিয়া যাই। ১৪ই আগস্ট রাত্র ১০টায় রিয়াজুল হক হইতে আমি শিফটের চার্জ বুঝিয়া নেই।" এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই। ১৪/১৫ তারিখের ডিউটি রোস্টার ও হাজিরা খাতা পুলিশকে দিই নাই। ঘন্টাখানেক পরে বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানসহ জিয়াউর রহমান ও খালেদ মোশারফকে খন্দকার মোশতাকের সাথে কথাবার্তা বলিতে দেখি– এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে না বলা ঠিক নহে।

১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রি ১০টা, ১৫ তারিখ ভোর ৬টা পর্যন্ত ডিউটিতে ছিলাম এই কথা তদন্তকারী অফিসারকে না বলা ঠিক নহে।

বুথগুলি স্টুডিও কন্ট্রোল করে– এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

"আমি পাগল হইয়াছি কিনা লতিফ আমাকে জিজ্ঞাসা করে" এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

"আমি মেজর ডালিম বলছি" বা ঐ সময় "কারফিউ জারী করা হইয়াছে" এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই। ব্যাটারি সংস্থাপনকারী জেনারেটর রুম হইতে রক্ষী বাহিনীর নিরস্ত্র করিতে দেখিয়াছি এই কথাগুলি তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি।

সেনাবাহিনী প্রধানের সহিত খন্দকার মোশতাক সাহেবেকে কথা–বার্তা বলিতে দেখিয়াছি। ঐ কথা বার্তায় খন্দকার মোশতাক সাহেব বলেন, "Congratulation Shafiullah, your troops have done an excellent job; Now do the rest; Shafiullah says- What rest; Mustaque says- You should know it better. Shafiullah said- Leave it to me."

এই কথোপকথন তারা করিয়াছেন কিনা আমি ২নং বুথ হইতে শুনিতে পাই নাই, কারণ তখন মাইক্রোফোন বন্ধ ছিল।

বেতার ভবনের স্টুডিওতে তখন সকল সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদেরকে নিজ নিজ ইউনিফরম পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। আনুগত্যের ঘোষণা ছাড়া ঐ দিন সেনা প্রধানগণ বেতারে আর কোনো ঘোষণা দেন নাই। সেই দিনের কাহারো কোনো ভাষণ এখন আমার কাছে নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহা সত্য নহে যে, সেনাবাহিনীর প্রধানগণ তাহাদের অফিসারদেরকে সাথে আনিয়া বেতার নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাহাদের আদেশ নির্দেশ মোতাবেক আমরা নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করি।

ইহা সত্য নহে যে, ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশ বেতারের দখল ও কর্তৃত্ব বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী প্রধানদের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে তাহাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আদেশ নির্দেশ, তাহাদের উপস্থিতিতে ও তাহাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে সকল কার্যক্রম জাতির উদ্দেশ্যে সম্প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহা সত্য নহে যে, মোশতাক সাহেবের কোনো ভাষণ তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে লিখিতে দেখি নাই বা ঐ লিখিত ভাষণ প্রচার করিতে দেখি নাই বা সশস্ত্র বাহিনীর নির্দেশে সাজোয়া বাহিনী পাঠাইয়া বেতারের সাথে সংশি-ষ্ট থাকার কারণে তাহের উদ্দিন ঠাকুরকে জোর করিয়া অবস্থার শিকার বানাইয়া বেতার ভবনে আনিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে প্রদত্ত হুকুমাদি তামিল করিতে বাধ্য করেন বা আমি একজন বানানো সাক্ষী।

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
১১-১১-৯৭

সাক্ষীর জবানবন্দি ও জেরা তাহাকে পাঠ করিয়া শুনাইলে পর তিনি উহা সঠিক ও শুদ্ধ স্বীকার করেন।

স্বাক্ষর-অস্পষ্ট
দায়রা জজ
ঢাকা।

৪৪.

সাক্ষী মোঃ রিয়াজুল হকের জবানবন্দী :

37. Md. Reajul Haque.
P. W. -37
জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।
সূত্র : ধানমণ্ডি থানা : মা: নং ১০(১০)/৯৬

আন্দাজি– ৫৪ বয়স্ক রিয়াজুল হক-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৯ সালের ..... তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম: মোঃ রিয়াজুল হক, বয়স ৫৪ বছর, আমার পিতার নাম: মৃত আব্দুল গফুর, গ্রাম: নৌকাঘাটা, থানা: শিবপুর, জেলা: নরসিংদী।

বর্তমান ঠিকানা– ৭/২০ বেইলি স্কয়ার, অফিসার্স কলোনি, ঢাকা।

আমি বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার স্টেশনে প্রকৌশলী হিসাবে কর্মরত আছি। আমি ৩০-৬-১৯৬৬ তারিখে রাওলপিন্ডি রেডিও পাকিস্তানে টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট হিসাবে চাকরিতে যোগদান করি।

১৯৭৫ সনে শাহাবাগস্থ বাংলাদেশ বেতার ভবনে রেডিও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করি।

ঐ সনের ১৫ই আগস্ট রোজ শুক্রবার সকাল ৬-২টা পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত ডিউটি রোস্টার অনুযায়ী আমি সরকারি গাড়িতে বাসা হইতে অফিসে রওনা দেই। ঐ গাড়িতে আমার সহযোগী টেকনিক্যাল এসিস্টেন্ট জনাব রেজাউল করিম, টেকনিক্যাল অপারেটর কাউসার জাহান এবং মেকানিক খান নবি ছিলেন।

আমরা ঐ যোগে যখন শাহাবাগস্থ বেতার ভবনের সামনে পৌঁছি তখন আর্মি সিপাহীরা আমাদেরকে যাইতে বাধা দেয়। একজন সিপাহী আমাদের কাছে আসিবার পর আমরা পরিচয় দিলে আমাদেরকে গাড়ি হইতে নামাইয়া নিয়া ভিতরে কন্ট্রোল রুমে বসাইয়া রাখে। তখন সময় অনুমান ৬/৬-৩০ টা হইবে।

কিছুক্ষণ পরে রেডিও স্পীকারে শুনিতে পাই– আমি মেজর ডালিম বলছি, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে, আর্মি ক্ষমতা দখল করিয়াছে এবং কারফিউ জারি করা হইয়াছে।

আমরা চারজন বসা অবস্থায় কিছুক্ষণ পর বাহির হইতে একটি টেলিফোন আসে। টেলিফোনটি আমি রিসিভ করি। অপর প্রান্ত হইতে বলিতেছে– আমি মেজর রশীদ বলছি মেজর ডালিমকে দাও। তখন কন্ট্রোল রুমে দাঁড়াইয়া থাকা একজন সিপাইকে আমি বলিলাম, মেজর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডালিমকে ডাকিয়া আনেন। ডালিম আসিয়া টেলিফোনে কথা বলেন। ডালিম টেলিফোনে বলিতেছেন, গোলাবারুদ পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইহার আনুমানিক সকাল ৭টার সময় একজন আর্মি সিপাই ১২০০ ফিটের ৭/৮ টেপ কন্ট্রোল রুমে নিয়া আসে এবং বলেন যে, ভাষণ রেকর্ড করা হইবে আপনারা চলেন। তখন আমরা ২নং বুথে যাই। সেখানে গিয়া দেখি পূর্বের শিফটের রেডিও ইঞ্জিনিয়ার প্রণব চন্দ্র রায়, টেকনিক্যাল অপারেটর জনাব মহাম্মদ আলী এবং মেকানিক আনোয়ারকে কর্মরত অবস্থায় দেখি।

পাশে ২নং স্টুডিওতে খন্দকার মোশতাক আহমদকে বসা দেখি। কিছুক্ষণ পর তাহের উদ্দিন ঠাকুর উক্ত স্টুডিওতে আসেন।

তখনও দেখিতে পাই মেজর ডালিম পূর্বের ন্যায় ঘোষণা দিতেছেন, শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে, আর্মি ক্ষমতা দখল করিয়াছে এবং কারফিউ জারি করা হইয়াছে।

এই ঘোষণা শোনার পর তাহের উদ্দিন ঠাকুর খন্দকার মোশতাক সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়া বলেন যে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে এই ঘোষণা দেয়া ঠিক হইবে না।

এরপর তাহের উদ্দিন ঠাকুর নিজ হাতে ঘোষণা লিখিয়া দেন যে, শেখ মুজিব এবং তাহার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করিয়া খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করিয়াছে এবং কারফিউ জারি করা হইয়াছে।

উনার লিখিত ভাষণটি মেজর ডালিমের কণ্ঠ ব্যবহার করা হয় এবং রেকর্ড করা হয় ও প্রচার করা হয়।

তখন পূর্বের শিফটের লোকসহ আমরা যৌথভাবে কাজ করিতে থাকি।

এই সময় ২নং স্টুডিওতে খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার খন্দকার মোশতাকের ভাষণ প্রচারের জন্য ভাষণ প্রস্তুত করেন যাহা তাহের উদ্দিন ঠাকুর নিজ হাতে প্রস্তুত করেন।

অনুমান সকাল ৮টার সময় তাহের উদ্দিন ঠাকুর কর্তৃক লিখিত ভাষণটি খন্দকার মোশতাকের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয় এবং রেডিওতে সাথে সাথে প্রচার করা হয়।

খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, আমাদেরকে খন্দকার মোস্তাক সাহেবের ভাষণ প্রচার করার নির্দেশ দিলেন। নির্দেশমত ভাষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারের পর তাহাদের পছন্দ অনুযায়ী নজরুলগীতি প্রচার করি। এইভাবে আনুমানিক একঘন্টা চলিতে থাকে।

আনুমানিক সকাল ৯টার সময় তিন বাহিনী প্রধান, বি. ডি. আর. প্রধান, পুলিশের আই. জি-কে নিয়া কয়েকজন আর্মি অফিসার মেজর রশীদ, মেজর ডালিম ২নং স্টুডিওতে নিয়া আসে।

তিন বাহিনী প্রধান, পুলিশের আই. জি, বি. ডি. আর প্রধানের আনুগত্য ভাষণ তাহের উদ্দিন ঠাকুর নিজ হাতে লিখেন।

ঐ লিখিত ভাষণগুলি তাহাদের নিজ নিজ কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে প্রচার করা হয়।

কিছুক্ষণ পর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, কর্ণেল তাহের, জেনারেল ওসমানী ২নং স্টুডিওতে আসেন।

তারপর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, কর্ণেল তাহের উদ্দিন ঠাকুর, খন্দকার মোশতাকের সাহিত আলাপ করিতে দেখি।

ঐ দিন বিকাল ৪টার সময় পরবর্তী শিফট আসার পর আমরা মেজর শাহরিয়ারের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া যাইবার পূর্বে ভাষণকৃত টেপগুলি বেলা ৩টার দিকে মেজর ডালিমকে বুঝাইয়া দেই। আমরা যাইবার সময় কেবল মেজর শাহরিয়ার কয়েকজন আর্মি সিপাইসহ রেডিও স্টেশনে ছিলেন।

৩/৪ দিন পর আমার কর্তব্য পালন অবস্থায় মেজর ডালিম আসিয়া বলেন, আমার ভাষণকৃত টেপটি জমা দাও নাই, টেপটি তাড়াতাড়ি না দিলে তোমাকে গুলি করিয়া মারিব। উত্তরে আমি বলি, সব টেপ আপনাকে বুঝাইয়া দিয়াছি এখন আমি কোথায় পাব আপনার টেপ।

তারপর আমার শিফটের রেজাউল করিমের সাথে যোগাযোগ করিলে সে জানায় ১৫ তারিখে সে একটি টেপ কন্ট্রোল রুমে পায় যাহা তাহার নিজস্ব ড্রয়ারে আছে। তখন আমি ড্রয়ার ভাঙ্গিয়া টেপটি বাহির করি এবং বাজাইয়া দেখি যে উহাই মেজর ডালিমের ভাষণকৃত টেপ। সাথে সাথে ঐ টেপ আঞ্চলিক পরিচালক জনাব আশফাকুর রহমানের কাছে জমা দেই।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ারসহ আরো ৪/৫ জন অফিসার বঙ্গবন্ধু ও তাহার পরিবারবর্গের নৃশংস হত্যাকান্ডের মৃতদেহের ফটো দেখাদেখি করিতে দেখি। তাহাদের দেখার সময় আমিও বঙ্গবন্ধুসহ তাহার পরিবারবর্গের মৃত দেহের ফটো দেখি (ডিফেন্সের আপত্তিতে উপরোক্ত দফা রেকর্ড করা হয়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেব আমাদের তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন।

তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং মেজর শাহরিয়ার এখন কাঠগড়ায় আছেন।

(সঠিকভাবে সনাক্ত)

চলিবে–

স্বাক্ষর– কে, জি, রসুল

৬-১১-৯৭

XXD. মেজর ডালিমের পক্ষে জেরা :–

রেডিও স্টেশনের সামনে প্রথম বাধা পাই। আর্মির লোকজন সশস্ত্র প্রহরায় প্রধান গেইট হইতে আমাদেরকে নিয়া কন্ট্রোল রুমে বসায়। ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত রেডিও স্টেশনে পুলিশকে পাহারা দিত। ১৫ই আগস্ট হইতে পুলিশকে আর্মিরা নিরস্ত্র করিয়া রাখে। রেডিও স্টেশনে আর্মি এবং আমার ৩জন সহকর্মী এক জায়গায় বসিয়াছিলাম। আমার অনুমান ৬.১৫-৭.৩০টা পর্যন্ত বসিয়াছিলাম।

ঘটনার দিন কন্ট্রোল রুমে বাহিরে আমাদেরকে আটক করিয়া রাখা হয়। সশস্ত্র পাহারায় কন্ট্রোল রুমে বসা ছিলাম।

আনুমানিক ৭টার পরে ২নং বুথে যাই। আর্মিদের নির্দেশে সেখানে যাই।

সামরিক বাহিনীতে তাহাদের নিজস্ব ওয়ারলেস/যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে কিনা জানি না। আমরা ২নং বুথে গিয়া সেইখানে আগের শিফটের লোকও দেখি।

ভাষণ রেকর্ডের কাজ পর্যায়ক্রমে হয়। অনুমান ৭.৩০ টায় প্রথম মেজর ডালিমের ঘোষণা রেকর্ড করি। অনুমান ৮টার সময় খন্দকার মোশতাক আহমদের ভাষণ রেকর্ড করা হয়।

রেডিও স্টেশনের ভিতর হইতে বাহিরের কর্মকান্ড দেখা যায় নাই। অনুমান ৯টার সময় তিন বাহিনীর প্রধানকে মেজর ডালিম নিয়া আসেন এই কথা তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই। ঘটনার দিন রেডিও স্টেশনের ভিতরে আর্মির গোলা বারুদ/অস্ত্র মজুদ ছিল কিনা জানি না।

তিন বাহিনী প্রধান/পুলিশের আই. জি. নিজ নিজ বাহিনীর পোশাক পরিহিত অবস্থায় রেডিও স্টেশনে আসে। ১৫ই আগস্ট রেডিও স্টেশনের কর্মচারীগণ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহা সত্য নহে যে আর্মির প্রহরায় আমি কন্ট্রোল রুমে বসা ছিলাম বিধায় তখন কোনো টেলিফোন রিসিভ করি নাই।

ইহা সত্য নহে যে ঘটনার দিন আর্মির একজন লোক ১২০০ শত ফিটের ৭/৮ টা টেপ নিয়া আসার কথা তদন্তকারী অফিসারকে বলি নাই।

ইহা সত্য নহে যে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হইয়াছে, আর্মি ক্ষমতা দখল করিয়াছে কারফিউ জারি হইয়াছে এই সব কথা আমি কন্ট্রোল রুমে থাকাবস্থায় শুনি নাই।

গোলা বারুদের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে, এই কথা মেজর ডালিম না বলা সত্য নহে।

ইহা সত্য নহে যে মেজর ডালিম আমার নিকট হইতে কোনো ভাষণকৃত টেপ বুঝিয়া নেন নাই বা ৩/৪ দিন পরে মেজর ডালিম রেডিও স্টেশনে গিয়া তাহার ভাষণকৃত টেপটি পায় নাই বলিয়া উহা ফেরৎ দেওয়ার জন্য বলে নাই বা টেপ ফেরৎ না দিলে গুলি করার কথা বলে নাই বা অক্টোবর মাসে মেজর ডালিমসহ শেখ মুজিবুর রহমান ও তাহার পরিবারের সদস্যদের মৃত দেহের ছবি দেখিতে যায় নাই বা তখন আমিও মৃত দেহের ছবি দেখি নাই।

ইহা সত্য নহে যে, মেজর ডালিম ১৫ই আগস্ট রেডিও স্টেশনে যান নাই বা আমিও তাহাকে দেখি নাই বা আমার চাকরি রক্ষার্থে রাষ্ট্রপক্ষের কথায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

AMARBOI.COM

XXD. লেফটেন্যান্ট কর্ণেল রশীদের পক্ষে জেরা :–

ঐ সময় কন্ট্রোল রুমে ২টা টেলিফোন ছিল। কন্ট্রোল রুমে আমাদের লোক সব সময় ডিউটিতে থাকিত। ঐ দিন গিয়া কাহাকেও দেখি নাই।

১৪ই আগস্ট তারিখ বিকাল ২টা হইতে রাত্র ১০টা পর্যন্ত ডিউটি করিয়াছি। তখন প্রণব চন্দ্র রায় কন্ট্রোল রুমে ডিউটি করে। রেডিও স্টেশনের প্রকৌশল সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব আমার ছিল।

কন্ট্রোল রুম ছাড়াও রেডিও স্টেশনে আরো অনেক টেলিফোন আছে।

আমি মেজর রশীদকে কখনও দেখি নাই, চিনিতামও না।

আমি মেজর রশীদ বলছি, এই মর্মে কোনো টেলিফোন আমি রিসিভ করার কথা তদন্তকারী অফিসারকে না বলা ঠিক নহে।

১৫ই আগস্ট আমি সব সময় ২নং বুথে ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহির হইতে যাহারা ২নং স্টুডিওতে আসে তাহাদেরকে দেখিয়াছি। অন্য জায়গায় যাহারা আসে তাহাদেরকে দেখি নাই।

তিন বাহিনীর প্রধান, পুলিশ প্রধান, বি. ডি. আর প্রধান এদের কাহাকেও আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনিতাম না।

সকাল ৯টার দিকে মেজর ডালিম ও মেজর রশীদ তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়া আসার কথা তদন্তকারী অফিসারকে বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

ইহা সত্য নহে যে, মেজর রশীদ কোনো টেলিফোন করেন নাই বা আমি ঐ টেলিফোন রিসিভ করি নাই বা তিনি ঐ দিন রেডিও স্টেশনে যান নাই বা এই মামলায় কর্ণেল রশীদকে জড়ানোর জন্য বাদীপক্ষের শিখানো মতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।

XXD. অনুপস্থিত অন্য সকল আসামীদের পক্ষে ষ্টেট ডিফেন্সের জেরা ঃ– Declined.

XXD. তাহের উদ্দিন ঠাকুরের পক্ষে জেরা :–

আমি ১৯৬৫ সন হইতে এখন পর্যন্ত একটানা সরকারি চাকুরিতে আছি। বাংলাদেশ বেতার একটি সরকারি প্রচার মাধ্যম। ইহা সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহার কর্মচারীগণ সরকারি কর্মচারি। ইহা তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

১৪ই আগস্ট '৭৫ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার প্রধান ছিলেন। তাহার একটি মন্ত্রী সভা ছিল। ঐ মন্ত্রী সভায় জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর সংসদ সদস্য হিসাবে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তাহাকে ব্যাক্তিগতভাবে জানিতাম। তিনি একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন।

১৫ই আগস্ট সরকারী প্রশাসন চালু ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক ছিল না।

১৪ই আগস্ট বাংলাদেশে সামরিক বাহিনী ছিল এবং তাহাদের প্রধানও ছিল। ১৪ই আগস্ট মেজর জেনারেল শাফিউল্লা, এম এইচ খান, এ. কে. খন্দকার যথাক্রমে আমি, নেভী ও বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন।

১৫ই আগস্ট তাহারা বাংলাদেশ বেতার ভবনে আসে এবং তাহাদের voice (আনুগত্য ভাষণ) বেতারে প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের নিজস্ব অর্গানোগ্রাম আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহবাগে ছিল বেতারের প্রচার ভবন। ইহার হেড অফিস ছিল ধানমন্ডি ২নং রোডে। ডাইরেক্টর জেনারেল ছিলেন বেতারের প্রধান। ঘটনার দিন আমিরুজ্জামান খান বেতারের ডি. জি. ছিলেন।

শাহবাগের প্রচার ভবনের প্রধান ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক আশফাকুর রহমান। তাহার অধীনে প্রকৌশলী, নিজস্ব প্রোগ্রম বিভাগ ছিল।

প্রকৌশলী বিভাগের প্রধান ছিলেন সৈয়দ আবদুর শাকুর, প্রোগ্রামের প্রধান ছিলেন আঞ্চলিক ডাইরেক্টর, নিজস্ব প্রধানের নাম জানা নাই।

ভাষণ প্রচারের বিষয়টি প্রোগ্রাম বিভাগের বিষয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভাষণ সিডিউলভুক্ত হইয়া থাকে এবং সিডিউল অনুযায়ী প্রচার হয়। এইগুলি রেজিষ্টারে রেকর্ড হয়। কিন্তু ভাষণের কথাগুলি রেজিষ্টারে রেকর্ড থাকে না। উহা টেপে থাকে। পরের দিন বেতার বাংলা হিসাবে মনিটরিং করা হয়।

আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।

তখন বেতার ভবন হইতে বাহিরে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল টেলিফোন। মিরপুর কল্যাণপুরে ছিল আমাদের ট্রান্সমিটিং সেন্টার।

১৫ই আগস্ট বেতারের প্রথম অধিবেশন সকাল ৬.৩০ টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। দ্বিতীয় অধিবেশন ছিল ১২টায় এবং তৃতীয় অধিবেশন ছিল ৪টায়। টেকনিক্যাল এবং নন-টেকনিক্যাল কর্মচারিদের শিফটিং ডিউটি এবং সময় ছিল না।

টেকনিক্যালদের জন্য ৬টা হইতে ২২টা, ২২টা– পরের দিন সকাল ৬টা পর্যন্ত মেইনটেন্যান্স কর্মচারিদের ডিউটি সকাল ৭-১৫ টা পর্যন্ত। নন-টেকনিক্যালের জন্য শিফট ডিউটি নাই। তবে প্রোগ্রাম মনিটরিং করার জন্য ২/১ জন ডিউটিতে থাকেন।

রাত্রে যাহারা ডিউটিতে থাকে তাহাদের জন্য রেডিও স্টেশনে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১৫ই আগস্ট '৭৫-এ আমার বাসা ছিল ফার্মগেইটের কাছে ইন্দিরা রোডে। ঐটা মেস ছিল। ইন্দিরা রোডে বেতারের আর কেহ থাকিত না। শাহবাগ অফিস হইতে গাড়ি আসিয়া আমাকে তুলিয়া নেয়। আমার সাথে ঘটনার দিন যাহারা ছিল তাহারা কোথায় থাকিত আমার জানা নাই। আমার আগে ২ জনকে গাড়িতে তোলা হয়। আমার পরে একজনকে আজিমপুর হইতে তোলা হয়। আমাকে আনুমানিক ৫-৩০ টায় গাড়িতে তোলা হয়। বেতারের ড্রাইভার গাড়ি চালাইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকাল পৌনে ৬টার দিকে বেতার ভবনের সামনে পৌঁছি।

রেডিও ভবনের দিকে রাস্তা পূর্বে রমনা পার্ক দক্ষিণে ডায়াবেটিক হাসপাতাল এবং উত্তরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল।

রেডিও ভবনে ঢোকার একটা এবং বাহির হওয়ার একটা মোট ২টা গেইট ছিল।

আমি রেডিও ভবনের সামনে গিয়া দেখি যে সব পুলিশ রেডিও স্টেশনের নিরাপত্তায় ছিল তাহারা তখন নাই। গেইটের সামনে গিয়া রক্ষী বাহিনীর ২টা ট্রাক দেখি। গেইটে রিসেপশনও থাকে। রেডিও ভবনের ভিতরে নীচ তলায় কন্ট্রোল রুম। রিসেপশন পার হইয়া কন্ট্রোল রুমে যাইতে হয়। কন্ট্রোল রুমে প্রকৌশলী বিভাগের কর্মচারিগণ থাকে। ঐদিন কন্ট্রোল রুমে প্রণব, মহাম্মদ আলী ও আনোয়ার থাকার কথা ছিল। কিন্তু আমি গিয়া তাহাদের পাই নাই। তাহাদের পরে আমি ২নং বুথে গিয়া পাইয়াছি।

আমি ২নং বুথে যাইবার আগেও এই ঘটনার বিষয় সম্পর্কে মেজর ডালিমের ঘোষণা হয় সেই ঘোষণা আমি কন্ট্রোল রুমে অবস্থানকালে স্পীকারে শুনিয়াছি। তার আগেও কোনো ঘোষণা হইয়াছে কিনা বলিতে পারিব না।

AMARBOI.COM

৪৫.

শেখ মুজিবকে হত্যা করার কথা রেডিও অনবরত প্রচার করে। নির্মমভাবে প্রচার করে হত্যার গৌরব নিতে চায়। স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা প্রচার করে নির্লজ্জভাবে। বলা যায় শিষ্টাচার বহির্ভূতভাবে। বলা যায় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে।

কিন্তু রেডিওতে প্রচার করা হয় না শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরে তার লাশ দাফনের কি ব্যবস্থা হবে। প্রকাশ করা হয় না আর কতজনকে হত্যা করা হয়েছে। রেডিও এখন প্রচার-যন্ত্র মাত্র। জনগণকে প্রকৃত খবর দেয়ার মাধ্যম নয়।

রেডিও নীরব হয়ে থাকে। একই বিষয় বারবার শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে যায় মানুষ। ভয় এবং আশঙ্কা কাবু করে রেখেছে ফজল মিয়াকে। নিজের ভেতরে গুমরাতে থাকে সে। বলে, আমি একজন কাঠের আড়তদার। মোহাম্মদপুর শেরশাহ রোডে আমার দোকান। ১৫ আগস্টের রাতের ঘটনা আমি সকালে রেডিওতে শুনি। মেজর ডালিমের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে বলে শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকি। হত্যার খবর শুনে আমার পরিবার কান্নাকাটি শুরু করে। আমি বলি, এখন কান্নাকাটি বন্ধ কর। আমাদের উপর বিপদ আসতে পারে। এখন বিপদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা-বাপ নাই। বলা যায় না কি হয়।

আমার পরিবার চোখ মুছতে মুছতে বলে, আমরা কি অপরাধ করেছি?

আমি ওকে বলি, এখন দেশ আর্মির হাতে। ওরা যা খুশি তা করতে পারবে। তোমার কোনো অপরাধের দরকার হবে না।

আমার পরিবার চোখ বড় বড় করে বলে, এটা আবার কেমন কথা? মানুষের ইচ্ছা করলেই যা খুশি তা করতে পারে? ইচ্ছা করলেই খুনখারাবি করতে পারে? তা আবার রেডিওতে ঘোষণা দিয়ে বলতে পারে?

আমি ওর কথার জবাব নেই না। জবাব দেবো কি? আমি তো এইসব কথার জবাব জানি না। আমি মূর্খ মানুষ। পড়ালেখা শিখি নাই। আমার তিন মাসের ছেলেটি কেঁদে উঠলে আমি তাড়াতাড়ি ওকে কোলে তুলে নেই। দু'হাতে দোলাতে দোলাতে বাবা-সোনা করি। ছেলের কান্না থামে না। নিজের ছেলের কান্না শুনে আমার ভীষণ ভয় করে। ভাবি, আমি কি ওর মুখ চেপে ধরব? নাকি ওকে বুকের মধ্যে চেপে রাখব? আমার পরিবার আজ তাড়াতাড়ি এসে ছেলেকে ধরে না। চুপ করে বসে থাকে। অন্যদিনতো ও ছেলেকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নেয়। এক লহমায় ছেলের কান্না থেমে যায়। আজ ও নড়ে না। কাছে আসে না। হাত বাড়ায় না। আমি ভাবি আমার পরিবার কি আজকে পাষাণ মা হয়ে গেল? আমি দেখতে পাই মাথার কাপড়ে ওর অর্ধেক মুখ ঢাকা। ওকে ঠিকমতো দেখতে পাই না। ওর চোখে পানি আছে কিনা বুঝতে পারি না। ছেলের কান্নাও থামে না। আমি ছেলেকে ওর কোলে দিয়ে বলি, ওকে দুধ দাও। ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে।

পরিবার ছেলেকে শাড়ির আঁচলের নিচে ঢাকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ছেলের কান্না থেমে যায়। আমি বুঝতে পারি সব শিশুই মায়ের কাছে থাকতে চায়। মা ছাড়া শিশুকে ওমভরা আদর দেবে কে? নিজের মৃত মায়ের কথা মনে হয় আমার। এতক্ষণে আমার চোখ পানিতে ভরে যায়।

বড় ছেলেটি আমাকে বলে, আব্বা আজকে স্কুলে যাব না? আম্মাতো আমাকে কিছু বলে না। নাস্তাও দেয় না। কাপড় পরতে বলে না।

আজ স্কুলে যেতে হবে না।

কেন আব্বা?

দেশে একটি অঘটন ঘটেছে।

কি অঘটন আব্বা?

দেশে একটি হত্যাকান্ড হয়েছে।

অনেক লোক মারা গেছে?

হ্যাঁ, অনেকইতো। তোমার মতো একটি ছেলেও আছে।

আমার মতো ছেলে? ওকে কেন মারবে? ও কি করেছে?

কিছুই করেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে মারলো কেন?

ওদের খুশি হয়েছে তাই।

ইচ্ছা হলেই মানুষকে মারা যায় আব্বা? এটা ওদের কেমন খুশি আব্বা? মানুষ মারা কি খুশির কাজ?

নিজের ঘর থেকে আমার পরিবার চেঁচিয়ে উঠে বলে, তোমরা থাম। ছেলেটা এত কথা বলছে কেন? তোমাদের কথা আমি শুনতে পারছি না। আমার মাথা ঘোরাচ্ছে। আমি ফিট হয়ে যাব মনে হচ্ছে।

আমি ওকে বলি, তুমি শুয়ে থাক। ছেলেদু'টিকে আমিই দেখব। ছোটটার কান্নাতো থেমেছে। ও এখন আমার কাছে থাকবে।

আমার পরিবার কাঁদতে শুরু করে। বুকের ভেতরে ছোটটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

আমি আমার বড় ছেলেটিকে নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াই। দেখতে পাই রাস্তায় রিক্সা-গাড়ি নেই। বিভিন্ন জায়গায় জড়ো হয়ে মানুষ রেডিও শুনছে। কেউ ছোট ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে পায়চারি করছে। প্রকৃত ঘটনা কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই হতভম্ব। কেউ উত্তেজিত। সবাই পাগলের মতো কেবল রেডিও শুনছে।

কেউ একজন বলে, আমি বত্রিশ নম্বর বাড়িতে গিয়ে দেখে আসতে চাই। আমি এখুনি যাব। নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কিছুই বিশ্বাস করতে পারব না।

লোকটি হাঁটতে শুরু করলে কেউ একজন তার হাত টেনে ধরে বলে, পাগলামি করবেন না। শুধু শুধু পরের হাতে প্রাণ দেবেন কেন? ওরা এখন পাগলা কুত্তা। অস্ত্র নিয়ে ঘুরছে। দেখলেই গুলি করবে। রেডিওতে খবর শোনেন।

ওদের দম্ভের কথা শুনবো নাকি? রেডিওর ওইসব ননসেন্স প্রচার আমার শোনার দরকার নাই। আমি যাচ্ছি।

লোকটি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মুখ ভেংচি করে। তারপর সামনে পা বাড়ায়।

ও একটু এগোলে আর একজন ওর পিছু নেয়।

এরপর আর একজন।

এভাবে বেশ কয়েকজন এগোতে থাকে।

আমার ছেলে জিজ্ঞেস করে, আব্বা ওনারা কোথায় যায়?

ঘরে চলো। দেখি তোমার আম্মা কি করছে।

আম্মাতো কাঁদছে।

চলো তোমার আম্মাকে কাঁদতে মানা করি।

আমার হাত টেনে ধরে ছেলে বলে, না, আম্মাকে কাঁদতে মানা করবেন না। কেন কাঁদতে মানা করবেন।

মানা করবো না? তুমি তাই চাও?

হ্যাঁ, আমি চাই আম্মা কাঁদুক। আম্মা কেঁদে কেঁদে আমাদের বাড়িটা চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানিতে ভিজিয়ে ফেলুক। আব্বা আমারও ভীষণ কান্না পাচ্ছে। আব্বা–

কথা শেষ করতে পারে না আমার ছেলে। গুনগুনিয়ে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে ও আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমার সমান যে ছেলেটিকে ওরা মেরেছে তার নাম কি জানেন আব্বা?

ওর নাম রাসেল।

রাসেল! হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে আমার ছেলে। দু'হাতে চোখ মুছে বলে, আমি রাসেলের বাড়িতে যাব আব্বা। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন?

আমি আমার ছেলের কথার জবাব দেই না। ওর কাছ থেকে নিজেকে সরানোর জন্য বাথরুমে ঢুকি।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বের হয়ে দেখি ও মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদছে। মা ওকে জড়িয়ে ধরে আছে।

সেদিন রাতে আর্মির একজন অফিসার এসে আমাকে দশটি কাঠের বাক্স বানানোর হুকুম দেয়। বলে, রাতের মধ্যে বাক্স বানানো শেষ হওয়া চাই। এক মুহূর্ত দেরি হলে চৌদ্দগুষ্ঠী গুলি করে শেষ করব। মনে থাকবে?

আমি কোনোরকমে ঘাড় কাত করি। শরীর হিমশীতল। স্তব্ধ হয়ে থাকা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। ওরা চলে গেলে আমি আমার আড়তের দুজন কর্মীকে ডেকে আনি। আমাদের কাজ শুরু হয়।

রাতে ভাত খাওয়ার জন্য বাড়ির এলে আমার ছেলে জিজ্ঞেস করে, আব্বা রাসেলের লাশের জন্য বাক্সটা বানানো হয়েছে?

আমি চুপ করে থাকি।

আব্বা সকালে যখন বাক্স নিয়ে যাবেন তখন আমি আপনার সঙ্গে যাব। রাসেলের বাক্সটা আমি ওকে দিতে চাই আব্বা।

আমি কিছু বলার আগেই আমার পরিবার ছুটে আসে। বলে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমিও ওই বাড়িতে বাক্স নিয়ে যেতে চাই।

আমি ওদের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে থাকি। আমি নিজেকে একজন বোবা মানুষ মনে করছি। আমার মনে হয় আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে। আমার সব শক্তি শেষ।

সাক্ষী মোহাম্মদ কুদ্দুস সিকদার তাঁর জবানবন্দিতে বলেন : ১৫ই আগস্ট দিবাগত শেষ রাত্রে কাঠের আড়তদার ঠেলা গাড়িতে করিয়া লাশের জন্য ১০টি কাঠের বাক্স লইয়া আসে। ফজরের আযানের পরে মেজর বজলুল হুদা আর্মির supply transport company-র ফোর্সসহ একটি গাড়িতে করিয়া বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে। মেজর বজলুল হুদা, বঙ্গবন্ধুর লাশ বাদে বাকী লাশগুলি (৯টি) ঐ গাড়িতে করিয়া লইয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৬.

আমি সেনাবাহিনী প্রধান। আমার অফিসে অনুমান সকাল ৭টার সময় রেডিও ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার কথা শুনিয়াছি। আমি অফিসে অবস্থানকালে আমার ডিপুটি চীফও আমার সামনেই বসিয়া ছিলেন। এক পর্যায়ে ডিপুটি চীফ জেনারেল জিয়া বলিলেন সি. জি. এস. খালেদ মোশারফকে আর বাহিরে যাইতে দিও না। তাহাকে বল "ops order- তৈরি করতে, কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি মাইট গেট ইন দিস ষ্ট্রিট।

আমি বলি, ঠিক আছে আমি দেখবো। এই সময় খালেদ মোশারফ ফিরিয়া আসে এবং আমার অফিসে ৪৬ ব্রিগেডের ঘটনা বলার কথা বলিতে যাইবে এমন সময় বাহিরে হট্টগোলের আওয়াজ শুনি। তখন আমার অফিসে জেনারেল জিয়া আমার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্ণেল নাসিম এবং সি জি এস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ উপস্থিত ছিল।

বাহিরে দরজা ধাক্কা দিয়া মেজর ডালিম ১০/১৫ জন সৈন্যসহ সশস্ত্র অবস্থায় আমার অফিসে ঢুকে এবং তাহারাই তাহাদের অস্ত্র আমার দিকে তাক করিয়া দাঁড়ায়। ডালিম যদিও একজন চাকুরিচ্যুত অফিসার ছিল সেইদিন সে ইউনিফরম পরিহিত ছিল। আমি ডালিমকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি, ডালিম আমি এই অস্ত্র দেখে এবং ব্যবহারে অভ্যস্থ। তুমি যদি এটা ব্যবহার করতে এসে থাক তাহলে ব্যবহার কর। আর তা না হলে যদি কথা বলতে এসে থাক তাহলে তোমাদের সৈন্যদের অস্ত্র বাহিরে রাখিয়া আস।

ইহার পরে ডালিম তাহার অস্ত্রটি নীচের দিকে মুখ করিয়া বলে, Sir President wants you at the Radio station. আমি তখন তাকে বলিলাম President তো মারা গিয়াছেন। তখন সে আমাকে বলিল, Sir you should know Khondoker Mustaque is the President now. তখন আমি বলি, Khondoker Mustaque may be your President, he is not mine. ডালিম বলে, Sir don't make me do something for which I did not come. আমি তাহাকে বলিলাম তোমার যাহা খুশি করিতে পার, আমি আমার troops-এর কাছে যাইতেছি। এই বলিয়া আমি আমার অফিস হইতে বাহির হইয়া আসি এবং ৪৬ ব্রিগেডে রওনা করি। ডালিম তাহার সৈন্য-সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গাড়ি লইয়া আমার পিছনে আসিতে থাকে এবং ৪৬ ব্রিগেডে একটা ইউনিটে লইয়া যায়। সেখানে মেজর রশিদ এবং মেজর হাফিজ আমাকে রেডিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশনে যাইবার জন্য চাপ দিতে থাকে। ঐখানে পরিবেশ দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া যাই এবং তাহাদের চাপের মুখে আমি বলি যে আমি একা যাইব না। আমি এয়ার এবং নেভাল চীফের সাথে কথা বলি। কিছুক্ষণ পরে তাহারা আমার কাছে আসিলেন। আমি তখন কি করিব ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।

কোন কাউন্টার এ্যাকশনে রক্তপাত এবং সিভিল ওয়ার হইতে পারে এই ধরনের পরিস্থিতি ধারণ করিয়া এবং মেজর রশিদ এবং মেজর ডালিমের চাপের মুখে আমি রেডিও স্টেশনে যাইতে বাধ্য হই। এই সময়ের মধ্যে এয়ার এবং নেভী চীফও পৌঁছিয়া যায়। তাহারা আমার সাথেই ডালিম ও তাহার অস্ত্রধারী এসকট করিয়া রেডিও স্টেশনে লইয়া আসে। এয়ার এবং নেভী চীফ পিছনে আসিতে থাকে। রেডিও স্টেশনে ঢুকিয়া আমাকে একটা রুমে conduct করা হয়। রুমে ঢুকিয়া দেখি একটু পিছনে খন্দকার মোশতাক বসা এবং তাহার বাম পাশে তাহের উদ্দিন ঠাকুর দাঁড়ানো। খন্দকার মোশতাক পরিধানে সাদা প্রিন্স কোট, মাথায় টুপি এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুরের পরিধানে পায়জামা-পাঞ্জাবী, মাথায় সাদা কিস্তি টুপি ছিল। আমি রুমে ঢুকার সাথে সাথে খন্দকার মোশতাক আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'শফিউল্লাহ Congratulation. Shafiullah, your troops have done an excellent job, now do the rest. জিজ্ঞাসা করিলাম What rest? -You should know it better. আমি বলিলাম In that case leave it to me. এই কথা বলিয়া আমি রুম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, এমতবস্থায় তাহের উদ্দিন ঠাকুর সাহেব বলিল, স্যার ওনাকে থামান। ওনার আরও দরকার আছে। এই কথা বলার সাথে সাথে ডালিম, রশিদ ও অপর একজন সম্ভবত মোসলেম আমাকে আটকাইয়া ভিন্ন রুমে লইয়া যায়। ঐ রুমে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর সাহেব আসেন এবং আমাকে আনুগত্য স্বীকারের একটা খসড়া লিখিয়া দেন এবং ঐ খসড়া আমাকে দিয়া পড়াইয়া আমার কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্য চীফ হেডদেরও আনুগত্য স্বীকার নিজ নিজ কণ্ঠে রেকর্ড করানো হয়। তারপর খন্দকার মোশতাক সাহেব বলিলেন, জুম্মার আগে প্রেসিডেন্টের শপথ অনুষ্ঠান হইবে এবং আমি আমার চীফদের সেখানে দেখিতে চাই। তারপর আমাদেরকে বঙ্গভবনে লইয়া যাওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৭.

বঙ্গবন্ধুর লাশ তখনো সিঁড়ির উপরে।

মেজর শাহাদাত হোসেন খান বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল মতিউর রহমান তাঁকে দু'জন অফিসার নিয়ে বাড়ির অবস্থা দেখার জন্য নির্দেশ দেন। অবস্থা দেখার পরে তাকে পরিস্থিতি রির্পোট করতে হবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে এডজুটেন্ট ছিলেন। সেই রাতে তিনি অফিসিয়াল মেসে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকাল ছয়টা বা সাড়ে-ছয়টার দিকে মেসের বাইরে তুমুল হইচইয়ের শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। বাইরে এসে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারির ফোর্সসহ অফিসার ও গাড়ি সশস্ত্র অবস্থায় দেখতে পান। তাদের কেউ তাকে বলে, আমরা সব শেষ করে দিয়ে এসেছি। তোমরা এখনও ঘুমিয়ে আছ? ইউনিফর্ম পরে তাড়াতাড়ি ইউনিটে রির্পোট কর। মেসে যারা ছিলেন তারা সবাই ইউনিফরম পরে সাড়ে সাতটার দিকে ইউনিটে রির্পোট করেন।

সেখানে যাওয়ার পরে তিনি জেনারেল শফিউল্লাহসহ উর্ধ্বতন সেনা অফিসারদেরকে কমান্ডিং অফিসারের রুমে সমবেত হতে দেখেন। দেখতে পান ইউনিফরম পরে সশস্ত্র অবস্থায় আছেন মেজর ডালিম ও মেজর রশিদ। কিছুক্ষণের মধ্যে নেভী প্রধান এম. এইচ খান, বিমানবাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার আসেন। এদের আগেই এসেছিলেন ডেপুটি চীফ অফ স্টাফ জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, কর্ণেল নজমুল হুদা খানসহ আরও অনেকে। তাদের আলোচনার এক পর্যায়ে তাঁকে বত্রিশ নম্বর বাড়ির অবস্থা দেখার জন্য পাঠানো হয়।

নির্দেশ অনুযায়ী তিনি দু'জন অফিসারকে নিয়ে সকাল পৌনে নয়টার দিকে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে আসেন। বত্রিশ নম্বর রোডের মাথায় সশস্ত্র ফোর্সসহ ট্যাংক, জিপ গাড়ি ইত্যাদি দেখতে পান। কালো এবং খাকী রঙের ইউনিফর্ম পরে ছিল ফোর্সরা। তারা শাহাদাত হোসেন খানের গাড়ি থামায়। তিনি তাদেরকে বলেন যে, উপর থেকে নির্দেশ পেয়ে তারা এসেছেন। ওরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গেটের কাছে গেলে সশস্ত্র সৈনিকদের বাড়ির ভেতরে এবং রাস্তায় দেখতে পান। আরও দেখতে পান গেটের পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছেন বেশকিছু বেসামরিক লোক।

বঙ্গবন্ধুর বাসার গেটে মেজর নূর চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা তাদেরকে রিসিভ করে। তারা কেন এসেছেন তা জানতে চায় দুজনেই। শাহাদাত হোসেন খান বলেন, চীফ অফ স্টাফ জেনারেল শফিউল্লা আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির অবস্থা দেখে রিপোর্ট করার জন্য পাঠিয়েছেন। মেজর নূর তাদেরকে বাড়ির ভেতর দেখানোর জন্য ক্যাপ্টেন হুদাকে বলেন। তারা তার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে রিসেপশন রুম। শাহাদাত হোসেন খান দেখতে পান গুলিবিদ্ধ শেখ কামালের লাশ মেঝেতে পড়ে আছে। তিনি বজলুল হুদাকে জিজ্ঞেস করেন, শেখ কামালকে কেন মেরেছেন? বজলুল হুদা বলেন, শেখ কামাল ফোনে বাইরে খবর দিচ্ছিল সেজন্য মেরেছি।

ওই রুমে টেবিলের সামনেই পড়েছিল আর একটি লাশ। তিনি লুঙি-পরা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শাহাদাত হোসেন খান ক্যাপ্টেন হুদাকে জিজ্ঞেস করেন, এনাকে কেন মেরেছেন?

উত্তরে হুদা বলে, সে পুলিশের লোক। তাকে চলে যেতে বলেছিলাম, সে চলে না গিয়ে তর্ক শুরু করেছিল সেজন্য তাকে মেরেছি। এরপর হুদা আমাদেরকে দোতলার সিঁড়ির দিকে নিয়ে যায়। সিঁড়ির দক্ষিণ দিকের বাথরুম দেখিয়ে বলে, এখানে শেখ নাসেরের লাশ আছে। দায়িত্ব পালনকারীরা বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গুলিবিদ্ধ শেখ নাসেরের লাশ দেখতে পান। তিনি হুদাকে জিজ্ঞেস করেন, এনাকে কেন মেরেছেন?

ক্যাপ্টেন হুদা কোনো উত্তর দেন না। তিনি দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে থাকেন। সিঁড়ির কয়েক ধাপ উঠেই দায়িত্ব পালনকারী অফিসাররা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ দেখে হতভম্ব হয়ে যান।

সাদা ধবধবে পাঞ্জাবী পরিহিত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি। পা ভাঁজ করা। চিৎ হয়ে সিড়ির ওপর পড়েছেন। বুকের বাম পাশে, পেটের ডান দিকে, ডান হাতে অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন জায়গা গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাঁর পাশে চশমাটি পড়ে আছে। শাহাদত হোসেন খান হুদাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কেন দেশের প্রেসিডেন্টকে এভাবে মারলেন?

উত্তরে হুদা বললেন, আমি যখন দলবলসহ তাঁর কাছে যাই তিনি তখন বলেন, তোমরা কেন আমার বাসায় এসেছ? কে তোমাদেরকে পাঠিয়েছে? শফিউল্লাহ কোথায়? এই বলে তিনি আমাকে ঝটকা মারেন। আর আমি পড়ে যাই। এরপর আমরা তাঁকে গুলি করি।

এরপর ক্যাপ্টেন হুদা খাবার ঘরের পাশে গেলে তাঁরা সেখানে বেগম মুজিবের গুলিবিদ্ধ লাশ দেখতে পান। সেই ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে গুলিবিদ্ধ আরও চারটি লাশ দেখতে পান।

তখন শাহাদত হোসেন খান ক্যাপ্টেন হুদাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন এদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন?

ক্যাপ্টেন হুদা বলেন, সশস্ত্র সৈনিকরা আউট কন্ট্রোল হয়ে এদেরকে হত্যা করে। তারপরে লুটপাট করে। সেজন্য অমি সৈনিকদের বাইরে রেখেছি। হুদা আরও জানায়, কর্ণেল জামিলকে বাইরে মেরে তার লাশসহ গাড়ি বাড়ির ভেতরে পেছনে রাখা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতগুলো লাশ দেখে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন দায়িত্ব পালনকারী অফিসাররা। তারা আর কর্ণেল জামিলের লাশ দেখতে যান না।

এরপর শাহাদত হোসেন খান তার সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে অফিসে ফিরে আসেন। মৌখিকভাবে তাঁর কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানকে ঘটনা ও ক্যাপ্টেন হুদার বক্তব্যের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মেজর শাহাদাৎ হোসেন খান এভাবে তার জবানবন্দি দেন।

৪৮.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ পড়ে আছে সিঁড়িতে।

এই বাড়িতে প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি অনন্ত সময়। সময় এখানে এগিয়ে যায় না। সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে। অথচ চলাই নিয়ম। কিন্তু কখনো কখনো নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। মানুষই এই ব্যত্যয় ঘটায়।

বাড়ির একতলায়, দোতলায় আরও লাশ আছে। এখানে এখন রক্ত এবং মৃত্যুর আশ্চর্য সখ্য। এমন হওয়ার কথা ছিল না। তারপরও হয়েছে। রক্ত এবং মৃত্যুর সমান্তরাল রেখা তৈরি করেছে একদল মানুষ। এটা কোনো যুদ্ধকালীন সময় নয়। তারপরও রক্তের স্রোত বয় এবং মৃত্যুর তান্ডব তৈরি হয়।

মানুষ জানে মৃত্যু মানেই রক্ত নয়। মৃত্যু মানে রক্তের ভেতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা নয়। মানুষের জীবনে মৃত্যুর গভীরতম সত্য শান্তির ঘুমে জীবনের বিপরীত প্রান্তে চলে যাওয়া। এই বাড়ি থেকে মৃত্যুর এমন গভীরতম সত্য উধাও।

এই বাড়িতে প্রশান্তির মৃত্যু ঘটেনি।

এই মৃত্যুর সঙ্গে বর্বর মানুষের নিষ্ঠুরতা আছে। নৃশংসতা আছে। উন্মাদনা আছে। বোধহীন আচরণের উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে বোধহীন উল্লাস আছে।

তারপরও এই বাড়ির কালজয়ী মানুষটি বর্বর নৃশংসতার কাছে নতি স্বীকার করেননি।

বুকে গুলি নিয়েও মৃত্যুকে সেই শান্তির মৃত্যুর স্থায়ী রূপ দিয়েছেন, যখন একজন আর্মি অফিসার তাঁর লাশের দিকে তাকিয়ে বলবেন, মৃত্যু তাঁকে পরাজিত করতে পারেনি।

তাঁর নাম মেজর জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

তিনি এখন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবানবন্দি দিচ্ছেন। তিনি P.W. 42

আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর। বর্তমানে ব্যবসা করি। আমি ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হই। তখন ৪ ফিল্ড আর্টিলারি, লাহোরে আমার পোস্টিং হয়। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ ছুটি লইয়া আমি বাড়ি আসি। ২৫শে মার্চ শেষ রাতে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। মুক্তিযুদ্ধকালীন সুন্দরবন সাব-সেক্টরে দায়িত্বে ছিলাম। যুদ্ধের পরে ৩ ফিল্ড আর্টিলারিতে আমার পোস্টিং হয়। আমি লেফটেন্যান্ট পদে কুমিল্লায় যোগদান করি। তখন ৩ ফিল্ড আর্টিলারি ভারপ্রাপ্ত ফিল্ড ছিলেন মেজর আজিজ পাশা।

১৯৭৩ সনে মেজর পাশা ক্যাপ্টেন বজলুল হুদার বোনকে বিবাহ করেন। এই সময় মেজর ডালিম এবং ক্যাপ্টেন হুদা কুমিল্লায় ১ ফিল্ড আর্টিলারিতে কর্মরত ছিলেন।

১৯৭২ সালে আমি ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি পাই। ১৯৭৪ সালে ডি.জি.এফ.আই. ঢাকায় আমার পোস্টিং হয়। আমাকে ঢাকা ডিটার্চমেন্টের ও. সি.-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পালনকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের কিছুদিন পূর্বে ডি.জি.এফ.আই, ডি.জি. ব্রিগেডিয়ার রউফ আমাকে বলিয়াছিলেন যে মেজর ডালিম এবং মেজর নূরসহ আরো কিছু সংখ্যক অফিসারগণ সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং এই সম্পর্কে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একটি চিঠি দিয়া তিনি তাহা জানাইয়াছেন।

এরপর আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ই আগস্ট '৭৫ তারিখে বঙ্গবন্ধুর একটি কর্মসূচি পাই। ডি.জি.এফ.আই. হইতে আমাকে বঙ্গবন্ধুর পারসোনাল বডি গার্ড হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাথে বঙ্গবন্ধু যেখানে যেখানে যাইবেন সেখানে সেখানে সাদা পোশাকের সৈনিকদের পোস্টিংয়ের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়।

আমি আগস্টের ১২/১৩ তারিখ এই সমস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করি এবং সৈনিকদের যথাযথস্থানে পোস্টিংয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। ১৪ই আগস্ট দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক লাইব্রেরী এলাকায় কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই এলাকা পরিদর্শনের জন্য আমাকে দায়িত্ব দিয়া পাঠানো হয়। আমি ৩/৪ জন সৈনিকসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক লাইব্রেরী এলাকায় যাই এবং বিস্ফোরণের বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করি।

১৫ই আগস্ট ভোর ৪-৩০ টায় যাহাতে আমার অধীনস্থ সৈনিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থান নেয় সেই নির্দেশ আমি ১৪ই আগস্ট বিকালে অফিসে বসিয়া দেই।

১৫ই আগস্ট সকাল আনুমানিক ৫-৩০/৫-৪৫টায় আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুলশানস্থ ডি.জি.এফ.আই. অফিসার মেস হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর পরে মহাখালীর দিকে যাইতে আমি দেখিতে পাই রাস্তার আইল্যান্ডের উপরে একটি ট্যাংক উঠিয়া আছে এবং রাস্তার পাশের খাদে আরো একটি ট্যাংক পড়িয়া আছে। আমি জিপ চালাইয়া আমার গন্তব্যের দিকে যাইতে থাকি। বর্তমান যাদুঘরের মোড়ে আসিলে ডি.জি.এফ.আই.-এর একজন সৈনিক হাত উঁচু করিয়া আমাকে গাড়ি থামাইতে বলিলে গাড়ি থামাই। সৈনিকটি দৌড়াইয়া আমার কাছে আসে এবং বলে স্যার, শেখ সাহেবকে তো মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি সৈনিকটিকে আরো প্রশ্ন করায় সে জানায়, মেজর ডালিম রেডিওতে এই সব ঘোষণা প্রচার করিতেছে। পাশেই পানের দোকান হইতে সে একটি ছোট ট্রানজিস্টার আনিয়া আমাকে ঘোষণা শোনায়।

ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমি পাশেই রেডিও স্টেশনে যাই। সেখানে রেডিও স্টেশনের ভিতরে সামনের একটি কক্ষে মেজর ডালিমকে দেখিতে পাই। সে খুব উত্তেজিত হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতেছে, শুয়োরের বাচ্চাকে গুষ্ঠী সুদ্দা মারিয়া ফেলিয়াছি।

আমি রেডিও স্টেশনের চত্বরে কিছু নিরস্ত্রকৃত রক্ষীবাহিনীর সদস্যদেরকে দেখিতে পাই। আমি সেখান হইতে সরাসরি ডি.জি.এফ.আই. অফিসে চলিয়া আসি। অফিসে আসিয়া টেলিফোনে ডি.জি.এফ.আই.-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করি। কিছুক্ষণ পরে ডি.জি. রউফ সাহেব অফিসে আসেন। আমি তাহার অফিসে গিয়া রেডিও স্টেশনসহ আমার দেখার সমস্ত বিবরণ তাহাকে জানাই। আমি ডি.জি.-কে সেনাসদরে যাইবার অনুরোধ জানাই। ডি.জি. সাহেব সেনাসদরে চলিয়া যান। এর কিছু পরে আমিও সেনাসদরে যাই। সেখানে গিয়া ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, জেনারেল শফিউল্লা এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের দেখিতে পাই। আমি আরো দেখিতে পাই জেনারেল শফিউল্লার পিছনে স্টেনগান হাতে মেজর ডালিম দাঁড়াইয়া আছে। আমি অন্যান্য অফিসারদের কাছে শুনিতে পাই যে অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে মেজর ডালিম সশস্ত্র অবস্থায় আর্মি চীফের অফিসের দরজা লাথি মারিয়া খুলিয়া জেনারেল শাফিউল্লাকে তাহার অফিস কক্ষ হইতে বাহির করিয়া আনে।

কিছুক্ষণ পরে মেজর ডালিম অস্ত্রের মুখে জেনারেল শফিউল্লাকে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে লইয়া যায়। জেনারেল জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশারফসহ কিছু সিনিয়র অফিসার তাহাদেরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসরণ করে। আমি ডি. জি. রউফ সাহেবের সাথে তাহার গাড়িতে করিয়া একই পথ অনুসরণ করি। মেজর ডালিমের জিপে একটি ৫০ রাউন্ডিং মেশিনগান ফিট করা ছিল।

১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে যাইবার কিছুক্ষণ পরে এয়ার এবং নেভী চীফদ্বয় সেখানে আসেন। মেজর ডালিম এখানেও বিভিন্ন সিনিয়র অফিসারদের বকাবকি গালিগালাজ করে। কিছুক্ষণ ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকার পরে মেজর ডালিম স্কট করিয়া জেনারেল শফিউল্লাকে রেডিও স্টেশনের দিকে লইয়া যায়। পিছনে জেনারেল জিয়াউর রহমান, এয়ার এবং নেভী চীফদ্বয় ঐ গাড়ি দুইটিকে অনুসরণ করে।

আমরা বাকী সব অফিসার ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে চলিয়া আসি। এখানে বিভিন্ন অফিসার আলোচনা করিতেছিল যে, যেহেতু বঙ্গবন্ধু ইতিমধ্যে নিহত হইয়াছেন তাই কোনো পদক্ষেপ নিলে গৃহযুদ্ধ হইতে পারে অযথা রক্তক্ষরণ হইতে পারে, তাই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সমীচীন নয়।

এই সময় সি.জি.এস. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে টেলিফোন সংযোগ স্থাপন করেন এবং রক্ষীবাহিনীকে কোনো রকম আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে নিষেধ করেন। তিনি রক্ষীবাহিনীর ডাইরেক্টর হাসান সাহেবকে রেডিও স্টেশনে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন।

আমি ডি.জি.এফ.আইয়ের জিপ লইয়া রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যাই। সেখানে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের ব্যাটল ড্রেসে দেখিতে পাই। অতঃপর ডাইরেক্টর হাসান সাহেবকে লইয়া আমি রেডিও স্টেশনে যাই।

সেখানে খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, মেজর ডালিম, মেজর খন্দকার আব্দুর রশিদ, মেজর নূর, মেজর শাহরিয়ার, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর রশীদ চৌধুরীকে দেখিতে পাই।

কিছু পরে মেজর ফারুক সেখানে আসেন। আরো কিছু পরে কর্ণেল তাহের সেখানে আসেন। মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদ কর্ণেল তাহেরের সাথে আলাপ করেন। তখন কর্ণেল তাহের উত্তেজিত এবং উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন এবং মেজর রশীদ ও মেজর ফারুককে বলেন, তোমরা কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করিয়াছ। এই বলিয়া রাগান্বিত অবস্থায় কর্ণেল তাহের রেডিও স্টেশন ত্যাগ করেন। ইহার পর আমি ডি.জি.এফ.আই. অফিসে ফিরিয়া যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ণেল মুশিউদ্দৌলা এবং কর্ণেল মাহমুদুল হাসানকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির হত্যাকাণ্ডের ছবি তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমিও তাহাদের সাথে বঙ্গবন্ধু ধানমণ্ডির ৩২নং রোডস্থ বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়া মেজর নূর ও ক্যাপ্টেন হুদাকে দেখিতে পাই। তখন বেলা ১১টার পর হইবে।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির গাড়ি গ্যারেজের করিডোরে একটি গাড়ির মধ্যে বুলেট বিদ্ধ কর্ণেল জামিলের লাশ দেখিতে পাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির নীচ তলায় রিসেপশন টেলিফোন রুমে শেখ কামাল, শেখ নাসের এবং অপর একজনের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখিতে পাই। আমরা ডি.জি.এফ.আই.-এর ক্যামেরা দ্বারা নীচতলার লাশের ছবি তুলি। তারপর উপর তলার লাশগুলির ছবি তোলার জন্য কর্ণেল দৌলা, কর্ণেল হাসান এবং আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সিঁড়ি দিয়া উঠিতে থাকি। কিছুটা উঠেই সিঁড়ির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশ দেখিয়া আমরা থমকে দাঁড়াই। দেখিয়া মনে হইতেছিল, একজন নিষ্পাপ শিশু ঘুমাইয়া আছে। ঘাতকের অজস্র বুলেট তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেও তাহার মুখে কপালে মৃত্যুর কোনো যন্ত্রণা বা বেদনার ছাপ নাই। আমার মনে হইল মৃত্যু তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

আমরা বঙ্গবন্ধুর লাশের ছবি নিলাম। তখন দোতলায় করিডোরে আর্টিলারি এবং ল্যান্সারের সৈন্যেরা পাহারারত ছিল। তাহারা বাকী লাশগুলি দেখিতে সহায়তা করে।

বঙ্গবন্ধুর শয়নকক্ষে বেগম মুজিব, শেখ জামাল, শেখ রাসেল, সুলতানা কামাল এবং রোজী জামালের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত লাশগুলি আমাদেরকে দেখায়। আমরা সমস্ত লাশের ছবি তুলি।

বঙ্গবন্ধুর বাড়ির ভিতরে এবং বাহিরে বিভিন্ন দেয়ালে অসংখ্য বুলেটের দাগ এবং রক্তাক্ত ছাপ দেখিতে পাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির আসবাবপত্র তছনছ করা অবস্থায় দেখিতে পাই। পরে আমরা ডি.জি.এফ.আই. অফিসে ফেরত আসিয়া ছবিগুলি ডি.জি.এফ.আই. অফিসে জমা দেই। এরপর ডি.জি.এফ.আই.-র পক্ষ হইতে বঙ্গভবন কভারের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়।

আমি ঐ দিন বিকালে বঙ্গভবনে যাই। সন্ধ্যায় দেখিতে পাই রাষ্ট্রপতির রুমে বসিয়া খন্দকার মোশতাক, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ, এয়ার এবং নেভী চীফদ্বয়, মেজর ডালিম, মেজর শাহরিয়ার, মেজর রশীদ, মেজর ফারুক, মেজর নূর, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেজর আজিজ পাশা আলোচনারত। এই সময় বিভিন্ন দেশের রেডিও মনিটরিং নিউজগুলি খন্দকার মোশতাকের কাছে আনিয়া দেওয়া হয়। তিনি সবাইকে পড়িয়া শোনান যে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর আধঘন্টা হইতে এক ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তান সরকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি জানাইয়াছে। এই সংবাদটি শোনার পর মেজর ফারুক, মেজর রশীদ এবং মেজর ডালিমকে বেশ উল্লসিত এবং গৌরবান্বিত মনে হইতেছিল।

রেডিও মনিটরিংগুলি মোশতাক, মেজর ডালিম, মেজর ফারুক এবং মেজর রশীদের হাতে হস্তান্তর করেন। এর বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি দেখিতে পাই মেজর ফারুক বঙ্গভবনের মধ্যে কয়েকটি ট্যাংক Deploy করাইতেছে। মেজর ফারুক, মেজর শাহরিয়ার এবং তাহের উদ্দিন ঠাকুর এখন কাঠগড়ায় (সঠিকভাবে সনাক্ত)।

৪৯.

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল আব্দুল হামিদ তাঁর জবানবন্দিতে বলেন,

১৫ই আগস্ট দিবাগত রাত্র তিনটার সময় বঙ্গভবন হইতে মেজর এম. এ. মতিন আমাকে টেলিফোনে বলেন, আপনার প্রতি কড়া নির্দেশ শেখ সাহেবের বাড়ি হইতে তাঁর লাশ ছাড়া বাকী সব লাশ সূর্য উঠার আগে আগে বনানী গোরস্থানে দাফনের ব্যবস্থা করুন।

আমি নির্দেশ মোতাবেক আমার ডিউটি ব্যাটালিয়নকে স্টেশন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আমার ডিউটি অফিসারকে বলি। আমি নিজেও তৈরি হইয়া তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া যাই। অফিসে পৌঁছিয়া একটি গাড়িতে কিছু ফোর্স বনানীতে কবর খোঁড়ার জন্য পাঠাই। অপর গাড়িতে কিছু ফোর্স বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পাঠাই।

এছাড়া ফোনে ডিউটি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার এম. এ. রবকে তাড়াতাড়ি বনানী গোরস্থানে লাশ দাফনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলাম। পরে আমি জিপযোগে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি যাইয়া দেখি সব লাশ পৃথক পৃথক বাক্সে রাখা হইয়াছে। মেজর হুদা সেখানে উপস্থিত ছিল।

আবদুর রব ১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হিসাবে Supply and Transport ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন।

১৬ আগস্ট আনুমানিক রাত সাড়ে তিনটার দিকে তাঁর কাছে ফোন আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হামিদের কাছ থেকে। তিনি ফোনে তাঁকে নির্দেশ দেন এই বলে যে, তোমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির লাশ, আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ির লাশ এবং শেখ মণির বাড়ির লাশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব dispose off করতে হবে।

আবদুর রব জিজ্ঞেস করেন, কোথায় কীভাবে dispose off করব?

উত্তরে লেফটেন্যান্ট হামিদ বলেন, এটা বঙ্গভবনের নির্দেশ। সব লাশ বনানী কবরস্থানে দাফন করতে হবে।

নির্দেশ পাওয়ার পরে আবদুর রব তাঁর ব্যাটালিয়নকে টেলিফোনে নির্দেশ দেন এই বলে, লাশ দাফনের জন্য কুড়ি-পঁচিশ জন সৈন্য রেডি থাকবে। কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিটারি ট্রাক নিয়ে লাশ আনার জন্য বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যেতে নির্দেশ দেন আবদুর রব। আনুমানিক সাড়ে চারটার দিকে তিনি নিজ ব্যাটালিয়নে যান। সেখান থেকে আনুমানিক পাঁচটার দিকে ৪টি ট্রাকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন সৈনিকসহ বনানী কবরস্থানে পৌঁছে যান।

শহরে কারফিউ দেয়া হয়েছে। কবরস্থানে একজন চৌকিদার ছাড়া আর কেউ নেই। আবদুর রব একই সঙ্গে আরও দুটি ট্রাক পাঠান মন্ত্রী সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির বাড়ি থেকে লাশ আনার জন্য। অপর চৌকিদারের সাহায্যে কবরের স্থান ঠিক করে কবর খোঁড়ার নির্দেশ দেন।

একটু পরে বত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে লাশ ওঠানোর জন্য ট্রাক গিয়ে থামে। ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা ট্রাকে লাশ ওঠানোর নির্দেশ দেন। এবং কাজের তদারকী করেন।

একে একে লাশের কফিন উঠতে থাকে ট্রাকে।

প্রথমে রেণুর কফিন ওঠে। ধানমন্ডির লেকের পানিতে তরঙ্গ জাগে। লেকের অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে কয়েকজন সিভিলিয়ান। ওরা দেখতে পায় কফিন ওঠানোর দৃশ্য।

বাতাসে এবং জলে ছড়িয়ে যায় রেণুর আর্তকণ্ঠ।

একই সঙ্গে রেণুর আর্তকণ্ঠ বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, আমি যাচ্ছি গো। তোমাকে রেখেই আমার যেতে হচ্ছে। পুলিশ যখন তোমাকে এই বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যেত তখন আমি তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতাম। এই আমি যাচ্ছি। আমাদের সংসার তছনছ করে দিয়ে ওরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অপেক্ষার দিন ফুরিয়ে গেল গো।

সারা বাড়ি থমথমে। কোথাও কোনো সাড়া নেই। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে না। রেণু সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু কোনো সাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান না।

রেণু আবার বলেন, আমি যাচ্ছি গো। আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছ না কেন? তুমি কি আমার সঙ্গে রাগ করেছো? কোথাও যাওয়ার সময় তুমিতো আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে। এখন কি হলো। সত্যি করে বলো তুমি কি আমার সঙ্গে রাগ করেছো?

হ্যাঁ, রাগ তো করেছি। তুমি আমাকে একা রেখে যাচ্ছ রেণু। এমন তো কথা ছিল না। কোথাও যেতে হলে তোমাকে রেখে দূরে আমিই গিয়েছি। তুমি যাওনি।

রেণুর হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বলেন আমিতো জানি তুমি একা নও। তোমার সঙ্গে হাজার মানুষ আছে। তুমি তাদের মধ্যে আমাকে খুঁজে নিও। দেখবে সবার সঙ্গে আমিও তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। তুমি ঠিকই আমাকে খুঁজে পাবে।

সেদিন যদি আমি হাত বাড়িয়ে তোমাকে কিছু দিতে বলি?

আমি তোমাকে টুঙ্গিপাড়ার শিউলি গাছের ফুল দিয়ে গাঁথা মালা দেব।

হ্যাঁ, তাই দিও। আমি এটুকুই চাই। শিউলির গন্ধভরা শ্বাস টেনে আমি বলবো, রেণু তুমি জেগে আছ আমারই ভেতর। তুমি মানুষের মাঝে নেই। সবচেয়ে একা, সবচেয়ে অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়ে আছ আমারই জন্য।

তোমার জন্য কি রান্না করব সেদিন?

বাড়ির পুকুরের মাগুর শিং মাছ। আর নিজেদের ক্ষেতের চালের ভাত।

বাহ বেশ! যেমন করে আগে রেঁধেছি। তেমন করেই আবার রাঁধব। আবার আমাদের সুখের সংসার হবে?

হ্যাঁ হবে। ইহলোকে কারও কোনো সাধ্য ছিল না আমাদের সংসার ভেঙে দেয়ার। কোনো দিনই কেউ এমন সুযোগ পাবে না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনই থাকব রেণু।

আমি তোমার সঙ্গে পুরোটা জীবন সুখে কাটিয়েছি। আমার বিশ্বাস আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

পুরো বাড়িতে কল্লোলিত হয় বাতাস। ভেসে আসে শব্দরাজি, তোমাদের ভালোবাসা অক্ষয় হোক। তোমাদের যুগল-জীবন দীর্ঘায়িত হোক। তোমরা বেঁচে থাক আমাদের মাঝে। তোমাদের আয়ু নিয়ে আমরা হেঁটে যাব এ দেশের মেঠো পথে। ঘরে ঘরে। মানুষের ভালোবাসার জলের সীমায় ভেসে যাবে তরী। তোমাদের আয়ু-ভরা তরী দিয়ে যাব আমাদের সন্তানদের। বলবো, এ তোমাদেরই সম্পদ।

তখন বনানী কবরস্থানে কয়েকটি লাশের কফিন নিয়ে একটি ট্রাক পৌঁছে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০.

আর একটি ট্রাকে বাকি লাশ ওঠানো হয় বত্রিশ নম্বর বাড়ির চত্বর থেকে।

কামালের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

খুকু আমরাতো একসঙ্গেই যাচ্ছি।

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই আছি।

আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ।

খুকুর মৃদু হাসি বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

তা কেন করবো। তা কি করতে পারি। তোমাদের সঙ্গে আমার জুটি বাঁধা হয়েছে।

জুটি বাঁধা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তুমি তো দেশের খ্যাতিমান এ্যাথলেট। কতবার খেলার মাঠে স্বর্ণপদক পেয়েছো। গোল্ডেন গার্ল নামে খ্যাতি ছিল তোমার। খেলার মাঠে তোমাকে দেখেইতো আমার পাগল হওয়া। আমাদের কফিন ট্রাকে ওঠানোর পরও আমি এখন এই গোল্ডেন গার্লকে স্যালুট করছি।

খুকুর মৃদু হাসি বাতাসে ছড়িয়ে যায়।

হাসছো যে? তোমার আনন্দ হচ্ছে?

হচ্ছেই তো। কারণ আজকে আমরা দু'জনে মৃত্যুর মাঠে দাঁড়িয়ে আছি।

ঠিকই বলেছো, তবে এখানে আমাদের দৌড়াবার সুযোগ নেই।

আমরা হাত ধরে হাঁটতে পারি।

আমরা সবুজ ঘাসকে বলতে পারি, তোমাদের ছোঁয়া আমাদের প্রাণে শান্তি দিচ্ছে। তোমাদের স্পর্শ আমাদের মন আনন্দে ভরিয়ে রাখত।

মৃত্যুর মাঠে কি ঘাস থাকে খুকু?

মনে করো আছে। আমাদের জন্য আছে। মৃত্যুর মাঠে তোমাদের নতুন জন্ম হোক প্রিয় সবুজ ঘাসেরা।

আমরা দুজনে খেলা ভালোবাসতাম। আমরা যে মাঠেই যাই না কেন সেখানে ঘাস থাকবে। সবুজ ঘাসে ফুটে উঠবে আমাদের ভালোবাসার ফুল।

তাহলে আজ এই মৃত্যুর মাঠে তুমি একচক্কর দৌড় দিয়ে আস খুকু। আমাদের জন্য এটাই হবে মৃত্যুর উৎসব।

আমি একা কেন যাব? আমরা একসঙ্গে যাব। তোমাকে ছাড়া আজ আমি কিছুতেই দৌড়াব না।

ভুলে যাচ্ছ কেন খুকু যে মৃত্যুর মাঠে তোমার আগে আমি সীমারেখায় পৌঁছে গেছি। এখন তুমি দৌড়ে আমার কাছে এলে আমাকে আর একা হতে হবে না। আমরা মৃত্যুর উৎসবে লাল বেলুন ওড়াবো একসঙ্গে। তুমি আছ তো খুকু?

হ্যাঁ, আমি কাছেই আছি।

তুমি কি ওদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ খুকু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনতে পাচ্ছি ওদের কণ্ঠস্বর। ওদের কেউ কেউ তোমার বন্ধু ছিল।

তাহলে শোনো ওরা কি বলছে।

আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এলডি বশির আহমদ বলছে: বেশ কিছুক্ষণ পরে মেজর মহিউদ্দিন, মেজর নূর, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা, রিসালদার সারোয়ার, আর্টিলারির সুবেদার মেজর সাহেব বাহিরে আসে। তখন মেজর নূরকে খুব ক্ষিপ্ত দেখাইতেছিল। তিনি সুবেদার মেজর সাহেবকে বলেন, যাও দেখে আস শেষ হইয়াছে কিনা। আমার গুলি তাহার শরীরে লাগিয়াছে। তখন আমি রিসালদার সারোয়ার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি মেজর নূর কি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে গুলি করিয়াছে? জবাবে রিসালদার সারোয়ার বলিলেন, হ্যাঁ। এই কথাটি মেজর নূর শুনিয়া আমাকে বলেন, তুমি কি ফিস ফিস করিতেছ? আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে গুলি করিয়াছি। তুমি গেইটের বাহিরে চলিয়া যাও।

তখন আমি গেইটের বাহিরে গিয়া রাস্তার দক্ষিণ পাশে লেকের পাড়ে গিয়া দাঁড়াই এবং লেকের দক্ষিণ পাশে অনেক সিভিলিয়ান লোককে দেখিতে পাই। সবার মুখ রাষ্ট্রপতির বাড়ির দিকে। সিভিলিয়ানদের মধ্যে একজনের আওয়াজ এইভাবে শুনিতে পাই, ঢের হইয়াছে আমরা আসিতেছি।

তখন ক্যাপ্টেন বজলুল হুদা রিসালদার সারোয়ার সাহেবকে বলেন, ঐখানে যে নায়েক (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) বশির আছে তাহাকে বল লেকের দক্ষিণ পার্শ্বের লোকদেরকে বলিতে তাহারা যেন চলিয়া যায় অন্যথায় তাহাদের উপর গুলি হইবে। ঐ অর্ডারটি তখন রিসালদার সারোয়ার আমাকে দেয়। আমি তখন লেকের পাড়ে গিয়া চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলে তাহারা চলিয়া যায়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পশ্চিম দিকে একটি ট্যাংকের আওয়াজ শুনিতে পাই। ধীরে ধীরে ট্যাংকটি আমার কাছে আসিলে আমি উপরের দিকে তাকাইয়া ট্যাংকের উপরে মেজর সৈয়দ ফারুক রহমানকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে সেলিউট (Salute) করি। তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি এখানে কি ডিউটি করিতেছ? ইতিমধ্যে ট্যাংকটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে গিয়া থামে। ট্যাংক গেইটে আসার আগে গেইটে অফিসারদের সাথে একটি ছোট ছেলেকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখিতে পাই। একজন সৈনিক ছেলেটির হাত ধরিয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যায়। কিছুক্ষণ পর একটি গুলির শব্দ শুনিতে পাই।

উহ, আমাদের ছোট্ট রাসেল।

মেজর নূর— মেজর নূর, আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল খুকু।

আমিতো জানি। আমিতো তাকে এই বাড়িতে দেখেছি।

যুদ্ধের সময় ও জেনারেল ওসমানী সাহেবের এডিসি ছিল। ডালিমকে এই বাড়িতে দেখনি খুকু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিতো জানতাম যে তোমাদের বাড়ির সঙ্গে ডালিমের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। আমি আর এসব কথা ভাবতে চাই না। চলো আমরা শান্তির ঘুম ঘুমাতে যাই। মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা— হিংস্রতাকে চলো আমরা ঘুমের দেশে নিয়ে যাই।

ওহ, খুকু! তুমি এমন করে ভাবছ।

না ভেবে আমাদের উপায় নেই। আমাদের রাসেল ওদের হিংস্রতার সামনে এক অবোধ শিশু।

ছেড়ে যায় ট্রাক। ধানমন্ডি লেকের উপর থেকে ভেসে আসা বাতাস লেগে থাকে ট্রাকের গায়ে।

একটু পরে বনানী গোরস্থানে লাশের আর একটি ট্রাক পৌঁছে যায়। কবর খোঁড়ার কাজ শেষ হয়নি।

৫১.

আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে আমি চলে যাচ্ছি। বনানী কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে। সঙ্গে জামালও আছে। ওর সঙ্গে বিয়ের পরে এখনও আমার হাতের মেহেদীর রঙ মুছে যায়নি।

আমার কফিন ট্রাকে তোলার পরে আমার মনে হয় এ যাওয়াটা আমার যাওয়া নয়। আমি বুঝি এই বাড়িতেই আছি। একদিন জামাল হাসতে হাসতে বলেছিল, তোমার মামার বাড়িটাকে আমি কেমন শ্বশুরবাড়ি বানিয়ে দিলাম। তুমি কি খুশি হয়েছ রোজী?

আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, হ্যাঁ খুব খুশি হয়েছি। এখন থেকে এ বাড়ি কখনো আমার মামার বাড়ি হবে, কখনো শ্বশুরবাড়ি। ছোটবেলা মামাবাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি নিয়ে কতো ছড়া মুখস্ত ছিল।

জামাল বলেছিল, আমি একটা ছড়া বলব?

আমি বলেছিলাম, বল।

জামাল সুর করে বলেছিল, খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ি, সঙ্গে যাবে কে। বাড়ি আছে হুলো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।

আমরা দু'জনে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলাম।

আমি বলেছিলাম, মামারবাড়ির ছড়াটি আমি বলি?

আমার প্রশ্নে জামাল সাড়া দেয়নি। বুঝেছিলাম উত্তর দেয়ার মানুষ নীরব হয়ে গেছে। জামালের সাড়া নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাতকরা ওঠানামা করছে।

হাসু আপা যাচ্ছি।

এই বাড়ি তৈরি হতে আমি দেখেছি। আপনি যেমন দেখেছেন তেমন। এই সিঁড়ি আপনার খুব প্রিয় জায়গা ছিল। তখনও দোতলার ঘরগুলো ওঠেনি। সিঁড়িও প্লাস্টার করা হয়নি। আপনি এখানে বসে বই পড়তেন। নয়তো চা খেতেন। গ্রাম থেকে কেউ এলে এখানে বসে গল্প করতেন। আপনার এই আনন্দের সিঁড়িটি এখন আপনার জন্য অন্ধকার হাসু আপা।

রেহানা যাচ্ছি। আমাদের সৌভাগ্য যে ঘাতকরা তোমাদের নাগাল পায়নি। মাত্র কিছুদিন আগে হাসু আপার সঙ্গে তোমার জার্মানি যাওয়া হলো। একেই বলে ভাগ্যের লীলাখেলা। তোমরা দুজনে বেঁচে আছ এইটুকু সুখ নিয়ে আমরা মরেও শান্তি পাচ্ছি।

তখন শোনা যায় জামালের কণ্ঠস্বর, শোনো রোজী, আমাদের দুই বোন দেশের সরকারের কাছে বিচার চাইতে পারবে। ওরা বলবে, এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচার চাই।

ঠিক বলেছো। রোজীর গম্ভীর কণ্ঠ উড়ে যায় বাতাসে। লেকের ওপর দিয়ে বয়ে যায় প্রবল বাতাস। ওরা শুনতে পায় মেজর দূর ধমকাচ্ছে সৈনিকদের, বলেছি না, এই রাস্তায় একজনও সিভিলিয়ান ঢুকতে পারবে না। লেকের দক্ষিণ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা কারা? ওরা কোথা থেকে এত সাহস পায় যে নিজেদের চোখে ঘটনা দেখবে বলে এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

জামালের কণ্ঠস্বর, শুনতে পাচ্ছো রোজী?

কি?

আর্মির ভাষায় দেশের অন্য মানুষরা সিভিলিয়ান। ওরা এভাবেই মানুষকে দেখে। কারণ ওদের ভাষা অস্ত্রের ভাষা।

একশ থেকে দেড়শ লোক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন দু'জন করে বাড়ছে। যদি শহরে ট্যাংক না নামতো, স্টেনগান, রাইফেলসহ অন্যান্য অস্ত্রের মুখোমুখি না হতো তাহলে হয়তো ওরা এ বাড়িতে ভেঙে পড়তো। এমনইতো হয়েছে বারবার। এ বাড়িতো শুধু বঙ্গবন্ধুর একার বাড়ি থাকেনি। কখনো একটি বাড়ি শুধু বাড়িই থাকে না। জাতির স্বার্থে সে বাড়িটি একটি জায়গা হয়, মানুষের জমায়েত হওয়ার জায়গা। এ বাড়ি তা প্রমাণ করেছে। আমার এখনো মনে আছে রোজী, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে আব্বা মুক্তি পাওয়ার পরে এ বাড়িতে মানুষের ঢল নেমেছিল। মিছিলের পরে মিছিল আসত। আমার মনে হয়েছিল এ বাড়ি আমাদের একার বাড়ি নয়। যারা এখানে এসেছে তাদের সবার বাড়ি। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও এমন অবস্থা হয়েছিল। আর্মির কয়েকজন সদস্য আব্বাকে মেরে ফেলেছে। আব্বা নেই। ওরা কেন দূরে দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে? কেন ওদের মারার হুমকি দেবে?

রোজী গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তবু ভালো যে সিভিলিয়ান বলেছে। ব্লাডি সিভিলিয়ান বলেনি।

হ্যাঁ, সেটা বলাই ওদের জন্য ঠিক ছিল। কণ্ঠস্বর শুনে মেজাজের মাত্রা বুঝতে পারছ তো?

ওদের মেজাজের মাত্রা বোঝার আমার দরকার নাই। এখানে যারা এসেছে ওরা আজ দানব হয়েছে। তবে সবাইতো একরকম না। অস্ত্রের দম্ভ সবাই দেখায় না।

বাতাস হু-হু বয়। এখন শীতকাল নয়। পাতাঝরার সময় নয়। তারপরও বাতাসে পাতাঝরার মর্মর ধ্বণি। কোটি কোটি পাতা ঝরে যাচ্ছে হাজার রকম গাছ থেকে।

জামাল মৃদু স্বরে ডাকে, রোজী।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। সাড়া দেয়ার কেউ নেই।

রোজী তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ?

বয়ে যায় পাতাঝরার ধ্বণি। চারদিক ভীষণ চুপচাপ। ট্রাক চলতে শুরু করে। ট্রাকের চাকার ঘর্ঘর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। এই শহরের এমনই নিয়তি এখন।

AMARBOI.COM

৫২.

আমি এ বাড়ির সবচেয়ে ছোট ছেলে। এ বাড়িতেই আমার জন্ম। এখন আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর কখনো ফিরে আসবো না।

আমি এ বাড়িতে ছুটোছুটি করে বড় হয়েছি। হাসু আপার কাছে শুনেছি আমার জন্মের তিন বছর আগে এ বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। আর আমার জন্মের সময় একতলার কাজ শেষ হয়েছিল। আমার সবচেয়ে মজা লাগে যখন আমি ভাবি, আমিও বড় হয়েছি, বাড়িটাও বড় হয়েছে। আমার জন্মের দুই বছর পরে বাড়ির কাজ শেষ হয়।

আমার বড় চার ভাইবোন। আমি সবার নয়নের মণি ছিলাম। সবাই আমাকে খুব ভালোবাসতো। আব্বা বাড়িতে থাকলে আমার বেশি আনন্দ হতো। আমার মনে হতো পুরো বাড়িটা ফুলের বাগান হয়ে গেছে। ফুল ফুটে লাল হয়ে আছে চারদিক। আমাদের বাড়িটা দোতলা। তিনতলায়ও দু'টো ঘর আছে। আমি সাইকেল নিয়ে সবখানে যাই। আমার যেতে ভালোলাগে। মনে হয় সাইকেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পঙ্খীরাজ। পঙ্খীরাজে উড়ে ঘুরে বেড়িয়ে ভাবি এই বাড়িকে একদিন আমি একটি অন্যরকম বাড়ি বানানো। সেজন্য মাটির ব্যাংকে আমার পয়সা জমতে থাকে। যখন আমরা কেউ থাকব না, তখন এই বাড়িটি দেখতে লোকেরা আসবে। তোমারও আসবে বন্ধুরা। দেখবে এই বাড়ির নতুন নাম হয়েছে। সেখানে আমার মাটির ব্যাংকটিও তোমরা দেখতে পাবে। ব্যাংকটি দেখে তোমরা ভাববে, এই বাড়িতে একটি ছোট ছেলে ছিল। ও নেই। ওর জিনিসগুলো আছে। আমরা এই জিনিসগুলোর ভেতরেই ওকে দেখতে পাচ্ছি।

বিদায় বন্ধুরা।

৫৩

রেণু ওরা আমাকে কফিনে প্রচুর বরফ দিয়ে রেখেছে। নীচতলায় আছি। আমাদের প্রিয় আবাসে। আমরা অনেক কষ্টে-শ্রমে অনেকদিন ধরে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলাম। এই বাড়ি এখন দেশের প্রেসিডেন্টের বাসভবন। একটু আগে প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে তুমি চলে গেলে রেণু। তোমার প্রাণহীন দেহটা নিয়ে গেছে মাত্র। আমি জানি তোমার আত্মা আমার চারপাশে আছে। জীবনের যা কিছু সুন্দর তা আমি তোমার মাঝে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

আমাদের জীবনের কত উত্থানপতন তোমারই চোখের সামনে ঘটেছে রেণু। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয়েছিল। আমি মন্ত্রীত্ব পেলাম। মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে তোমাদের নিয়ে উঠলাম। আমাদের জন্য ওটিই ছিল প্রথম একটি সরকারি বাড়ি।

দু'চার দিন পরেই হক সাহেব বললেন, তাঁকে করাচি থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন। আরও বললেন, বেটাদের হাবভাব ভালো না। আমি করাচি যেতে রাজী হলাম। সোহরাওয়ার্দী সাহেব অসুস্থ। তাঁকেও আমার দেখে আসা হবে।

আমরা করাচি গেলাম। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের খেলা সবই টের পেলাম। ঢাকায় ফিরে দেখলাম তুমি ভালো করে সংসার গোছাতে পারোনি। তোমার কোলজুড়ে তিনটি সন্তান। এতকিছু করার সময় কোথায়। আমি তোমাকে বলেছিলাম, সংসার গোছানোর আর দরকার হবে না। সরকার আমাদের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবে। আমাকে গ্রেফতার করবে। ঢাকায় তো আমাদের বাড়িঘর নেই। থাকবে কোথায়। বোধহয় টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে যেতে হবে। বাবার বাড়িই আমাদের ভরসার জায়গা রেণু। তুমি আমার কাছে থাকবে বলে এসেছিলে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাবে। ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ হবে ওদের। তা বোধহয় আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো না।

তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তো ছিলেই। আমি তখন বললাম, নিজের হাতের যা টাকাপয়সা ছিল সেগুলোও খরচ করে ফেলেছ। ঢাকায় থাকা তোমার জন্য কঠিন হবে।

তুমি ভাবনায় পড়লে। তোমার মুখ দেখে আমি তা বুঝি। তুমি আমাকে আর কিছু বললে না। সেদিনই বিকেলে টেলিফোনে খবর এলো। কেন্দ্রীয় সরকার ৯২(ক) ধারা জারি করেছিল। মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়া হয়েছিল। আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তুমি আমার জেলে থাকার দরকারি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলে রেণু। আর ভীষণ কেঁদেছিলে। দেখলাম ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। তাই ওদের জাগালাম না। তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে আমার বলার কিছু নাই রেণু। তুমি বুঝেশুনে যা করার করবে। ঢাকায় থাকতে কষ্ট হলে বাবার কাছে চলে যেও। সেদিন ওই কথা তোমাকে বলতে আমার খুব কষ্ট হয়েছিল রেণু। আর আমার বন্ধুকে বলেছিলাম তোমাকে একটি বাড়ি ভাড়া করে দিতে। ওরা তোমাকে বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল। দেখাশোনাও করেছিল।

তুমি বলবে, এমন কত শত ঘটনা আমাদের জীবনে আছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও আমাদেরকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু মিন্টো রোডের বাড়িটা ছাড়া মানে আমাদের জীবনের প্রথম সরকারি বাড়ি ছাড়া।

রেণু দ্বিতীয়বার আমাদেরকে আবার সরকারি বাসভবন ছাড়তে হলো। প্রথমবার আমি জেলে গিয়েছিলাম একা। তুমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সরকারি আবাস ছেড়েছিলে। এবারও আমি একা রয়ে গেলাম। তুমি ছেলেদের আর পুত্রবধূদের নিয়ে চলে গেলে। প্রথমবার আমার বন্ধুদের বলেছিলাম তোমাকে একটি বাড়ি ভাড়া করে দিতে। এবার বাড়ির দরকার হলো না। সাড়ে তিন হাত জমিনে স্থায়ী বাস হলো আমাদের। এখান থেকে আমাদেরকে আর কোনো দিন কোথাও যেতে হবে না রেণু।

৫৪.

সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক এম. এ. রব তাঁর জবানবন্দিতে বলেন:

> প্রথমে ৭টি লাশ যে কাপড়ে ছিল সেই কাপড়েই কবরস্থ করি।
>
> প্রায় দেড় ঘন্টা পরে আরো ১১টা লাশ আসে। সেইগুলিও যেভাবেই আসে সেভাবেই কবরস্থ করি। লাশগুলিতে পচন ধরিয়াছিল। মোট আমরা ১৮টি লাশ কবরস্থ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সেখানে কোনো লোক না থাকায় আমরা যতদূর পারিয়াছি দোয়া-দরুদ পড়িয়া লাশগুলি কবরস্থ করিয়াছি। আইনগত, যেমন লাশগুলিতে পোস্ট মোর্টেম-এর কোনো চিহ্ন দেখি নাই।

৭টি লাশ কফিনে ছিল। বাকীগুলি কফিনে ছিল না।

আমি ব্যাটালিয়নে যাইবার আগেই লাশ আনার জন্য দুইটি ট্রাক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে পাঠাই। আমার নির্দেশেই এই ট্রাকগুলি আমার ব্যাটালিয়ন পাঠায়।

কবরের ভিতরে বাঁশের চালিয়া দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তাই তাহা করা যায় নাই। পরের দুইটি ট্রাকে আনা লাশগুলি পরে শুনিয়াছি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ হইতে লইয়া আসে।

লাশের সুরতহাল বা ময়না তদন্ত করা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

হাসপাতাল হইতে লাশ আনার কাগজপত্র আমি দেখি নাই। লাশগুলির গোসলসহ অন্যান্য ধর্মীয় কাজ করার কোনো পরিস্থিতি বা সুযোগ ছিল না। কফিনের ব্যবস্থা করাও সম্ভব ছিল না। জানাজাও হয় নাই। বলা যায় লাশগুলি মাটি চাপা দিয়াছি।

ইহা সত্য নহে যে, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ইহা করিয়াছি।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট কখন দেশে মার্শাল 'ল' জারি হয় তাহা মনে নাই। মার্শাল 'ল'-এর আওতায় কখন হইতে আমি আদেশ রিসিভ করিয়াছি তাহাও আমার মনে নাই। আমি কর্ণেল হামিদ সাহেবের নির্দেশে আমার কাজ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি বঙ্গভবনের নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। তখন মার্শাল 'ল' অথরিটি দেশে সর্ব উচ্চ অথরিটি ছিল কিনা আমি জানি না। ১৫ই আগস্ট আমার ব্যাটালিয়নে স্বাভাবিক কাজকর্ম করাইয়াছি। আমার স্ব-ইচ্ছায় ঘটনার দিন বঙ্গবন্ধুর বাড়ি গিয়াছি। আমার মতো আর কতজন অফিসার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। গুজব শুনিয়া কৌতুহলবশত বাড়ি গিয়াছিলাম। ঢাকার মধ্যে এইভাবে আসিতে কোনো বাধা নাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি হইতে লাশ লইয়া আমাকে বলিয়াছে যে, এইগুলি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ছিল। লাশগুলি dispose off করার আগে বা পরে লাশের কোনো দাবীদার সেখানে ছিল না। কারফিউর মধ্যে আর্মিদের চলাফেরার কোনো নিষেধ ছিল না। বনানী কবরস্থানের কোনো মসজিদ বা ইমাম ছিল কিনা তাহা আমি জানি না। আমি কেবল একজন চৌকিদার সেখানে পাইয়াছি। আশপাশে বা বায়তুল মোকাররম মসজিদে কোনো ইমাম আছে কিনা সেই সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়িত্ব ছিল না। আমার উপর কেবল নির্দেশ ছিল লাশগুলি তাড়াতাড়ি dispose off করা। তাছাড়া তখনকার সময় ও পরিস্থিতির কারণে এইসব ব্যবস্থা নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতি কারফিউ। তবে মার্শাল 'ল' কিনা স্মরণ নাই। ঐ ঘটনায় আর্মির লোক মারা গিয়াছে কিনা তখন জানিতাম না। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির লাশ dispose off করিতে বলা হইয়াছে। সেখানে আর্মি সিভিল কিছু বলা হয় নাই। আমার ব্যাটালিয়নের লোকজন লাশ নিয়া আসিয়াছে। তাহাদেরকে কে লাশ দিয়াছে জানি না।

যে কাপড় পরা ছিল লাশ দেখিয়া মনে হইল সেই কাপড়েই লাশগুলি আনা হইয়াছে।

৪টি লাশ চিনিয়াছিলাম। অপর ১৪টি লাশের কাপড় দেখিয়া কবরের চিহ্ন রাখি নাই। যে যে কাপড়ে ছিল সেই ভাবেই কবরস্থ করা হয়।

ইহা সত্য নহে যে, ধর্মীয় অনুভূতির কোনো তোয়াক্কা না করিয়া আমি লাশগুলি কবরস্থ করিয়াছি বা আমি ইচ্ছা করিলে লাশগুলির পরনের কাপড়চোপড়/আলামত সংরক্ষণ করিতে পারিতাম।

আমাদের আর্মি স্টোরে সাদা কাপড়/কাফনের কাপড় পাওয়া যাইত কিনা তাহা জানি না। টি.এম. এইচ-এ লংক্লথের ধোয়া কাপড়/চাদর থাকেই।

ইহা সত্য নহে যে, আমি ইচ্ছা করিলে লাশগুলির ধোপার ধোয়া কাপড় দ্বারা দাফন করিতে পারিতাম। নিজে থেকে বলিল, আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে আমি সেইভাবে নির্দেশ পালন করিয়াছি।

তদন্তকারী অফিসারের নিকট জবানবন্দি দিয়াছি।

লাশগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব dispose off করিতে হইবে। স্টেশন কমান্ডারের এই কথা তদন্তকারী অফিসারকে না বলা ঠিক নহে, অবশ্যই বলিয়াছি।

ইহা সত্য নহে যে, ১৫ই আগস্ট এই মামলার মৃত ব্যক্তিদেরকে আমি বনানীতে কবর দেই। নিজে হইতে বলিলেন, বঙ্গবন্ধুর লাশ ছাড়া ১৮টি লাশ বনানীতে কবরস্থ করিয়াছি।

সেখানে বঙ্গবন্ধুর লাশ দেখি নাই বা সেখানে তাহার লাশও দাফন করি নাই। পরে শুনিয়াছি বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়া নিয়া গিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৫.

অফিসারদের মুখে বঙ্গবন্ধু, টুঙ্গিপাড়া শুনে বুক ফেটে যায় হালিম মিয়ার। যতক্ষণ লাশ দাফনের কাজ ছিল ততক্ষণ নিজেকে সামলাতে পেরেছে। গতকাল রেডিওতে বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর শুনেছে। আজ লাশ এসে পৌঁছেছে বনানী কবরস্থানে। দাফনের কাজটি ঠিকঠাক মতো হয়নি, ধর্মীয় মতে হয়নি এই প্রবল দুঃখে স্তব্ধ হয়েছিল কবরস্থানের চৌকিদার হালিম মিয়া।

বড় ট্রাকগুলো আগেই চলে গেছে। বাকীরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুনসান হয়ে যায় চারদিক। বুকফাটা কান্নায় চিৎকার করে ওঠে হালিম মিয়া। এখানে কান্নার শব্দ শোনার জন্য লোক নেই। এতক্ষণ কাঁদেনি ও। আপ্রাণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত রেখেছিল। বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঁদতে দেখলে সৈনিকরা যদি ওর বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে! ওরা যদি বলতো তোমার জীবনের বদলে বঙ্গবন্ধুর জীবন বাঁচাও, তাহলে ও সব অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে যেত। এমন কি ট্যাংকের সামনেও। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলার পরে ও ওদের রাইফেলের নলের গুলিতে মরতে রাজি নয়।

মাত্র পাঁচ দিন আগে নিজের গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জ থানা থেকে ফিরেছে। অসুস্থ বুড়ো মাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল হালিম মিয়া। ভাবতে থাকে, মায়ের জীবনের বদৌলতে যদি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জীবন রাখা যেত! একজনের মৃত্যু দিয়ে কি দশ জনের মৃত্যু ঠেকানো যায় না? যদি না যায় তাহলে ও নিজেও বঙ্গবন্ধুর মতো নেতার জীবনের জন্যে নিজের জীবন দিয়ে দিতে রাজি আছে। ও মরতে ভয় পায় না। কাঁদতে কাঁদতে ও একটি বাঁধানো কবরের পাশে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে। তারপর সরু রাস্তার ওপরে পা ছড়িয়ে দেয়। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমরা কারা এমন নিষ্ঠুর মানুষ? তোমাদের কি ঈমান নাই? কোনো মুসলমানের লাশ কি এভাবে দাফন হয়? আমি আমার চৌকিদারি জীবনে এমন কোনো অবস্থা কোনো দিন দেখিনি। হালিম মিয়া দাঁত কিড়মিড় করতে থাকে। সরু রাস্তার ওপর পা দাপায়। ঘাড় উঁচু করে আকাশ দেখে। আস্তে আস্তে মন একটু শান্ত হলে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওর স্মৃতির কথা মনে হতে থাকে। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় ও বঙ্গবন্ধুর কর্মী ছিল। তারজন্য ভোট চেয়ে অন্য কর্মীদের সঙ্গে পথেঘাটে ঘুরেছে। ওর মা বঙ্গবন্ধুর খুব ভক্ত ছিল। ওকে অনেকদিন বলেছে, বাবারে এই মানুষটা দেশের রাজা হলে আমাদের অনেক শান্তি হবে। দুই মুঠো ভাত খেয়ে ঘুমুতে পারব। বাবারে গরিব মানুষের জন্য এত ভালোবাসা আমি আর কোনো নেতার মধ্যে দেখিনি।

এখন যদি ওর মা এখানে থাকত তাহলে কি হতো ওর মায়ের? মা কি এই সিমেন্টের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেত? আমি কেমন করে আমার মাকে বলবো যে আমি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জন্য কবর খুঁড়েছি? ধর্মীয় বিধান পালন না করে লাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাফন করা হয়েছে? মাগো আপনি আমাকে মাফ করে দেন। ও আবার ডুকরে কাঁদে। আশপাশ থেকে উড়ে আসে কাকেরা। শালিক কিংবা চড়ুই। দূরে দূরে বসে থাকে– গাছে কিংবা কবরের দেয়ালে। হালিম মিয়া উঠে দাঁড়ায়। কবরস্থানের এ মাথা, ও মাথা ঘুরে আসে। বকুল গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। বুকের ভেতর উত্তেজনা ফিরে আসে। ইলেকশনের উত্তেজনা। গোপালগঞ্জ থানা আর কোটালিপাড়া থানা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী এলাকা।

একদিন ওর মা ওকে বলেছিল, দেশের রাজা যখন আমাদের বাড়ির পথ দিয়ে যাবে তখন তুই তাঁকে আমাদের ঘরে নিয়ে আসবি।

হালিম চোখ কপালে তুলে বলেছিল, বলেন কি আম্মা, তিনি এলাকার এতবড় নেতা তিনি কি আমাদের বাড়িতে আসবেন?

আসবে রে আসবে। আমরা তাঁকে ভোট দেব। দেখিস তিনি সব গরিবের বাড়িতে ঢুকবেন।

সে সময়ে হালিমের খুব মন খারাপ ছিল। নির্বাচনে জেতা যাবে কিনা মাঝে মাঝে এই ভয়ও পেয়ে বসতো। তারা তো দেখছে মুসলিম লীগের প্রার্থী ওয়াহিদুজ্জামান কত টাকা-পয়সার মালিক। তার কাছে ওদের মতো গরিবের কোনো পাত্তা ছিল না। তাঁর ভোটের প্রচারের জন্য আছে লঞ্চ, স্পিডবোট, সাইকেল, রিকশা আরও কতকিছু। আর বঙ্গবন্ধুর জন্য মাইকের বাক্স ছাড়া কিছু নাই। আর ছিল দুইটা সাইকেল। হালিমের নিজের সাইকেল ছিল না, কিন্তু অনেক কর্মীর নিজেদের সাইকেল ছিল। এ সবই ওদের সম্বল। আর সবচেয়ে বড় সম্বল ছিল মানুষের ভালোবাসা। ওরা যে বাড়িতে যেত সে বাড়ির সবাই বলতো, আমরা শেখের বেটাকে ভোট দিব। কেউ কেউ বলতো, মুজিব ছাড়া আমাদের আর কে আছে। ভালো করে খাটাখাটনি কর তোরা। ওই টাকাঅলা বেটার কাছে যেন হারা না লাগে তোদের। সাবধান, হুঁশিয়ার, বেশি বুড়োরা আঙুল তুলে শাসাতো ওদের।

হালিম মিয়ার মতো কর্মীদের খাটাখাটনির অন্ত ছিল না। গ্রামের পথঘাট ভাঙাচোরা। আছে তো নাই এমন অবস্থা। যাতায়াতের কষ্টের সীমা নাই। বঙ্গবন্ধুর আব্বার কয়েকটি ভালো নৌকা ছিল। সেগুলো ব্যবহার করা হতো। এদিকে ওদের নেতা বেশি খরচ করতে পারতো না। সেজন্য ছাত্র-কর্মীরা নিজেদের টাকা খরচ করে কাজ করতো।

হালিমের মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করতো, তুই কি করছিস বাবা?

হালিম শুকনো মুখে বলত, গায়ের খাটনি ছাড়া আমি আর কি দিব মা? যেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়ার দরকার হয় সেখানে আমি সবার আগে যাই মা। গাঁয়ের কারো ঘরে যেতে আমার বাদ নাই। সবাই বলে, আমার নেতাকে ভোট দিবে।

মা খুশিতে ওর কপালে চুমু দিত।

হালিমের মনে পড়ে সে সময়ে ওর মা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো। অন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহিলারাও নেতাকে দেখার জন্য অপেক্ষা করতো। কি যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁদের। এখন ভাবলেও হালিম মিয়ার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। যারা সাধারণ গেরস্থ তারা নেতাকে পান খাইয়ে হাতে টাকাপয়সা ধরিয়ে দিত। বঙ্গবন্ধু নিতে না চাইলে রাগ করতো। বলতো নির্বাচনের খরচ। তোমার খরচ লাগে না। লোকজনকে বিড়ি কিনে দিও।

তিনি হাসতে হাসতে বলতেন, আমার বিড়ি দিয়ে ভোট কিনতে হবে না চাচা। দেশের মানুষ কি চায় তা আমি বুঝে গেছি। মুসলিম লীগের নেতা আমাকে হারাতে পারবে না। আমি রাজনীতির জ্ঞান দিয়ে বুঝে গেছি যে মানুষকে বুকে টানলে মানুষ নিজেকে উজাড় করে দিতে চায়।

প্রবীণ লোকেরা মাথা নাড়িয়ে বলতো, তুইতো খুব সুন্দর কথা বলিস খোকা। ওকে দিয়েই হবে। ও আমাদের মাটির ছেলে।

হালিম মিয়া স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বুঝতে পারে বুকের ভেতর দম আটকে আছে। স্মৃতি আরও আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে যখন একদিন ওর মা নেতার হাত ধরে বলেছিল, বাবা আমার এই কুঁড়েঘরে তোমার একটু বসতেই হবে।

আমার সাথে তো অনেক লোক।

থাকুক। ওরা যে কয়জন বসতে পারে বসুক। তুমি এই পাটিতে একটু বসো।

মায়ের কান্ড দেখে হালিম তো অবাক। ও দেখে একটুপরে ওর মা, একবাটি দুধ একটি পান আর চার আনা পয়সা নিয়ে এসে বলে, এই দুধটুকু খাও বাবা। আর এই পয়সা কয়টা নাও। আমার তো বেশি কিছু নাই।

সেদিন বঙ্গবন্ধুর চোখে পানি এসে গিয়েছিল। তিনি মায়ের ঐ পয়সার সঙ্গে আরও কয়েকটা টাকা দিয়ে বলেছিলেন, আপনি যে আমাকে দোয়া করেছেন এটাই আমার কাছে অনেক বড়। পয়সা দিয়ে ওর মূল্য পরিমাপ করা যায় না।

হালিমের মা টাকা নেয়নি। বঙ্গবন্ধুর মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, গরিবের দোয়া তোমার জন্য আছে বাবা।

এমন অনেক অনেক জন বঙ্গবন্ধুকে দোয়া করতেন। তিনি যখন পাকিস্তানের জেলখানায় ছিলেন যুদ্ধের সময় তখন হালিমের মা তাঁর মুক্তির জন্য দোয়া করতেন। নামাজ পড়তেন। রোজা রাখতেন। এমন আরও অনেকে। অনেকে।

হালিম মিয়া দ্রুত পায়ে কবরস্থানের ভেতরে হাঁটতে থাকে। এখন এই খবর শুনে তাঁর মা কি করবেন? উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদবেন। বাড়ি মাথায় তুলবেন। পাগলের মতো একবাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে ছুটে যাবেন। মায়ের চিন্তায় ওর বুক ধড়ফড় করে। মায়ের কাছে তো রেডিও নেই। মা কি খবরটা পেয়েছন? তারপর নিজেই বলে, পেয়েছেন, পেয়েছেন। গাঁয়ের অনেক বাড়িতে এক ব্যান্ডের রেডিও আছে। এই খবর এখন গাঁয়ের তুফান। চারদিক তোলপাড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে বইছে।

নতুন কবরগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায় ও। চারদিক তোলপাড় করে ওঠে। হালিম মিয়ার স্মৃতির স্মরণে এবার তুফান ওঠে। নিজেকেই বলে, আমিতো দেখেছি বঙ্গবন্ধু, আপনি পায়ে হেঁটে এক ইউনিয়ন থেকে আর এক ইউনিয়নে যেতেন। হাঁটায় আপনি হয়রান হতেন না। কারণ গ্রামের পথে পথে আপনাকে অনেক জায়গায় বসতে হতো। পান খেতে হতো। টাকা নিতে হতো। আপনি না চাইলেও লোকে আপনাকে যেচে ইলেকশনের খরচ দিত। মেয়েরা পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকতো আপনাকে এক নজর দেখার জন্য। আপনি কর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, এই ইলেকশনে নামার আগে আমি বুঝতাম না দেশের মানুষ আমাকে কত ভালোবাসে।

হায় বঙ্গবন্ধু, আপনি বেঈমানদের চিনতে পারেননি। ওদের বুকের মধ্যে ভালোবাসা নাই। ভালোবাসা থাকলে কি এই কবরের মাটি আমাকে খুঁড়তে হয়? আমিওতো একটা বেঈমান। খুনীদের কাজে হাত লাগিয়েছি। গ্রামের মানুষের কাছে আমি কেমন করে মুখ দেখাব? হায় আল্লাহ।

হালিম মিয়া দু'হাতে নিজের চুল ধরে কবরস্থানের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। প্রবল পাগলামি ওর মগজের মধ্যে ঘূর্ণির মতো ঘুরছে। ও কিছুতেই নিজের মেয়েটির মুখ মনে করতে পারে না। ওর যে দুটি ছেলে আছে সে কথাও বেমালুম ভুলে যায়।

কবরস্থানের উপর প্রখর রোদ ছড়িয়ে থাকে। হালিম মিয়া ভাবে, এত অন্ধকার কেন?

AMARBOI.COM

৫৬.

জবানবন্দি দেন নিহত পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানের পুত্র মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। পিতার মৃত্যুর সময় তিনি সাত বৎসরের বালক ছিলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্টের পিএস মহিতুল ইসলামের কাছ থেকে জানতে পারেন যে ঘটনার দিন সিদ্দিকুর রহমান ওই বাড়িতে ডিউটিতে ছিলেন। গোলাগুলির শব্দে শেখ কামাল উপর থেকে নীচে এসে দাঁড়ান। তিনি বলেন, আর্মি ও পুলিশ ভাই আপনারা আমার সাথে আসেন। তখনই কয়েকজন খাকী ও কালো পোশাকধারী আর্মির লোক অস্ত্রসহ তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ায়। এদের মধ্য থেকে মেজর বজলুল হুদা শেখ কামালের পায়ে গুলি করে। তারপরে ব্রাস ফায়ার করে। শেখ কামাল পড়ে যান। একটি গুলি মহিতুল ইসলামের হাঁটুতে লাগে। আর একটি গুলি ডিএসপি নুরুল ইসলামের পায়ে লাগে। তিনি মহিতুল ইসলামকে টেনে তার রুমে নিয়ে যান। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুমে গিয়ে দেখা যায় পুলিশের এসবি-র অফিসার সিদ্দিকুর রহমান সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। বজলুল হুদা তার অস্ত্রধারী সঙ্গীদের সহায়তায় সবাইকে লাইনে দাঁড় করায়। মহিতুল ইসলামের পাশেই ছিলেন সিদ্দিকুর রহমান। একজন অস্ত্রধারী সৈনিক সরাসরি সিদ্দিকুর রহমানকে গুলি করে। তিনি পড়ে যান। মোস্তাফিজুর রহমানের বুকের ভেতরে এখনও প্রশ্ন, আমার বাবাতো একজন চাকুরিরত অফিসার ছিলেন। শুনেছি তিনি ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁর হাতের রিভলবার তাঁর পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, কত অনায়াসে মেরে ফেলা যায় মানুষকে!

31. Md. Mustafizur Rahman.
P. W. -31

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং-৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ২৯ বয়স্ক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান-র জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত জনাব কাজী গোলাম রসুল, দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৭/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নামঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বয়স ২৯ বছর, আমার পিতার নাম : মৃত সিদ্দিকুর রহমান, আমি জাতিতে মুসলমান, গ্রাম : জুমর, থানা : বুড়িচং, জেলা : কুমিল্লা।

বর্তমান ঠিকানা– সেকশন ব্লক– জি, এভিনিউ ২/২, মিরপুর, ঢাকা।

আমার পিতা মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, পুলিশ বিভাগের এস. আই. ছিলেন।

১৯৭৫ সনে এস. বি.-তে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৫ সনের আগস্ট মাসের ১৪/১৫ তারিখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডি ৩২ নং রোডস্থ নিজস্ব বাসভবনে ডিউটিরত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্ছৃংখল সদস্য আক্রমণ করিয়া বঙ্গবন্ধুসহ তাহার পরিবারবর্গ এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে আমার পিতাকে গুলি করিয়া হত্যা করে।

তখন আমার বয়স ছিল ৭ বৎসর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আমার পিতার লাশ জানাজা করার সময় আমি, আমার আম্মা এবং আমার ছোট ভাই মাহফুজুর রহমানকে খবর দিয়া আনিয়া আমার পিতার লাশ দেখায়।

অতঃপর পুলিশের তত্ত্বাবধানে আমার পিতার লাশ আমাদের মিরপুরস্থ বাসভবনের সামনে লইয়া যায়। পুনরায় পুলিশের তত্ত্বাবধানে মিরপুর ১নং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের গোরস্থানে আমার পিতার লাশ দাফন করা হয়।

১৯৯২ সনে সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখে আমার আম্মাও মারা যান। এই আমার জবানবন্দি।

বাবার মৃত্যুর সময় আমি বালক ছিলাম। আমি আস্তে আস্তে বড় হয়েছি। মৃত্যু-শোক বুঝে ওঠার আগেই মৃত্যু-শোকে ঢোকানো হয়েছিল আমাকে। বাবা যদি কোনো অসুখে মারা যেতেন তাহলে আমি নিজের আগুনে পুড়তাম না। আমি যত বড় হয়েছি তত নিজের আগুনে পুড়েছি। আজকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় জবানবন্দী দিতে দাঁড়িয়ে আমি স্বস্তি পেয়েছি। বাবার হত্যার বিচার কোনো দিন হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আমি অপেক্ষা করব। যেদিন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা হবে সেদিন থেকে শোকের আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা থেকে আমি রেহাই পাব। শুধু দুঃখ থাকবে আমার মায়ের জন্য। আমার মা বিচারের রায় শোনার জন্য বেঁচে থাকেননি।

AMARBOI.COM

৫৭.

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এখন এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে. খন্দকার :

48. Air vice-Martial (Rtd.) A. K. Khandaker.
P. W. -48

জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দাজি– ৬৭ বয়স্ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকার জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত জনাব কাজী গোলাম রসুল, দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৮ সালের ৩/২ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম: এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ. কে. খন্দকার, বয়স ৬৭ বছর, আমার পিতার নাম : মরহুম খন্দকার আঃ লতিফ, পুরাতন খেয়াঘাট রোড, পাবনা।

বর্তমান ঠিকানা– বাসা নং–৩, সোনারগাঁও জনপথ, সেক্টর– ৭, উত্তরা, ঢাকা।

আমি বাংলাদেশের প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান ছিলাম। ৭ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে আমাকে এই পদে নিযুক্ত করা হয়। আমি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে কোনো ফাইটার ট্রান্সপোর্ট প্লেন ছিল না। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে আমরা ১টি ফাইটার, ১টি ট্রান্সপোর্ট, ১টি হেলিকপ্টার স্কোয়াড্রন এবং একটি হাই লুকিং ও একটি লো-লুকিং রাডার স্কোয়াড্রন এবং চারটি প্লেন তৈরি করিতে সক্ষম হই।

১৪ই আগস্ট ১৯৭৫ ভোর বেলায় জেনারেল শফিউল্লাহ আমাকে ফোন করিয়া বলেন, শুনেছেন বঙ্গবন্ধু assasinated হয়েছেন। আমি হতবাক হইয়া যাই এবং জিজ্ঞেস করি, are you sure? তিনি বলেন, হাঁ। আমি এখনই আসছি বলিয়া টেলিফোন রাখিয়া দেই। অতঃপর কেবল একটি প্যান্ট ও শার্ট পরিয়া পায়ে হাঁটিয়া জেনারেল শফিউল্লাহর বাসায় যাই। সেখানে শফিউল্লাহ ছাড়া জেনারেল জিয়াকে ইউনিফরম পরা অবস্থায় দেখি। ২/১ মিনিটের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ আমার মতই casual dress পরিয়া সেখানে উপস্থিত হন। তাৎক্ষণিক আলোচনায় জানিতে পারিলাম যে, মাত্র কয়েকটি আর্মি অফিসার দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। আমি খুবই বিমর্ষ বোধ করিয়াছিলাম। জেনারেল শফিউল্লাহও সেই রকম বিমর্ষ ছিল।

আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইল এইটি যেন সশস্ত্র বাহিনীতে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে এবং strict discipline must be maintained in the services.

ইহার পরে আমি বাসায় আসিয়া ইউনিফরম পরিয়া এয়ার হেড কোয়ার্টারে আসি এবং এয়ার ফোর্সের সিনিয়র অফিসারদেরকে ডাকিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এয়ার ফোর্সে সম্পূর্ণ শৃংখলা বজায় রাখার নির্দেশ দেই।

আমি সকাল ৮-৩০/৯-০০ টার মধ্যে জেনারেল শফিউল্লার নিকট হইতে টেলিফোন পাই। তিনি আমাকে ৪৬ ব্রিগেডের একটি অফিসে তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য বলেন। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল।

আমি সেখানে গিয়া মেজর ডালিম এবং মেজর রশীদকে সশস্ত্র অবস্থায় দেখি। সেখানে তাহাদের সাথে কালো এবং খাকী পোশাক পরা আরো কিছু সৈনিককে সশস্ত্র অবস্থায় দেখি। সেখানে সম্পূর্ণ indiscipline এবং chaotic অবস্থা বিরাজ করিতেছিল।

এর আগেই জেনারেল শফিউল্লাহকে জোর করিয়া রেডিও স্টেশনে যাইতে রাজি করানো হইয়াছিল। সেখানে নেভী চীফও উপস্থিত ছিলেন। যে কয়েকটি আর্মি অফিসার সৈনিক সশস্ত্র অবস্থায় ছিল তাহাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনই were on the edge of irrationally and tension.

সামান্যতম conformation কিংবা disaffirement could have led to spice killed. Under the circumstances I was forced to go radio station and so was Admiral Khan.

একটি জিপে করিয়া মেজর রশীদ এবং ডালিম জেনারেল শাফিউল্লাহকে এসকট করিয়া নিয়া রেডিও স্টেশনের দিকে লইয়া যাইতেছিল। আমরাও পিছনে পিছনে রেডিও স্টেশনে যাই। আমাদের পিছনেও সশস্ত্র আর্মির গাড়ি ছিল।

রেডিও স্টেশনে গেলে আমাদেরকে যে ঘরে লইয়া যায় সেই ঘরে খন্দকার মোশতাক এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে বসা দেখি। সেখানে মেজর নূর, মেজর ডালিম, মেজর রশীদ, মেজর ফারুক এবং মেজর শাহরিয়ারকেও দেখি। কে একজন বলিল তিন বাহিনী প্রধানকে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হইবে। এই আনুগত্য পত্রটি তাহেরউদ্দিন ঠাকুর আমাদের সামনে লিখেন এবং এই আনুগত্য পত্রটি আমাদের পড়িতে দেওয়া হয়। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আনুগত্যপত্র পড়িতে বাধ্য হই।

তারপর রেডিও কর্মচারীগণ আমাদের কণ্ঠে পড়া আনুগত্য ঘোষণাটি রেকর্ড করে।

তারপর একইভাবে আবার উপরোল্লিখিত আর্মি অফিসারগণ আমাদেকে এসকট করিয়া বঙ্গভবনে লইয়া যায়। পরে আমাদের পিছনে খন্দকার মোশতাক এবং তাহেরউদ্দিন ঠাকুরও আসেন।

দুপুরের কিছু আগে খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গভবনে শপথ গ্রহণ করে।

সেখানে যেসব আর্মি অফিসার রেডিও স্টেশনে ছিল তাহারা এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। বিকালে মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানেও উল্লিখিত আর্মি অফিসারগণ উপস্থিত ছিল।

সেখানে প্রথম সারিতে বসা মেজর রশীদের পাশে তাহার স্ত্রীকেও দেখি। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে আর কোনো মহিলাকে দেখি নাই।

বিভিন্ন আলোচনা এবং মিটিংয়ের অজুহাতে আমাদেরকে বঙ্গভবনে আটকাইয়া রাখা হয়। এই সমস্ত কিছু লক্ষ করিয়া আমি বিবেক পীড়িত হইয়া সিদ্ধান্ত নেই যে, এই অন্যায় এবং ষড়যন্ত্রমূলক প্রক্রিয়ার সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ১৭ই আগস্ট সকাল ১০-৩০ টায় কাহাকেও না বলিয়া আমি বঙ্গভবন হইতে চলিয়া আসি।

যখন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর লাশ তাঁর বাসভবনের সিঁড়িতে ছিল। লাশ দাফন পর্যন্ত তারা সময় ক্ষেপণ করেনি। মৃত্যুর শোক ও ক্ষমতা গ্রহণের উৎসব পাশাপাশি হতে পারে এমন এক অবিশ্বাস্য নিয়তির সামনে দাঁড়িয়েছে পুরো দেশ।

AMARBOI.COM

৫৮.

অনন্তকালের সময় স্তব্ধ হয়ে থাকে এই বাড়িতে।

রাত পেরিয়ে দিন হয়েছে।

দিনের আলো ছড়িয়েছে চারদিকে।

তারপর ইতিহাস বলছে সময় থমকে আছে। ইতিহাসের সাদা পৃষ্ঠা সোনালি অক্ষরে ভরে উঠবে এই বাড়ির সবটুকু নিয়ে।

এখানে এখন ক্ষণিক মুহূর্ত অনন্তকাল।

৫৯.

এই বাড়িতে তিনি একা।

কিন্তু তাঁর মনে হয় তিনি একা নন। বিশ্বের নানা মানুষের কণ্ঠস্বর এই বাড়ি সরগরম করে তুলেছে। স্বাধীনতার পরে নতুন দেশটিকে দেখতে এবং দেশটির স্বাধীনতায় নেতৃত্ব দানকারী মানুষটিকে দেখতে বিদেশের অনেক গণ্যমান্য মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন।

তাঁরা আজ এসেছেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর কফিনের চারপাশে ভিড় জমে উঠেছে।

মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। আপনার দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করা আমার কাছে এক নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রবাসী সরকার এবং মুক্তিবাহিনী এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল। তাদের সাহস, দৃঢ়তা এবং স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করার প্রতিজ্ঞা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। আমার দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল। মিত্রবাহিনীর অনেক সদস্য আপনার দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছিল। তাঁদেরও আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আপনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় দিল্লিতে বাহাত্তর সালের ১০ জানুয়ারি, আপনি ফিরছিলেন সদ্য স্বাধীন স্বদেশে। একজন রাজনৈতিক নেতার ব্যক্তিত্বে যেভাবে মানুষ মুগ্ধ হয়, আমিও সেভাবে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি বাহাত্তরের ১৭ মার্চ বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। আপনার পরিবারের সান্নিধ্যে আমি আনন্দদায়ক সময় কাটিয়েছিলাম। ভারত বাংলাদেশের পঁচিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেছিলাম। আপনার অনুরোধে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। আমি অনেককেই বলেছি, 'শেখ মুজিব ওয়াজ আ গ্রেট লিডার অ্যান্ড আ ভেরি ওয়ার্ম-হার্টেড হিউম্যান বিইং। ইট ওয়াজ আ প্রিভিলেজ টু কাউন্ট হিম অ্যাজ আ ফ্রেন্ড।'

আজ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনি জানেন আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবস। তারপরও না এসে পারিনি। ভারতের সব ফুল নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। আমি ভারতের জনগণের পক্ষ থেকে আপনার কফিনে ফুলের ডালা রেখে যাচ্ছি।

মি. প্রাইম মিনিস্টার আমি লিয়েনেভ ব্রেজনেভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি প্রধান। আপনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে আমার দেশ আপনাদের বন্ধু ছিল। সবরকম সহযোগিতা দিয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ক্রেমলিনে আমরা বৈঠক করেছিলাম। আপনার চিন্তা, রাজনৈতিক দর্শন, সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের অঙ্গীকার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এমন রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন তা আমি সেদিন গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুর্ভাগ্য যে দেশ তার মহান নেতাকে হারালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার জন্য শোক নিবেদন করার ভাষা আমার নেই। আমার দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের সব ফুল নিয়ে এসেছি আপনার জন্য। আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

বঙ্গবন্ধু, আমি কবি সুফিয়া কামাল। ধানমন্ডির একই রাস্তায় আপনার বাড়ির কয়েকটি বাড়ি পরে আমার বাড়ি। অসংখ্যবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কিন্তু আমি বেশি করে মনে রেখেছি সেদিনের কথা, যেদিন আমি গণভবনে আপনার অফিসে গিয়েছিলাম। আমাকে কেন্দ্রীয় মহিলা পুনর্বাসন সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সভাপ্রধান করা হয়েছিল। আমি যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশে নির্যাতিত নারীদের জন্য ওই সংস্থার পক্ষে কাজ করছিলাম আরো অনেকের সঙ্গে। মাদার তেরেসা এসেছিলেন ঢাকায়। নির্যাতিত নারীদের জন্য করণীয় বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে জানার জন্য মালেকা খানকে পাঠিয়েছিলাম। মাদার তেরেসা বলেছিলেন, অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাতে। আরও বলেছিলেন যুদ্ধ শিশুদের কোনো অপরাধ নেই। ওদের ভালোভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিতে হবে। ওদেরকে ভালোবাসা দিতে হবে। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা মানব সন্তানকে পরম আদরে লালন-পালন করতে চায়। তোমাদের অনেক সমস্যা। সব সমস্যা একসঙ্গে মোকাবেলা করা যায় না। তোমরা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে সমস্যা ভাগ করে তার সমাধান করো। মাদার তেরেসার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। আপনাকে গর্ভপাত আইন ও আন্তর্জাতিক শিশু দত্তক আইন প্রণয়নের বিষয়টি জানিয়েছিলাম। আপনি আমার কথায় একমত হন। অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তারপর দুটি আইন প্রবর্তিত হয়। বঙ্গবন্ধু, সদ্য স্বাধীন দেশে নির্যাতিত নারীদের প্রতি আপনি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। সেইসব দিনের কথা ভেবে এখনো আমার চোখে পানি আসে।

"৭২ থেকেই জাতির সকলের কাছে আবেদন রাখছি এই বলে যে, ঘোষণা দিন ওরা 'মুক্তিযোদ্ধা'। যারা জীবনের সবচেয়ে দামি, সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ নিজের সম্ভ্রম দিতে বাধ্য হলো দেশের স্বাধীনতার জন্য, একটি মানচিত্র উপহার দেয়ার জন্য, তাদের একটিই পরিচয় হোক, ওরা মুক্তিযোদ্ধা। তাতে হয়তো তাদের কাছে জাতির ঋণ সামান্যই শোধ হবে। তবে তাতে হয়তো তারা আর লুকিয়ে চোখের জল মুছবে না। গর্বিত পদভরে একদিন তারা মাথা উঁচু করে সামনে এসে দাঁড়াবে।" বাস্তবে এ কাজটি হয়নি।

বঙ্গবন্ধু আমি আপনাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে শুধু ফুল নয়, আমার লেখা কবিতার দু'টো লাইন দিয়ে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বাংলার আকাশ-বাতাস, সাগর-গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু, ফিরিয়া আসিতে যদি।

মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি হল্যান্ডের সাংবাদিক আর. এইচ. সিজার। আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে আমি সাদা টিউলিপ নিয়ে এসেছি। বাহাত্তর সালের অক্টোবর মাসে আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম। আপনার ব্যক্তিত্ব-সান্নিধ্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। দেশ নিয়ে আপনার স্বপ্নের কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি আপনার মৃত্যু শেষ কথা নয়। আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবে আগামী দিনের বাংলাদেশের মানুষ।

মি. প্রাইম মিনিস্টার আমি ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেন। আপনার অফিসে আমি বেশ কয়েকবার গিয়েছি। আপনি মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা বারবারই স্মরণ করতেন। আপনি বাহাত্তর সালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে পঁচিশ বছর মেয়াদী মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। আমি আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশের শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করি। আমি আপনাকে নীলপদ্ম দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আপনার আত্মা শান্তিতে থাকুক।

মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি এডওয়ার্ড কেনেডি। আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ডেমোক্রেট দলের সদস্য ছিলাম। সে সময়ের রিপাবলিকান সরকার আপনাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানায়নি। আমার মতো আমেরিকাবাসী আপনাদের মুক্তিযুদ্ধকে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছিল। আমি সেজন্য আমার দেশের গণমানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। স্বাধীনতার পরে বাহাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি ঢাকায় এসেছিলাম। আমি জানি ফেব্রুয়ারি আপনাদের ভাষার মাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিংয়ের সামনে একটি বটগাছের চারা লাগানো আমার জীবনের একটি বড় ঘটনা। আমার স্মৃতির দেয়ালে তা গেঁথে আছে।

আমেরিকাবাসীর পক্ষ থেকে আমি ফুল এনেছি। ওরা আমার দু'হাত সাদা রঙের ডগুড দিয়ে ভরে দিয়েছে। অন্যরা বলেছে শুধু সাদা কেন, আমরা রঙিন ফুলও দিতে চাই। অন্যরা আমার দু'হাত রঙ-বেরঙের এজেলিনা ফুল দিয়ে ভরে দিয়েছে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

আমরা এসেছি মি. প্রাইম মিনিস্টার। আমরা দুজন। আমি আনোয়ার সাদাত। মিশরের প্রেসিডেন্ট। আমি হুয়ারী বুমেদীন আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট। প্রথমবার আমরা এসেছিলাম রাষ্ট্রের প্রটোকলের সকল নিয়ম ভেঙে। যে নিয়ম পালন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দেশের অতিথি হতে হয় আমরা সে নিয়ম পালন করিনি। মধ্যরাতে আমরা ঢাকার তেজগাঁ বিমাবন্দরে এসে পৌঁছেছিলাম। আপনি স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রধান। আপনি তেইশ বছর ধরে একটি জাতিকে অধিকারের লড়াইয়ের কথা শুনিয়েছেন। অসংখ্যবার জেল খেটেছেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে গণমানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আমরা আপনার সংগ্রামের কথা শুনেছিলাম। তাই আপনাকে দেখার ইচ্ছা আমরা সম্বরণ করতে পারিনি। আপনাকে দেখে এবং কথা বলে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। আমরা জানতে চেয়েছিলাম, আপনি কি করে এতকিছু সম্ভব করলেন? আপনি বলেছিলেন, মানুষকে ভালোবাসা দিলে মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা পাওয়া যায়। মানুষকে তার অধিকারের কথা বোঝালে মানুষ সে অধিকার আদায়ের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত হয়। আমরা সেদিন আপনার দিকে তাকিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম। সময় কি করে কেটে গেছে তা আমরা টের পাইনি।

আজ আমরা আপনাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। আপনার কফিনে আমরা লাল গোলাপ রেখে গেলাম, প্রিয় প্রাইম মিনিস্টার।

মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি যোশেফ ব্রোজ টিটো। যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আপনার আন্তরিক আপ্যায়ন আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ছোট দেশগুলোর মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম। আপনাকে দেখে আমি গৌরব বোধ করেছি। ছোট দেশগুলোর মুক্তির সংগ্রাম একদিন সফল হবে। আপনার স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে। এবার দরকার দেশ গঠন এবং অর্থনৈতিক মুক্তি। আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে জানাবেন। আমি আপনাকে সব ধরনের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হবে। আপনার অমলিন হাসিতে ছিল আত্মপ্রত্যয়ের আস্থা। আর আপনার কণ্ঠস্বরে ছিল গভীর আত্মবিশ্বাস। আমি বুঝেছিলাম আপনার নেতৃত্বের সৌন্দর্য। সেদিন আমি আপনাকে আমার অভিবাদন জানিয়ে এসেছিলাম। আপনার উষ্ণ করমর্দন আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে আছে।

আজ এসেছি আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আপনার কফিনের উপর আমি সাদা গোলাপ রেখে যাচ্ছি বন্ধু। আমার বিশ্বাস আপনার দুঃখী মানুষেরা আপনার এই স্বপ্নের দেশকে গড়ে তুলবে। বিদায়।

মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গাউ হুইটলাম। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। যে কোনো রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে। তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আপনার কাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেরণা উপলব্ধি করতে চেয়েছি। আমি জেনেছি আমার দেশের একজন নাগরিক আপনাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আপনারা তাকে সাহসের জন্য মর্যাদাপূর্ণ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। আমার দেশের মানুষের এই সাহসী কাজ আমি নিজের দেশের জন্য গৌরবের মনে করি। আপনার মতো সাহসী নেতাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

আপনাকে আমি নানা রঙের গোলাপ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি মোহাম্মদ দাউদ। আফগানিস্থানের প্রেসিডেন্ট। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম। আপনাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন আপনাদের সহযোগিতা দিয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদে আপনাদের পক্ষে ভেটো দিয়েছিল। আমরাও আপনাদের পাশে ছিলাম। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার খুবই ভালো লেগেছিল। আমার সম্মানে দেয়া রাষ্ট্রীয় নৈশভোজের অনুষ্ঠানটি খুব আনন্দদায়ক ছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিও চমৎকার ছিল।

আপনাকে সাদা গোলাপ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

আমি গ্যারী ব্লাক। 'বাল্টিমোরস্তার' পত্রিকার সম্পাদক। আপনার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলাম। বাহাত্তর সালের অক্টোবর মাসে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি গড়ে তোলা বিষয়ে আপনার পরিকল্পনার কথা জানতে চেয়েছিলাম। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা বিষয়ে আপনার আবেগ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আপনি বলেছিলেন, সরকারি কাজে আপনি বাংলাভাষা প্রবর্তন করেছেন। আজ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

আমি খুশবন্ত সিং। ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া পত্রিকার সম্পাদক। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আপনি আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমার 'A Train to Pakistan' বইটি পড়েছেন। বলেছিলেন, দেশভাগের সময়ের দাঙ্গার কথা। বলেছিলেন, আমার বইটি হিউম্যান ট্র্যাজেডির উপাখ্যান। আরও বলেছিলেন, আপনি নিজে ছেচল্লিশের দাঙ্গা দেখেছিলেন। দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেছিলেন।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনি নিজেও জানেন মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা নয়।

আমি এস. এম. কান্দিল। ইরানের 'ইত্তেলাট' পত্রিকার পক্ষ থেকে এসেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুয়াত্তরে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সে বিষয়ে জানতে। আপনি দুর্ভিক্ষ-আক্রান্ত মানুষের কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। নানা কারণে দুর্ভিক্ষ রোধে ভালো পদক্ষেপ নেয়া যায়নি সেসব কথা বলেছিলেন। আপনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথাও বলেছিলেন। আমেরিকার ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন। দেশের ভেতরে আপনার বিপক্ষে থাকা লোকদের কথা বলেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল নানামুখী ধারণা দিয়ে আপনি দুর্ভিক্ষের দায়ভার বুঝতে চেয়েছিলেন। আপনাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

আমি জন বিলজার। লন্ডনের ডেইলি মিরর পত্রিকার পক্ষ থেকে এসেছিলাম। পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আপনি যখন হিথ্রো বিমানবন্দর হয়ে দেশে ফিরছিলেন তখন আমি আপনাকে দেখেছিলাম। আমি আপনার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিলাম চুয়াত্তরের ডিসেম্বর মাসে। আপনি তিন বৎসর সরকার পরিচালনা করেছেন সে বিষয়ে কথা বলার সময় নানা প্রসঙ্গ এনেছিলেন। খুব অল্প সময়ে জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন, সেকথা বলেছিলেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশের ভৌত কাঠামো নির্মাণের কথা বলেছিলেন। পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের কথা বলেছিলেন। কয়েক হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণের কথা বলেছিলেন। দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনেছিলেন কাজ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার কথা বলেছিলেন। দুর্ভিক্ষে আপনি ঠিকমতো আপনার দুঃখী মানুষকে খাবার দিতে পারেননি সেকথা বলেছিলেন। সে সময়ে আপনাকে খুব ক্লান্ত এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। কখনো আপনি উৎফুল্ল ছিলেন, কখনো বিষণ্ন। কখনো কোনো কিছুর চিন্তায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার জন্য ম্যাগনোলিয়া ফুল এনেছি মি. প্রেসিডেন্ট।

মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার সঙ্গে আমার সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছিল আপনাদের বঙ্গভবনে। সেখানে আপনি একটি নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমি ভূটানের রাজা জিগমে সিঙ্গে ওয়াংচুককে। আপনি আমার প্রতি এই বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতের পরে ভূটান পৃথিবীর দ্বিতীয় রাষ্ট্র যে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আপনার আতিথেয়তার কথা স্মরণ করে আজ আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত।

আমি আপনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি। আপনার কফিনে আমি সাদা গোলাপের গুচ্ছ রেখে যাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. প্রেসিডেন্ট আমি ড. এঞ্জেল ফেরাস মোরেনো। কিউবার রাষ্ট্রদূত। আমি খুব গর্বিত যে কিউবা ল্যাটিন আমেরিকার প্রথম দেশ যে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আমি আপনাকে আমার পরিচয়পত্র প্রদান করতে পেরে গর্বিত ছিলাম। আজ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার জন্য সুবাসিত ফুল এনেছি। এ ফুলের সৌরভ মরদেহ সমাহিত করার সময় সবাইকে আচ্ছন্ন করবে। আমি আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি প্রার্থনা করছি।

মি. প্রেসিডেন্ট আমি কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম। ১৯৭৩ সালে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আমি আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম। সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে তখন আমি বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণের বিষয়টি দেখছিলাম। আপনার সাথে কথা বলে আমি প্রীত হই। বুঝেছিলাম আপনি কত বড় মাপের নেতা। মি. প্রেসিডেন্ট নেতৃত্ব কঠিন, যদি তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন না করা যায়। আপনার রাজনৈতিক জীবন সার্থক। আপনি একটি জাতিকে স্বাধীন দেশ অর্জনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল। স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। আপনি সেদিন জাতিসংঘে নিজ মাতৃভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। আমরা ভাষণের অনুবাদ কপি পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম নিজ জাতিসত্তা, নিজ মাতৃভাষার প্রতি আপনি কত শ্রদ্ধাশীল।

আজ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার জন্য আমি রডডেনড্রনের গুচ্ছ এনেছি। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার কফিন ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে। এখনো অনেকে লাইনে আছে। কফিনের কাঠ আর দেখা যাবে না। ওটা ফুলে-ভরা কফিন হবে।

আপনাকে জানাই শ্রদ্ধা।

আমরা মালয়েশিয়ার রাজা ও রাণী মি. প্রেসিডেন্ট। আপনার সঙ্গে আমাদের সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হয়েছিল। আপনি আমাদের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমরাও আপনার সম্মানে নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলাম। ডিসেম্বর মাসে মনোরম ছিল ঢাকার আবহাওয়া। সেইসঙ্গে আরও মধুর হয়ে উঠেছিল আন্তরিক আতিথেয়তা। আমাদের জন্য দারুণ স্মৃতি ছিল ঢাকা।

আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা জানাই। আপনার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মি. প্রেসিডেন্ট আমি আঁদ্রে ফোমিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি সরিন চাক, কম্বোডিয়ার বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আমি রবার্ট ডাব্লু ম্যাকলারেন, কানাডার হাইকমিশনার। মি. প্রেসিডেন্ট, আমি ডব্লু শেরেক, ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি এ. এ. গোল্ডস। যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার। মি. প্রেসিডেন্ট আমি চান ওয়াক পাক। রিপাবলিকান কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট, আমি লক্ষণ জায়াকার্ড। শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী। মি. প্রেসিডেন্ট আমি রিটা ওরো। ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি ড. বাবাকার জিওপ। সেনেগালের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট, আমি থিরি পিয়াঁচি সিথো ঔ মং মং। বার্মার রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি বিগনিউ বিজিওস্কি। পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি এটিনি সূতার। সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি লুডোভিকা বারতিয়ারী ডি সানপেট্রো। ইটালির রাষ্ট্রদূত। মি. প্রেসিডেন্ট আমি ড. কলিন ক্যাম্পবেল আইতম্যান, নিউজিল্যান্ডের হাইকমিশনার।

আমরা সবাই আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমাদের ফুলের সৌরভ আপনার টুঙ্গিপাড়ার মানুষকে স্মরণ করাবে যে তাদের জন্য আপনার ভালোবাসা কতটা গভীর ছিল।

মি. প্রেসিডেন্ট আমি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডেভিড ইউজিন বোস্টার। আমি পঁচাত্তর সালের পাঁচ আগস্ট সকাল দশটায় আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি আপনার অফিসে। মাত্র দশ দিন পরে এই নৃশংস হত্যাকান্ড আমাকে মর্মাহত করে। আমি আমার দাপ্তরিক কাজের দায়িত্ব হিসেবে ওয়াশিংটনে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বরাবর তারবার্তা পাঠাই। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লি, ইসলামাবাদ, কাঠমুন্ডু ও কলকাতায় আমার বার্তার অনুলিপি পাঠাই। আমি জানিয়েছিলাম যে, শেখ মুজিবুর রহমান সরকারকে সেনাবাহিনী উৎখাত করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রেডিও থেকে একজন মেজরের কণ্ঠে ধারণ করা টেপ বাজানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

আজ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

মি. প্রেসিডেন্ট, আমি ডেনমার্কের যুবরাজ হেনড্রিক। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল চুয়াত্তর সালের এগারো ডিসেম্বর। চমৎকার দিন ছিল। আমার মনে হয়েছিল আপনার হাসির মতো দিনের আলো ছড়িয়ে আছে। আপনি হাসতে হাসতে ফান করেছিলেন আমার সঙ্গে। বলেছিলেন, যুবরাজ তুমি কি সেই হ্যামলেট যাকে বিশ্বখ্যাত নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ার ডেনমার্কে খুঁজে পেয়েছিলেন? যে আজ তার নাটকে বিশ্বখ্যাত? সেদিন আমি হা-হা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসেছিলাম। কোনো ভিন্ন দেশের আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় বৈঠকে ওটা ছিল আমার একমাত্র প্রাণখোলা হাসি। আজ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। ভালোবাসার শ্রদ্ধা। আমি কখনোই আপনাকে ভুলবো না।

মি. প্রেসিডেন্ট, আমি জাপানের যুবরাজ আকিহিতো। সঙ্গে আছে আমার স্ত্রী মিকিচো। পঁচাত্তরের ফেব্রুয়ারি মাসে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। বিকেলের শেষ আলো ছড়িয়েছিল আপনার অফিসের প্রাঙ্গণে। স্নিগ্ধ-মনোরম পরিবেশে আপনার আতিথেয়তায় আপনার উষ্ণ সান্নিধ্যে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। কি যে চমৎকার সময় কাটিয়েছিলম ঢাকায়, তা ভুলবার নয়। আপনি জাপান সরকারের আমন্ত্রণে জাপান সফরে গিয়েছিলেন। সঙ্গে আপনার মেয়ে ও ছেলে ছিল। আমরা শুনেছি আপনার মেয়েটি দেশে নেই। ছেলেটিকে হত্যাকারীরা মেরে ফেলেছে। একটি শিশুকে এইভাবে হত্যা করা কোনো ধরণের নীতিবোধের মধ্যে পড়ে না। আমরা এই বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করছি।

আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। জাপানের চেরীফুল দিয়ে আপনার কফিন ঢেকে দিতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি এত ফুল দেয়ার জায়গা নেই। আমাদের আগে অনেকে এসেছেন। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে কফিন। তারপরও আমরা সিঁড়িজুড়ে চেরীফুল ছড়িয়ে দিয়ে গেলাম।

মি. প্রেসিডেন্ট, আমি হেনরি কিসিঞ্জার, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। চুয়াত্তরের ৩০ অক্টোবর আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দেয়নি। তারপরও আপনি আমার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করেছেন। আপনি বিষয়টি জানতেন যে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের স্পেশাল এ্যাকশন গ্রুপের একটি বৈঠক হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর। বিষয় ছিল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিত। আমি ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেছিলাম। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আলেক্সি জনসন, আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক বাস্কেট-কেইস হতে পারে। আমি বলেছিলাম, ... it will not necessarily be our basket case. আমার স্মৃতিতে অনেক সঞ্চয় আছে। সেদিন আপনি বলেছিলেন, আমার দেশকে আপনারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলেছিলেন। আমি এই রিউমারের কথা জানতাম। পাশাপাশি এটাও বুঝেছিলাম যে একজন সরকার প্রধানের পক্ষে এমন উক্তি মেনে নেয়া কঠিন। তারপরও আপনার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতে আমি খুশি হয়েছিলাম। আলাপের এক পর্যায়ে আপনাকে আপনার দেশের কিছু সংখ্যক সেনা সদস্যের অসন্তোষের বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম। সেদিন দেখেছিলাম দেশবাসীর উপর আপনার গভীর আস্থা। আপনি বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ কেউ করবে না। তারপরও মানুষের প্রতি আপনার অবিশ্বাস্য ভালোবাসার কথা শুনে আমি বিচলিত বোধ করেছিলাম। কারণ সেনা সদস্যদের সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নানাভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যা আমরা জানতে পেরেছিলাম।

আজ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। লাল গোলাপে ভরে দিচ্ছি আপনার কফিন।

প্রিয় মুজিব, এলাম আপনাকে দেখতে। আপনি আপনার স্বপ্নের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। আর আমি জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। সদলবলে এসেছি। ওরা সবাই চেয়েছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। আমি নিশ্চয় এতদিনে আপনার কাছে এক অপরিচিত মুখ হয়ে যাইনি। সেদিন আপনি হা-হা করে হেসেছিলেন। আপনার পরিচিত টোবাকো এবং পাইপ আপনার হাতের কাছে ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে দেখা আপনাকে সেই আগের মতোই দেখেছিলাম সেদিন। আপনার আপোষহীন নেতৃত্বের কথা আমি এখনো ভাবি। আপনি আপনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আমার রাজনৈতিক ধারণায় পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে 'মুসলিম বেঙ্গল'-এর স্বপ্ন ছিল। কিন্তু আমার ধারণার 'মুসলিম বেঙ্গল' সত্যিই বাংলাদেশ হয়েছে। ধন্য আপনি। আপনার চেনা চেহারা আজ আমার কাছে উদ্দীপনা দীপ্ত। আবার কবে দেখা হবে জানি না, তবে একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, একদিন হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে এক বৈঠকে আমি বলেছিলাম বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য দুটো। একটি দারিদ্র্য, অন্যটি মহাকাব্য। আপনি মহাকাব্য দিয়েছেন। তবে সাধারণ মানুষের দারিদ্র কাটেনি। তবে এটাও সত্যি যে উন্নয়নশীল দেশের জন্য এটা বিস্ময়ের কিছু না। আপনি বিষণ্ন হয়েছিলেন।

আজ আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। আপনার কফিনে রেখে যাচ্ছি লাল গোলাপ।

মি. প্রেসিডেন্ট, আমি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আপনি যখন লন্ডনে এলেন তখন প্রথম দেখাতেই আপনাকে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছিল আমার। আমার মনে হয়েছিল আপনার সামনে আমি শ্রদ্ধায় নতজানু হই। আপনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে যে কথা হয়েছিল তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। উন্নয়নশীল দেশের নেতার যে স্বপ্ন থাকে দেশ ও দেশবাসীকে নিয়ে আপনি তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। আমি আপনাকে বন্ধু মনে করেছিলাম। আজ আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি। আপনি বিশ্বের একশ ত্রিশটি দেশের স্বীকৃতি পেয়েছেন। এত অল্প সময়ে এই স্বীকৃতি লাভ একটি বড় মাপের কাজ নিঃসন্দেহে। আমি বুকের ভেতর থেকে মনে করি, আপনার মৃত্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের জন্য ন্যাশনাল ট্র্যাজেডি, কিন্তু আমার জন্য পারসোনাল ট্র্যাজেডি। আমার দেশের সব রকম ফুল দিয়ে আপনার কফিন ভরে দিচ্ছি।

আমরা দুজন আপনাকে কখনো দেখিনি মহামান্য প্রেসিডেন্ট। আমরা আপনার দেশের মুক্তিযুদ্ধে শরনার্থীদের সাহায্যার্থে নিউইয়র্ক শহরে কনসার্টের আয়োজন করেছিলাম। আমরা এসেছি আপনার হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় যেতে। সঙ্গীতের সুরে উড়িয়ে দেব ঘাতকদের আয়োজন। ওরা বিস্ময়ে ভাববে, আমরা কি তাহলে তাকে হত্যা করতে পারিনি!

আমি রবিশঙ্কর। আমি জর্জ হ্যারিসন।

আপনি এখন শুনুন সেই বিখ্যাত সঙ্গীত– বাংলাদেশ– বাংলাদেশ–

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আমি কবি মীর গুল খান নাসির। আমি বেলুচিস্তানের কবি। আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলি। কবিতা লিখি। তাই পাকিস্তানি শাসকদের হাতে নির্যাতিত হই। জেল খাটি। এতে আমার কষ্ট নেই। আমি জানি বড় অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হয়।

আপনার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকার্ত। আমি মনে করি এটি একটি অবিনাশী মৃত্যু। আপনাদের মতো নেতাদের মৃত্যু নাই। আমার কবিতার নাম

"ভোর কোথায়"–

চিৎকার, কান্না আর তড়িৎ আহ্বানের মাঝে
উল্লাস করছে দৃষ্টিহীন জনতা।
ওরা এটাকে ভোর বলে, কিন্তু জীবনের দিকে তাকিয়ে
আমি দেখি অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার রাত্রি।
চমকানো বিদ্যুৎ আর বজ্রপাতে মনে হয় দূরে বৃষ্টি হচ্ছে,
কিন্তু বাতাসে বৃষ্টির কোনো ধ্বনি নেই।
বরং রক্তের প্রবল প্রবাহ বইছে।
হে নির্বোধের দল, কোথায় সুপ্রভাত?
এখনও এখানে ক্রোধান্বিত রাত
এজিদের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো গুঁড়িয়ে
দিচ্ছে সাহসী দেশপ্রেমিকের হাড়
জনবহুল, ছবির মতো বাংলাদেশে আবারও রক্তের স্রোত।
সাম্রাজ্যবাদের দালালেরা আবারও জ্বালিয়ে দিচ্ছে শহর-গ্রাম

মহান দেশপ্রেমিক মুজিব নিজ রক্তের সরোবরে শায়িত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণিত ক্রীতদাসেরা তাঁকে
রক্তের পোশাক পরিয়ে দিয়েছে এবং বিদ্ধ করেছে বুলেটে
এটা আবারও এজিদের বিরুদ্ধে হোসেনের কাহিনী।

হে সাহসী কমরেডরা, এজিদ থেকে সাবধান হও।
তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হও, তারা পরাজয় মানবে
যে মুখ দিয়ে তারা কথা বলে, সেটা তাদেরই
কিন্তু কথাগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের।
তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের পকেট মুদ্রায় পূর্ণ
সাহসী দেশপ্রেমিকদের শেষ করে দিতে
সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সহায়তা আসতেই থাকবে
তারা পাঠাবে ভাড়াটে লোক এবং হাতিয়ার
এই কাপুরুষদের হৃদয় দয়ামায়া হীন
ওদের কারণেই পৃথিবীতে এখন ঘোর অন্ধকার।
ওরা মুক্তির শিখা জ্বলতে দিতে চায় না
কোথাও জ্বলে উঠলে নিভিয়ে দেয় তা দ্রুত।

মুজিব, বাংলাদেশের নির্ভীক বন্ধু– বঙ্গবন্ধু,
ওদের হাতে সপরিবারে নিহত
আমরাও, স্বাধীনতার পতাকা অর্ধনমিত।

সাম্রাজ্যবাদীরা আবারও ফিরে গেছে তাদের
পুরনো চক্রান্তে, প্রতারণায়
আবারও বিরোধের সমঝোতা হচ্ছে বন্দুকের নলে
আবারও জ্বলছে আগুন সোনার জমিনে।

হে সাহসী বন্ধুরা, এভাবেই আমরা সময়ের মুখোমুখি,
একইভাবে আমার মাতৃভূমি বেলুচিস্থানও জ্বলছে
ভয় পেয়ো না হে সাহসী যোদ্ধারা, থেমে যেও না
যদিও সামনের পথ দুর্গম এবং কন্টকিত।

মুজিবের রক্ত কখনোই বৃথা যাবে না,
দেশপ্রেমিকের জন্য এ এক কঠিন পরীক্ষা।
এটা স্থায়ী হবে না, ভয়াবহ এই রাত দীর্ঘ হবে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকার এবং কুয়াশা থাকার পরেও।

নাসির তাঁর হৃদয় দিয়ে পরিষ্কার দেখতে পায়
বিজয়-পতাকা বাতাসে পতপত উড়ছে।

বঙ্গবন্ধু, আমি কবি শহীদ কাদরী। আপনার বাংলাদেশের কবি।

একটি কবিতা লিখেছি আপনার জন্য। আপনি বাংলার মানুষদের গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন। আপনি মনে করতেন বাংলার এমন কোনো মানুষ নেই যে আপনার গায়ে হাত দিতে পারে। এই সুগভীর বিশ্বাস থেকে আপনি অন্যদের কথা বিশ্বাস করেননি। প্রত্যেকের সতর্কবাণী হেসে থামিয়ে দিয়েছেন। আপনার পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দীন আহমেদ ১৫ আগস্টের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে আপনাকে সুইডেন থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার ক্লিপিং দেখিয়ে সেনাবাহিনীর অসন্তোষের কথা জানিয়েছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কথা বলেছিলেন। আপনি বলেছিলেন, ব্যাপারটি যেন শফিউল্লাহ দেখে। বঙ্গবন্ধু, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাও এ বিষয়ে ধারণা পেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশক্রমে মি. কাও চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে ঢাকায় এসেছিলেন। আপনার জীবন সংশয় বিষয়ে তিনি জানালে, আপনি বলেছিলেন ওরা আমার সন্তান। ওরা আমার কোনো ক্ষতি করবে না।

বঙ্গবন্ধু মানুষকে কি এত ভালোবাসতে হয়? আমি রাজনীতিবিদ নই, আমি কবি। কবির ভাবনা দিয়েও আমি এই ভালোবাসার তল খুঁজে পাই না। আমার কবিতার নাম

'হন্তারকদের প্রতি'–

বাঘ কিংবা ভালুকের মতো নয়,
বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা হাঙরের দল নয়
না, কোনো উপমায় তাদের গ্রেপ্তার করা যাবে না
তাদের পরনে ছিল ইউনিফর্ম
বুট, সৈনিকের টুপি,
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছিলো,
তারা ব্যবহার করেছিল
একেবারে খাঁটি বাঙালির মতো
বাংলা ভাষা। অস্বীকার করার উপায় নেই ওরা মানুষের মতো
দেখতে, এবং ওরা মানুষই
ওরা বাংলার মানুষ
এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো কথা আমি আর শুনবো না কোনোদিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬০.

বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় সমাহিত করার জন্য নির্দেশ আসে বঙ্গভবন থেকে।

কমোডর গোলাম রব্বানী তাঁর জবানবন্দিতে বলেন, আমি মূলত নেভী অফিসার। ১৯৭৫ সনে আমি নেভীতে লেফটেন্যান্ট ছিলাম। এই মামলার ঘটনার সময় আমি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন এডিসি ছিলাম। আমি ছাড়া আর্মির তৎকালীন ক্যাপ্টেন শরীফ আজিজ এবং এয়ার ফোর্সের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোশারফ হোসেনও তখন রাষ্ট্রপতির এডিসি ছিলেন।

আমরা বঙ্গভবনে থাকতাম। কিন্তু ডিউটি করার জন্য গণভবন ও বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নং রোডস্থ বাসভবনে যেতাম।

১৫ আগস্ট সকাল ৬টার সময় আমার সহকারী এডিসি ক্যাপ্টেন শরীফ আজিজ আমার রুমে এসে বলে যে, বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গোলাগুলি হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার মাশরুরুল হক তৎকালীন রাষ্ট্রপতির মিলিটারি সেক্রেটারি আমাদেরকে তাড়াতাড়ি বঙ্গভবনে যাবার জন্য নির্দেশ দেন। অনেকপরে হাইকমান্ডের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বঙ্গভবনে যাই। সেখানে যাবার পরে রাষ্ট্রপতির অফিসের রুমে রাষ্ট্রপতির চেয়ারে খন্দকার মোশতাক সাহেবকে বসা দেখি। সেখানে রুম বোঝাই আর্মি ও কিছু সিভিল অফিসারকে দেখি।

তাহাদের মধ্যে ইউনিফরমে মেজর খন্দকার আবদুর রশীদ, মেজর সৈয়দ ফারুক রহমান, মেজর শরীফুল হক ডালিম, মেজর সুলতান শাহরিয়ার, মেজর নূর, মেজর বজলুল হুদা, মেজর মহিউদ্দিন (ল্যান্সার), মেজর আজিজ পাশাসহ আরও অনেক উচ্চ এবং নিম্ন পদস্থ আর্মি অফিসার ছিলেন।

সেখানে তখন মন্ত্রীপরিষদের শপথ অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

যেহেতু আমাদের বঙ্গভবনের কাজ করার সুবাদে অভিজ্ঞতা ছিল, সে কারণে মন্ত্রীপরিষদের শপথ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব দেয়। সেই অনুযায়ী আমরা উক্ত দায়িত্ব পালন করি।

এরপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে গেরিলা ডিউটি অফিসার মেজর মহিউদ্দিনের (অর্ডিন্যান্স) তত্ত্বাবধানে হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়া পাঠানো হবে। হেলিকপ্টারের পাইলট থাকবেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শমসের আলী।

নির্দিষ্ট সময়ে একটি পিকআপে করে মেজর বজলুল হুদা বঙ্গবন্ধুর লাশ তেঁজগাঁ বিমানবন্দরে নিয়ে যায়।

এরপর একজন জে.সি.ও এবং আট-দশ জন সৈনিক বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আসে। তারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে তালা লাগায়। তারপরে তারা চলে যায়। জবানবন্দিতে এই কথা জানান হাবিলদার মোহাম্মদ কুদ্দুস সিকদার। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও জানান, ১৭ আগস্ট আনুমানিক সকাল দশটার সময় তাদের বদলি গার্ড আসে। তিনি তাদেরকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গণভবনে চলে যান।

৬১.

এটি এখন একটি পরিত্যক্ত বাড়ি।

পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়া বাড়িটি গল্পের চরিত্র হয়েছে। তাকেইতো তার কথা বলতে হবে। কারণ ইতিহাসের এক বিশাল অধ্যায়ের সাক্ষী এই বাড়ি।

বাড়ির লোহার গেট দিয়ে ঢুকলেই লন। ঘাস-বিছানো রাস্তার পরে গাড়ি-বারান্দা। তারপরে বারান্দা। প্রথমেই বসার ঘর। পাশের ঘরেই বঙ্গবন্ধুর পড়ার ঘর। আলমারিতে বই ঠাসা। মাঝখানে আর একটি ঘর আছে। করিডোর দিয়ে সামনে এগোলে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। বাড়ির পেছনেও দোতলায় ওঠার ছোট সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির পরে ডানদিকে একটি ঘর। তার সামনে ডাইনিং স্পেস। ডিমের আকারে একটি টেবিল আছে সেখানে। প্যাসেজের বাঁদিকেই বঙ্গবন্ধুর বেডরুম। সঙ্গে একটি ড্রেসিংরুম আছে। তারপাশে বাথরুম। এরপর একটি ঘর আছে। তার পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। স্টোর রুম দোতলায়। রান্নাঘর নিচতলায়। তিনতলায় আছে দু'টি রুম। বাড়ির পেছনের দিকে আছে গোয়ালঘর, কবুতরের খোপ, মুরগির খোপ। গ্যারেজের উপরে আছে কাজের লোকদের ঘর। আর বাড়ির চারদিকে খালি জায়গা আছে। ফুলের গাছ আছে। ফলের গাছও। সামনে রাস্তা। তার সামনে ধানমন্ডি লেক।

বাড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৬ সালে। সে বছরের মে মাসে ছয় দফা দাবি উত্থাপনের কারণে বঙ্গবন্ধুকে এই বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। এই বাড়ি থেকে তিনি অনেকবার গ্রেফতার হয়েছেন। জেলে থেকেছেন। ফিরে এসেছেন। আবার জেলে গিয়েছেন।

আন্দোলনের সময় এই বাড়ি এবং বাড়ির সামনের রাস্তা উত্তাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে বারবার। একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় অসংখ্য মিছিল এসে জমায়েত হতো এই বাড়ির সামনে। পঁচিশে মার্চের রাতে গাড়িভর্তি পাকিস্তান আর্মি এসেছিল এই বাড়িতে। সেই উত্তাল দিনগুলোতেও তিনি জীবনের ভয় করেননি। পালাবার চেষ্টা করেননি। ভেবেছিলেন পাকিস্তান আর্মির হাতে হবে মৃত্যু, নইলে গ্রেফতার। যাই হোক না কেন কোনো কিছুই তাঁর জীবনে শেষ কথা নয়।

সেদিন তিনি পার্টির নেতাদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি জানতেন যে কোনো ভয়াবহ কিছু ঘটতে পারে। তারপরও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো হিসেব করেছিলেন রাজনীতির। কি হতে পারে? তাঁর ভালোবাসার দেশবাসীকে সাহসী যোদ্ধা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর দায়ভার তাদের উপর চাপাতে চাননি।

স্বাধীনতার পরে একদল বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে সেদিনের কথা বলেছিলেন। কেন মৃত্যুর অপেক্ষায় তৈরি ছিলেন সেই বাড়িতে সে ব্যাখ্যা করেছেন। বলেছেন, একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে আমি একটি ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেছিলাম। পাকিস্তান আর্মি পরিকল্পনা করে রেখেছিল যে আমি বাড়ি থেকে বের হলেই তারা আমার গাড়িতে গ্রেনেড মারবে। তারপর প্রচার করবে, বাঙালি চরমপন্থী দলের লোকেরা আমার উপর হামলার কাজটি করেছে। আর এই অজুহাতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী বাঙালিকে শায়েস্তা করার সুযোগ নেবে। তারা সামরিক হামলা চালাবে। তিনি চাননি বাঙালির মৃত্যুর হোলিখেলায় পাকিস্তান সেনারা উল্লাস করুক।

তাই তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার চিন্তা করেননি। তারা যদি তাঁকে হত্যা করে তবে এই বাড়িতেই করুক। দেশবাসী এবং বিশ্বের মানুষ জানবে যে পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে হত্যা করেছে। এভাবে তাঁর রক্তে বিশুদ্ধ হবে তাঁরই স্বদেশ।

এভাবে এই বাড়িটি ইতিহাসের পাত্র হয়।

সেই ঝোড়ো দিনের শেষকালে যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান চলে যান তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে সামরিক বাহিনীর আক্রমণ সময়ের অপেক্ষা মাত্র। তিনি রেহানাকে বড় মেয়ে হাসিনার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের ছেড়ে যাবেনা বলে কাঁদছিল রেহানা। বড় ছেলে কামাল এই বাড়ির পেছনে একজন জাপানি কনস্যুলেটরের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। তৈরি হয়েছিল স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা।

এই বাড়িতে বসেই তিনি খবর পেয়েছিলেন যে সেনাবাহিনী আক্রমণ করার লক্ষ্যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবস্থান নিয়েছে।

তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন। গোপন ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রচারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা। তিনি জনগণকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন। সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যের কথা উচ্চারিত করেন। নেতার জন্য উদ্বিগ্ন না হতে নিষেধ করেন।

এইসব কথা ধ্বনিত হয় এই বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে। এভাবেই এ বাড়ি ইতিহাসের সাক্ষী।

এই ঘোষণার পরে যারা তার বাড়ির পাহারায় ছিলেন তাদের চলে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন। শহরের চারদিক থেকে তখন গোলার আওয়াজ ভেসে আসছে। ভেসে আসছিল মানুষের চিৎকার। হামলার তীব্রতা বাড়তে থাকে।

রাত একটা।

বাড়িতে তখন রেণু আর রাসেল বঙ্গবন্ধুর সামনে। জামালকে রেণু তার ঘরে ডেকে এনেছেন।

সেনারা এই বাড়ি লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া শুরু করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে ড্রেসিং রুমে পাঠিয়ে দেন। চারদিকে গোলার আঘাত। দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তাঁরা মেঝেতে বসে পড়েন।

একসময় গোলা ছোঁড়া বন্ধ করে পাকিস্তানি সেনারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে। দোতলায় উঠে আসে। তিনি ড্রেসিং রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বজ্রকণ্ঠে বলেন, গুলি থামাও। কেন গুলি করছ? আমাকে গুলি করতে চাইলে গুলি করো। আমি তোমাদের সামনে আছি। একদম তোমাদের মুখোমুখি। আমার দেশের মানুষের ওপর গুলি করবে না।

একজন মেজর গুলি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

তারপর বলে, আপনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে।

আমি এক মিনিট সময় চাই আমার পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার জন্য।

রেণু তখন কাঁদছিলেন। তাঁকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু। রেণু রাজী হননি। বলেছিলেন, তোমাকে একা রেখে আমি যাব না। রাসেলও আমার কাছে থাকবে। জামালও আছে ঘরে।

তিনি রেণুকে বললেন, ওরা আমাকে হত্যা করতে পারে। তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। ধরে নাও, হয়তো হবে না। মনে রেখো আমার দেশের মানুষ মুক্ত হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।

সেনারা তাঁর পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে নিচে নিয়ে যায়। নলের খোঁচা লাগছিল তাঁর পিঠে। তারপরও তাঁর মনে মৃত্যুভয় ছিল না। জিপে ওঠার আগে তিনি মেজরের দিকে তাকিয়ে বেপরোয়াভাবে বলেন, আমার তামাক ও পাইপ নিতে ভুলে গেছি। ওগুলো আমার চাই। পেতেই হবে।

সৈনিকরা একথা শুনে হকচকিয়ে যায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ কেমন সাহস একজন মানুষের! তারা তাঁকে আবার রাইফেলের নলের মুখে দোতলায় উঠিয়ে নিয়ে আসে।

রেণু তাঁর টোবাকোর কৌটা ও পাইপ তাঁকে দেন।

এভাবেই তাঁর কথা শুনেছিলেন সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ। তখন তাঁর ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের সামনে এক কাপ কফি ছিল। টোবাকো ও পাইপ ছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ তাঁর ইন্টারভিউ নিচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরও অনেকে। একদল বিদেশি সাংবাদিক। সিডনি তাঁর লেখার শিরোনাম দিয়েছিলেন, 'হি টেলস ফুল স্টোরি অব এ্যারেস্ট অ্যান্ড ডিটেনশন'।

বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া এই বাড়িতে কয়েক বছর কাটিয়েছেন রেণু। তখন এমন ভয়াবহ রাত তাঁর জীবনে আসেনি। ছেলেমেয়েরা সবাই ছিল। আত্মীয়স্বজন এসে থাকতেন। সেই রাতে নির্ঘুম কাটালেন তিনি। প্রায় ফাঁকা বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ির মতো নিস্তব্ধ।

পরদিন থেকে কারফিউ।

রাস্তায় লোক নেই। রিক্সা-গাড়ি নেই। বিচ্ছিন্ন গাড়ির শব্দ এই স্তব্ধ বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খায়। ধানমন্ডির লেকের উপর দিয়ে উড়ে আসা বাতাস বাড়ির দেয়াল ছুঁয়ে যায়। ছুঁয়ে যায় গাছের পাতা-ফুল-কবুতর।

দিনের এক প্রহর শেষ হতে না হতেই আবার এই বাড়ি আক্রমন করে পাকিস্তানি সেনারা। প্রচন্ড গোলাগুলির শব্দ ভেঙে ফেলে নিস্তব্ধতা। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার পরও রাগ পড়েনি তাদের। বাড়িটাও তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু।

এভাবে এই বাড়িটি একটি শব্দের চরিত্র। অজস্র কথা আছে তার গেইটে, সিঁড়িতে, বারান্দায়, ঘরে, দেয়ালে, লনে, গাছগাছালির পাতায় পাতায়।

যে বাড়িটি তাঁরা একটু একটু করে বানিয়েছিলেন, সেই বাড়িটি তাঁকে এভাবে ছাড়তে হয়েছিল। নিজ ভূমিতে পরবাসী হয়ে তিনি বন্দি জীবনে চলে গেলেন। আর তাঁর ছেলে এই বাড়ি থেকে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য চলে গিয়েছিলেন। বাড়ির পূর্ব দিকের এবং পশ্চিম দিকের বাড়িতে আসা যাওয়ার জন্য ছোট গেইট আছে। এই তিন বাড়ির সবাই এই গেট দিয়ে পরস্পরের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। তবে এই বাড়ির সরাসরি পেছনের বাড়ির সঙ্গে কোনো গেইট ছিল না।

পাকিস্তানি সেনারা বাড়ি লুটপাট করে। দরজা-জানালা ভাঙে। বাথরুম ভেঙে রেখে যায়। একটি ভূতুড়ে পরিত্যক্ত বাড়ি হয়ে যায় জন-সমাগমে ভরপুর বাড়িটি।

তারপর একদিন এই বাড়ি আবার কোলাহলমুখর হয়ে ওঠে। জ্বলে ওঠে সব প্রদীপ। বাড়ির ভাঙাচোরা বিভিন্ন অংশ সারানো হলো। বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। পাকিস্তানের কারাগার থেকে। জমে উঠলো সামনের সড়ক, প্রাঙ্গণ, পেছনের ঘরগুলো এবং বাড়ির সব ঘর। দেশ-বিদেশের অতিথিরা আসেন। সাংবাদিকরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন। কত কাজ, কত ব্যস্ততা। বাড়ির গেটে প্রহরীদের সার্বক্ষণিক অবস্থান বাড়িটির সরকারি চেহারার কথা বলে। বাড়িতে বিউগল বাজিয়ে পতাকা ওড়ানো হয়। সন্ধ্যায় পতাকা নামানো হয়। এই বাড়ির এখন আনন্দের শেষ নেই।

বাড়িটি আনন্দে মুখর হয়েছিল পঁচাত্তরের জুলাই মাসে। শেখ কামাল ও শেখ জামালের বিয়ে হয়েছিল একই মাসে। ১৪ জুলাই সুলতানা খুকুর সঙ্গে বিয়ে হয় কামালের। ১৭ জুলাই রোজীর সঙ্গে বিয়ে হয় জামালের। বাড়িজুড়ে আনন্দ হৈ-চৈ। ৩০ জুলাই এই বাড়ি থেকে জার্মানিতে যায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ব্যাপ্তিতে অনন্তকালের দীর্ঘ সময় নয়। কতগুলো দিন মাত্র। মহাকালের হিসেবে বিন্দুসম। ইতিহাসের সাদা পাতায় ফুটে ওঠে কালো রাত। পনেরোই আগস্ট।

সাক্ষী নিয়াজ আহমদ গর্জন ছিলেন প্রতিবেশী। তাঁদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে দেখতে পেতেন এই বাড়ির সামনের অংশ, পেছনের অংশ। উত্তর-পশ্চিমের বারান্দা। তাঁদের বাড়ির যে রুমে তিনি ঘুমাতেন সেই রুম থেকে তিনি জাতীয় পতাকা উঠানোর সময় বিউগলের আওয়াজ শুনতে পেতেন। ঘটনার রাতে পাঁচটার সময় তিনি বিউগলের আওয়াজ শুনতে পান। পরে গুলির শব্দ ভেসে আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। তাঁর মনে হয়েছিল দেয়াল ভেদ করে গুলি বুঝি তাঁদের গায়ে লাগবে। তাঁরা সবাই বাড়ির পূর্ব কোণের বাথরুমে আশ্রয় নেন।

পরদিন ভোরে কয়েকজন সেনা সদস্য তাঁদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। তারা অস্ত্র আছে কিনা দেখার জন্য বাড়ি তল্লাশী করে। সেদিন মেজর বজলুল হুদা বাড়ির পেছনের গেট দিয়ে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছিল। সে অন্য একজন সেনা সদস্যকে দেখিয়ে তাঁদেরকে বলেছিল, ইনি আপনাদের ছাদে থাকবে। তখন বেলা এগারোটার মতো হবে।

গর্জন পরে তাদের ছাদে পাহারা দিতে আসা সেনা সদস্যকে নিয়ে ছাদে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাই কি হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, রেডিও খোলেন। পাশের বাড়িতে শুধু রক্ত আর রক্ত। সব শেষ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে গর্জন ওই বাড়ির দোতলার বারান্দায় কয়েকজন সেনা-সদস্য দেখতে পান। তাঁদের বাড়িতে তাঁর পাশে যে সেনা-সদস্য ছিল সে হাতের ঈশারায় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সেনাকে জানতে চান যে কি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সেনারাও ঈশারায় উত্তর দিয়েছিল। হাতের আঙুল দেখিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ইঙ্গিত করে।

জুমার নামাজের সময় গর্জনের আত্মীয় কর্ণেল মুজিব তাঁদেরকে দেখতে আসেন। তাঁরা তাঁদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। তিনি বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর বাসা যতক্ষণ ধোয়ামোছা না হবে ততক্ষণ এই রাস্তা দিয়ে কাউকে যেতে দেয়া হবে না।

বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে গর্জন দেখতে পান ট্যাংক চলাচলের কারণে রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাগ পড়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি এবং বাড়ির সামনের রাস্তা দুপুর পর্যন্ত আর্মির নিয়ন্ত্রণে থাকে। গর্জন ভাবতে থাকেন এই বাড়ি ধোয়ামোছা করে রক্তের দাগ ওঠানো কি সম্ভব?

বাড়ির মুখে ভাষা নেই, কিন্তু নিজেকে প্রকাশের উপকরণ আছে বাড়ি জুড়ে। ঘাতকরা বাড়িতে তালা লাগিয়েছে। জনসমাগম বন্ধ করেছে। এও করে রাখা সম্ভব কি? বাড়ি একদিন অজস্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে কালের সাক্ষী হবে। বলবে, আমার বুকে যত প্রমাণ আছে তা কেউ মুছতে পারবে না।

একদিন এই বাড়ি সাহিত্যের পৃষ্ঠায় উঠে আসে। এই বাড়িকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়। কবি মনজুরে মওলা 'এই এক বাড়ি' নামে কবিতা লেখেন: ময়নামতির থেকে, পঞ্চগড় মহানন্দা থেকে,/মেঘনার ওপার থেকে, রাঢ়দেশ থেকে,/পেরিয়ে সন্দ্বীপ, হাতিয়ার ঢেউ টুকরো ক'রে,/হাজার-হাজার পাখি একদিন এই/– হাজার-হাজার নয়, কোটি- কোটি পাখি–/এই সামান্য বাড়িতে উড়ে আসে। কুলায়ের খোঁজ করে,/খোঁজ করে অভয়ের বিশ্বাসের খোঁজ করে,/এবং আশার।/এই বাড়ি ফেরায় না কাউকেই।/বারান্দায় নতুন পতাকা ওড়ে।/স্বপ্নের মানুষ দাঁড়ান সে-পতাকার নিচে।/তারপর একদিন/পাখি নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এ বাড়ির দিকে ছুটে আসে।/জানালার কাচ ভাঙে, ইট গুঁড়ো হয়, রক্তের সমূহ স্রোত সিঁড়ি বেয়ে/নিচে নেমে আসে, বাগানের/গাছ দিয়ে ফেলে।/গাছেরা অবাক হয়। ভাবে :/এ তো জল নয়;/যার কোনো প্রয়োজনই আমাদের নেই,/তা-ই কেন আমাদের সিক্ত ক'রে যায়?/বরফে ও কাঠের মোড়কে/একটি শরীর যায় এই বাড়ি থেকে।/সাদা জামা, ভাঙা চশমা, টুকরো পাইপ যায় তার সাথে।/কেবল শরীরই যায়। স্বপ্নের মানুষ–/তিনি তো থেকেই যান নিজের বাড়িতে।/ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি হয়/তাঁর কণ্ঠস্বর /ঘর থেকে ঘরে।/এই বাড়ি ফেরায় না কাউকে॥

AMARBOI.COM

৬২.

বঙ্গবন্ধুর লাশ বহনকারী পিকআপ ভ্যানটি এখন ময়মনসিংহ রোডে। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে বিমানবন্দরে। জনশূন্য রাস্তা। দু'একটি আর্মির গাড়ি চলাচল করছে। ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর থেকে তেজগাঁও বিমানবন্দর বেশি দূরে নয়।

শব্দহীন রাস্তায় শব্দ ওঠে চারদিক থেকে। শব্দ অতিক্রম করে যায় দেশের সীমান্ত। শব্দ ছুটে আসে সীমান্ত অতিক্রম করে। তিনি কফিনের হিমাগারে নিশ্চিন্তে শায়িত। শুনতে পান মনীষি আবুল ফজলের কণ্ঠস্বর : "বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি বলে পরিচয় দেওয়ার হিম্মৎ কে জুগিয়েছেন? শেখ মুজিব ছাড়া এর কি দ্বিতীয় কোনো জবাব আছে? শেখ মুজিবকে হত্যা করা মানে, এক অর্থে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যা করা। তিনি ছিলেন আমাদের স্বাধীনতার, আমাদের হিম্মৎ আর সংগ্রামের প্রতীক। কে আর বিপদ আর সংগ্রামের দিনে বাঙালিকে বজ্রকণ্ঠে ডাক দেবে? যে পুরুষ সিংহ সে ডাক দিয়ে সারাদেশকে এক রণক্ষেত্রে পরিণত করতে পারতেন তাঁকে আমরা নিজের হাতে হত্যা করেছি। ইতিহাসে এক অকৃতজ্ঞ জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকলাম আমরা চিরকালের জন্য।"

এই কণ্ঠস্বর শুনে তিনি মনে করেন, তিনিতো জেগেই আছেন। তিনি ক্ষণিকের জন্য ঘুমিয়েছিলেন মাত্র। রেণু তাঁকে পরিপাটি বিছানা পেতে দিয়েছিলেন। বিছানায় রাসেলও ঘুমিয়েছিল। এখন ও নেই। আগেই উঠে গেছে। বত্রিশ নম্বর রাস্তায় ওর তিন-চাকার সাইকেল নিয়ে ছুটছে। ও যাবে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়ায়।

রেহানা এসে বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছে। বলছে, আব্বা আপনার কফি।

তিনি বলছেন, মাগো আমিতো আর কফি খাব না।

কেন আব্বা? কফিতো আপনার খুব পছন্দ।

তিনি চুপ করে থাকেন।

রেহানা বলে, ঠিক আছে। আমি আপনার কফির কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আপনার কাছেই। যখন আপনার খেতে ইচ্ছে হবে তখন আমাকে ডাকবেন। আমি আপনার হাতে কফির কাপ তুলে দেব।

তিনি বলতে পারেন না যে, মাগো আমার জন্য তোমার দাঁড়িয়ে থাকার অপেক্ষা কোনোদিন ফুরোবেনা। আমার সময়তো থেমে গেছে মা।

তখন চারদিকে আবার প্রবল কলরব ধ্বনিত হতে থাকে। ভেসে আসে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের কণ্ঠস্বর : "বাংলাদেশের মানুষ একটা জাতি, কারণ তারা একটা জাতি হতে চায়, অন্য কিছু নয়। জাতি হিসেবে মৃত বা জীবন্ত ঐতিহ্যের যা তাকে অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক করেছে, তার কোনো তালিকা এই জাতিসত্তাকে ব্যাখ্যা করতে বা অস্বীকৃতি দিতে পারে না।... ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সময়ে দুই অসম শক্তি এক ভয়াবহ নিষ্ঠুর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, সে সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন অনুপস্থিত। বঙ্গবন্ধু এবং শুধু বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন সেই প্রতীক যার চারদিকে নিঃসহায় এক উদ্দেশ্যের সমর্থকেরা একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু এটা কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না। ওই অন্ধকারের দিনগুলোতে, ওই অগ্নিপরীক্ষার দিনগুলোতে, যে কোটি কোটি মানুষ, যারা ভবিষ্যতের জাতিকে সৃষ্টি করবে তাদের মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বিধা ছিল না। বঙ্গবন্ধু একাই ছিলেন প্রতীক।"

তাঁর মনে হয় তিনিতো জেগে আছেন। অল্প সময়ের মতো ঘুমিয়েছেন মাত্র।

আব্বা। হাসিনার ডাক শুনতে পান তিনি।

বল মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি ভাবছেন আব্বা? এমন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন কেন?

ভাবনার কি শেষ আছে। বোস আমার কাছে।

হাসিনা বাবার কোল ঘেঁষে বসেন। বাবার সান্নিধ্যের উষ্ণতা এবং যত্ন একরকম। মায়েরটা অন্যরকম। তাঁদের জীবনে দু'জন মানুষ শুধু আলাদা ব্যক্তি নন। তাঁদের সান্নিধ্যে বৈচিত্র্য আছে, ভিন্নতার স্পর্শ আছে। ছেলেমেয়েরা সেই বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতায় ডুবে থাকে।

আবার হাসিনার কণ্ঠ, আব্বা।

তুমিতো জানো মা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশকে সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হ্যাঁ, এই খুশির খবর তো জানি আব্বা।

ভাবছি আমি আমার ভাষণটি বাংলা ভাষায় দেব।

বাংলায় দেবেন?

অসুবিধা কি, ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ থাকবে বিদেশিদের জন্য। বাংলা ভাষার একটি দেশ হয়েছে, বিশ্বের সামনে একথা মাথা উঁচু করে বলতে হবে আমাকে।

খুব ভালো চিন্তা আব্বা। নিজের মাতৃভাষার মর্যাদা দেয়া হবে। জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় তো কেউ ভাষণ দেননি।

কবিগুরু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে আন্তর্জাতিক দরবারে বাংলা ভাষার তেমন কদর হয়নি। আমি সেই কাজটি করতে চাই মা।

এটা অনেক বড় কাজ আব্বা। আপনি ঠিক চিন্তা করেছেন।

তুই খুশি হয়েছিস মা?

খুব খুশি হয়েছি আব্বা।

তিনি তখন ভাবলেন, আবারও এমন একটি খুশি হওয়ার সুযোগ মেয়েটির জীবনে আর হবে না।

তার জীবনের সময় থেমে গেছে।

তারপর তিনি শুনতে পান জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনের রেজোলিউশন টাইপ হচ্ছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার।

দেখতে পান টাইপ করা কাগজের পৃষ্ঠা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

RESOLUTIONS

adopted by the General Assembly
during its
TWENTY-NINTH SESSION
volume 1
17 September-18 December 1974

GENERAL ASSEMBLY
OFFICIAL RECORDS : TWENTY-NINTH SESSION
SUPPLEMENT No. 31 (A/9631)

UNITED NATIONS
New York, 1975

COMPOSITION OF THE GENERAL COMMITTEE
(Items 4, 5 and 6)

The General Committee of the General Assembly for the twenty-ninth session was constituted as follows;
President of the General Assembly :
Mr. Abdelaziz BOUTEFLIKA (Algeria),

2233rd Plenary meeting
17 Septemer 1974

Vice-Presidents of the General Assembly :
The representatives of the following Member States : AUSTRIA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHINA, FRANCE, GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF), HAITI, IVORY COAST, LEBANON, MEXICO, NEPAL, NICARAGUA, PHILIPINES, ROMANIA, UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, UNTTED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, UNITED STATES OF AMERICA AND ZAMBIA.

2235th plenary meeting
18 September 1974

Chairman of the main, Committees of the General Assembly;
First Committee : Mr. Carlos ORTIZ DE ROZAS (Argentina):
Speial Political Committeee : Mr. Per LIND (Sweden);
Second Committee : Mr. Jihad KARAM (IRAQ);

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Third Committee : Mrs. Aminata MARICO (Mali)
Fourth Committee : Mr Buyantyn DASHTSEREN (Mongolia);
Fifth Committee. Mr. Costa P. CARANICAS (Greece);
Sixth Committee : Mr. Milan SAHOVIC (Yugoslavia)

3203 (XXIX). Admission of the People's Republic of Bangladesh to membership in the United Nations.

The General Assembly,
Having received the recommendation of the Security Council of 10 June 1975 that the People's Republic of Bangladesh should be admitted to Memberhip in the Untied Nations.
Having considered the application for membership of the People's Republic of Bangladesh. Decides to admit the People's Republic of Bangladesh.
Decides to admit the People's Reupblic of Bangladesh to membership in the United Nations.
2233rd Plenary meeting
17 September 1974

AMARBOI.COM

ওই একই অধিবেশনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ দানের দিন ঠিক হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর। তিনি প্রস্তুতি নিয়েছেন। সফরসঙ্গী ঠিক করেছেন। যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা পৌঁছালেন নিউইয়র্কে। হোটেল কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার। পরদিন বেলা তিনটায় বক্তৃতার সময় ঠিক হয়। সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদেল আজিজ বুতাফ্লিকা। তিনি মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতাদের করতালি। পরিষদের সভাপতি নিজের চেয়ার থেকে উঠে এসে বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চে স্বাগত জানান। তিনি নিজের মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটির ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছিল পাশাপাশি। পিনপতন স্তব্ধতা ছিল ঘড়জুড়ে।

জলদগম্ভীর স্বরে তিনি শুরু করলেন, "আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই পার্লামেন্টে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে গভীর সন্তোষের ভাব লক্ষ করছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কারণ, তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্য দ্বারা চিহ্নিত। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে মুক্ত ও সম্মানজনক জীবন যাপনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছে বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে। জাতিসংঘ সনদে যে মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তা আমাদের জনগণেরও আদর্শ এবং এই আদর্শের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমন এক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গিকৃত, যে ব্যবস্থায় সকল মানুষের শান্তি ও ন্যায়বিচার লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হবে এবং আমি জানি, আমাদের এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে আমাদের লাখো লাখো শহীদের বিদেহী আত্মারও তৃপ্তি নিহিত রয়েছে। . . . .

বাংলাদেশ তার সূচনা থেকেই জোটনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করছে। এই নীতির মূল কথা শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সকলের সঙ্গে মৈত্রী। শান্তির প্রতি আমাদের যে পূর্ণ আনুগত্য, তা এই উপলব্ধি থেকেই জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারবো এবং ক্ষুধা, দারিদ্র, রোগ, শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হব।

সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে যার লক্ষ্য বিশ্বের উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা এবং এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা তথা পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা। এই নীতি অনুযায়ী ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা করার প্রস্তাবকে আমরা অবিরাম সমর্থন জানিয়ে আসছি। ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা রাখার প্রস্তাব এই পরিষদেরও শক্তিশালী অনুমোদন লাভ করেছে। আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে শান্তি স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার এলাকা ঘোষণা করার প্রস্তাবেও আমাদরে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছি।

আমাদের বিশ্বাস, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্বের যে উদীয়মান জাতিসমূহ একত্রিত হয়েছিলেন, তাঁরা শান্তির পক্ষে শক্তিশালী সমর্থন জুগিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অভিন্ন প্রতিজ্ঞার কথাই আবার ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার। . . . .

আমরা শান্তিকামী বলেই আমাদের উপমহাদেশেও আমরা আপোস মীমাংসা নীতির অনুসারী। এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলাদেশের অভ্যুদয় উপমহাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে এবং অতীতের কনফ্রন্টেশন ও বিরোধের বদলে আমাদের তিনটি দেশেরই জনগণের জন্য কল্যাণকর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। আমরা আমাদের মহান নিকট প্রতিবেশী ভারত এবং বার্মা ও নেপালের সঙ্গে যেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছি, তেমনি অতীত থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক স্থাপনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচেষ্টাতে লিপ্ত রয়েছি। অতীতের তিক্ততা দূর করার জন্য আমরা কোন প্রচেষ্টা থেকেই নিবৃত্ত হইনি। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকেও ক্ষমা প্রদর্শন করে এই উপমহাদেশে শান্তি ও সহযোগিতার নতুন ইতিহাস রচনার কাজে আমরা আমাদের আন্তরিকতার প্রমাণ দিয়েছি। এই ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধে লিপ্ত থাকার অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল। তবু সকল অপরাধ ভুলে গিয়ে আমরা ক্ষমা ও উদারতার এমন মূলধন নিয়োগ করতে চেয়েছি যা ভবিষ্যতে এই উপমহাদেশে শান্তি সমৃদ্ধি ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় যোজনা করবে।"...

বক্তৃতা শেষ হলে মুহূর্মুহু করতালিতে অভিনন্দিত হতে থাকেন তিনি। নেতাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল শেখ মুজিবের নাম। বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের নেতা হিসেবে নন্দিত হচ্ছিলেন তিনি।

জাতিসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আমাকে আনন্দিত ও গর্বিত করেছে। বক্তৃতাটির মেসেজ চমৎকার। একইভাবে বক্তৃতাটি সহজ, গঠনমূলক এবং অর্থবহ।

জাতিসংঘের জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনায় বসেন তিনি। দেশের দুর্ভিক্ষ-অবস্থার কথা আলোচনা করেন। কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম আলোচনার পরে বড় অঙ্কের টাকা ত্রাণ তহবিলে দিয়েছিলেন। উপমহাসচিব ড. ভিক্টর উমব্রাইখটকে বাংলাদেশের সমস্যার দিকে খেয়াল রাখার জন্য দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁর মনে হয় তিনি জেগে আছেন।

যে রাষ্ট্রটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল মাত্র তিন বছরে তাদের এই পরিবর্তন তাঁর কানে বাজে। কিন্তু আজ এই কফিনের মধ্যে এক গাদা বরফের মাঝে শুয়ে মনে হচ্ছে সিআইএ কি এই হত্যাকাণ্ডের চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত নয়? জাতিসংঘ মানবজাতির পার্লামেন্ট। জাতিসংঘের সদস্য অসংখ্য উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্র ভিন্ন।

আব্বা।

হাসিনার কণ্ঠস্বর। ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বাবাকে খোঁজেন।

আব্বা।

তিনি আর সাড়া দেন না। তিনি জানেন, ওরা আজীবন আব্বা বলে ডাকবে। কিন্তু তিনি আর কোনোদিন দুই বোনের ডাকে সাড়া দেবেন না। তাঁর সময় স্তব্ধ।

লাশ বহনকারী ভ্যানটি বিমানবন্দরে ঢোকে। হেলিকপ্টার রেডি। এ. কে. খন্দকার তাঁর জবানবন্দিতে বলছেন, ১৫ আগস্ট বিমানবাহিনীর সদস্যগণ আমার আওতায় সুশৃংখল ছিল। বঙ্গবন্ধুর মৃতদেহ ১৬ আগস্ট টুঙ্গিপাড়া পাঠানো হয়। হেলিকপ্টারে তাঁহার মৃতদেহ টুঙ্গিপাড়া নেওয়া হয়। বঙ্গভবনের নির্দেশে তাঁহার মৃতদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুঙ্গিপাড়া পাঠানো হয়। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি জানাই যে, মৃতদেহ পাঠানো হইয়াছে।

হেলিকপ্টার উড়ে যায় আকাশে। নীলিমায় ভেসে থাকে মেঘের ছায়া। আমি আপনার পাশে আছি বঙ্গবন্ধু, যেন রোদের তাপে আপনার কষ্ট না হয়।

বাতাস বয়ে যায় মৃদু হিল্লোলে। আমি আপনার পাশে আছি বঙ্গবন্ধু। আমার পরশে রোদের উত্তাপ আপনার কাছে স্নিগ্ধ মনে হবে।

বঙ্গবন্ধু আমি বৈশাখের ঝড়ো বাতাস। যেভাবে আপনি ঝড় তুলেছিলেন বাঙালি জাতির মানসলোকে আমি সে রকমই। আপনার কথা ভেবে আমার গর্ব হচ্ছে বঙ্গবন্ধু।

আমি শ্রাবনের বৃষ্টি বঙ্গবন্ধু। আপনি বৃষ্টি ভালোবাসতেন। জলরাশি ভালোবাসতেন। মধুমতী নদী আপনার প্রিয় ছিল। আমার অঝোর ধারায় সজীব হয়ে উঠতো টুঙ্গিপাড়ার মাঠ-প্রান্তর। বঙ্গবন্ধু আপনি আমার গর্ব।

আমি আশ্বিনের শিউলি ফুল বঙ্গবন্ধু। কত অজস্র দিন আপনি বন্ধুদের সঙ্গে শিউলি ফুল কুড়িয়েছেন স্কুলে যাওয়ার পথে। নিজের পড়ার টেবিলে ফুল রাখতেন। সৌরভ বুকে টেনে মাকে বলতেন, মা, সবচেয়ে ভালোবাসি শিউলি ফুল।

আমি অগ্রহায়ণের পাকা ধান বঙ্গবন্ধু। আপনি ফসলের ক্ষেত ভালোবাসতেন। হেমন্ত ঋতুতে নবান্ন হয়। আপনি নবান্ন উৎসব ভালোবাসতেন। আপনি চাইতেন ঘরে ঘরে যেন নতুন চালের ভাত রান্না হয়। আপনার কি মনে আছে বঙ্গবন্ধু আপনি ছোটবেলায় বাড়ির গোলা থেকে গরিব মানুষদের চাল দিতেন? বঙ্গবন্ধু আপনি আমার গর্ব।

আমি পৌষের পিঠেপুলি। কুয়াশার চাদর সরিয়ে যে ভোর আসে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সেখানে ভাঁপা পিঠার আসর বসে। গ্রামে-শহরে ভাঁপা পিঠা ওম ছড়ায় মানুষের মনে। পৌষ-মাঘ ছাড়াতো পিঠার আসর জমে না। আপনি বলতেন, নকশি পিঠা বাংলাদেশের প্রাণ। নকশি পিঠাতে ফুল বানিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা নিজেদের গুণ দেখিয়েছে। এই গুণকে বিশ্বের আসরে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের যা কিছু এমন সম্পদ তা দিয়ে আমরা নিজেদের মান বাড়াবো। নিজেদেরকে বোঝার এই দায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু আপনি আমাদের নেতা। আমরা আপনার জন্য গর্ব করি।

আমি ফাল্গুনের বসন্ত। সজীব করি প্রকৃতি। ফুল ফোটাই। কোকিলের কলতান ভাসাই। জীবনের সুন্দরকে আমি মানুষের কাছে নিয়ে আসি। ফাল্গুন ভাষার মাস বঙ্গবন্ধু। এই সত্য আপনার চেয়ে আর কে বেশি জানে। আপনি জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে ভাষা শহীদদের ঋণ শোধ করেছেন। তাঁদের আত্মা শান্তি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু আপনি আমাদের গর্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন প্রবল বাতাস ঝঙ্কৃত স্বরে বলে, বঙ্গবন্ধু আপনার জন্য আমি আপনার প্রিয়তম স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নিয়ে এসেছি।

রেণু, রেণু তুমি কোথায়?

এই যে তোমার কাছে।

তুমি আমার হাত ধরো রেণু।

আহ্ তোমার হাত কি ঠান্ডা!

তোমার হাতও ঠান্ডা রেণু।

আমাদের দুজনের হাত একইসঙ্গে ঠান্ডা হয়েছে।

দেখো, দেখো আমাদের মধ্যে উষ্ণতা ফিরে এসেছে।

হ্যাঁ, তাইতো। তোমার হাতে আমাদের সেই যৌবনের উষ্ণতা ফিরে এসেছে।

আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

কি?

আমি তোমার জন্য একবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। এখনই সেই সময় আমার জীবনে।

চলো আমরা হাত ধরে হেঁটে টুঙ্গিপাড়ায় যাই। আমাদের সঙ্গে যাবে হাজার হাজার মানুষ।

যাদের জন্য তোমার রাজনীতি।

ঠিক বলেছো রেণু। এসো, আমার হাত ধরো।

তখন প্রবল ঝঞ্ঝায় গর্জন করে গ্রীষ্ম— তোমার নেতা আমার নেতা— শেখ মুজিব শেখ মুজিব।

প্রবল বর্ষণে প্লাবিত হয় বর্ষা— তোমার আমার ঠিকানা— পদ্মা মেঘনা যমুনা।

পেঁজা তুলোর মতো সহস্র মেঘ ভোরে তোলে শরতের আকাশ— জেলের তালা ভাঙবো— শেখ মুজিবকে আনবো।

শস্যদানার প্রাচুর্যে ভরে থাকে হেমন্তের ফসলের মাঠ— রক্ত সূর্য উঠেছে— বাঙালিরা জেগেছে।

কুয়াশা-ঢাকা শীত পাতা ঝরা গাছের মাথায় জ্বালায় আগুন— বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো— বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

বসন্ত হাজারো কণ্ঠে উচ্চকিত করে বাতাস— জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধু মধুমতী নদীর ধারে দাঁড়িয়ে বলেন, রেণু শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি। হাজার হাজার মানুষ আমাদের পেছনে।

দু'জনে ঘুরে দাঁড়ান।

টুঙ্গিপাড়ার চারদিক থেকে ছুটে আসছে মানুষ। মাথার ওপর বোঁ-বোঁ ঘুরছে হেলিকপ্টার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুঙ্গিপাড়ার মানুষেরা মাথা কাত করে হেলিকপ্টার দেখে। হেলিকপ্টারে করে তিনি এসেছিলেন আগে। আবারও এলেন। বলবেন কি-কি বলবেন? মানুষের চোখে পানি। তারা জানে তিনি আর কোনো কথা বলবেন না।

৬৩.

সাক্ষীর কাঠগড়ায় জবানবন্দি দিচ্ছেন এ.এস.পি. শেখ আবদুর রহমান :

30. A. S. P. SK. Abdur Rahman.

P. W. -30

জবানবন্দি লিখিবার ধারা

দায়রা মামলা নং– ৩১৯/৯৭

জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

আন্দাজি– ৫৫ বয়স্ক এ. এস. পি. শেখ আবদুর রহমান-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃ: ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত জনাব কাজী গোলাম রসুল, দায়রা জজ ও স্পেশাল ট্রাইবুনাল জজ, সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৬/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

AMARBOI.COM

আমার নাম: এ. এস. পি. শেখ আবদুর রহমান, বয়স ৫৫ বছর, আমার পিতার নাম : গিয়াস উদ্দিন আহাম্মদ, গ্রাম : কোয়াটির টং, থানা : শ্রীনগর, জেলা : মুন্সিগঞ্জ।

আমি বর্তমানে সিনিয়র এ. এস. পি. হিসাবে ঢাকায় সি. আই. ডি- তে কর্মরত আছি।

১৯৭৫ সনের ১৪/১৫ই আগস্ট গোপালগঞ্জের সি. আই. (সার্কেল ইন্সপেক্টর) হিসাবে কর্মরত ছিলাম।

ঐ সনের ১৫ই আগস্ট সকাল বেলা রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই। উহাতে বলা হয় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

পরের দিন ১৬ই আগস্ট সকাল ৮টার দিকে এস. পি. ফরিদপুর টেলিফোনে আমাকে জানাইলেন যে বঙ্গবন্ধুর লাশ গোপালগঞ্জে আসিতেছে। তাহার লাশ দাফন করার জন্য টুঙ্গিপাড়ায় কবর খোঁড়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা করার জন্যও নির্দেশ দিলেন। আমি ও. সি. টুঙ্গিপাড়াকে সেই অনুসারে বঙ্গবন্ধুর পিতা-মাতার কবরের পাশে খালি জায়গায় কবর খোঁড়ার জন্য বলি।

এই কথা জানাইয়া এস.ডি.পি.ও. নুরুল আলম, আমি এবং ল'ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল কাদের বেলা ১১-৩০টায় টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছাইলাম। তারপর এস.ডি.পি.ও. এবং ল' ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকবাংলায় অপেক্ষা করেন, আর আমি টুঙ্গিপাড়া গিয়া দেখিলাম ও. সি. আবদুল মান্নান শেখ এবং অন্যান্যরা কবর খুঁড়িয়া রাখিয়াছে। তখন আমি পুনরায় ডাকবাংলায় আসিয়া এস.ডি.পি.ও. এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাবেবকে এই তথ্য দেই।

তারপর তাহাদের নির্দেশে আমি হেলিপোর্ট ঠিকঠাক করি।

এই সময় চর্তুদিক হইতে লোক আসিয়া হেলিপোর্ট ঘিরিয়া ফেলে। বেলা ২টার সময় হেলিকপ্টার আসে এবং জানালা ফাঁক করিয়া হাতে ইশারা দিয়া সমস্ত লোক সরাইয়া দিবার জন্য বলে। তখন আমি ও. সি. এবং সিপাহীরা সব লোক সরাইয়া দেই। হেলিকপ্টার ল্যান্ড করে। সাথে সাথে সশস্ত্র অবস্থায় ১৫/১৬ জন আর্মি সিপাই হেলিকপ্টার হইতে নামিয়া চারদিকে অবস্থান নেয়।

পরে আমাকে হাত উঠাইয়া কাছে যাইবার জন্য ২ জন মেজর সাহেব ডাকেন। কাছে গেলে লোকজন লইয়া কফিন নামাইতে বলেন। কাছে আবদুল হাই শেখ, সোহরাব মাস্টার, আকবর গাজী, নুরুল হক, আবদুল মন্নানসহ আমার সিপাইরা মিলিয়া হেলিকপ্টার হইতে কফিন নামায়। পরে এই কফিন আমরা বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে উঠোনে কবর খোঁড়া হয় সেখানে লইয়া যাই। সুবেদার ইসাহকসহ আমরা কফিনের উপরের ডালা খুলিয়া বরফ সরাইয়া লাশ বাহির করি এবং বঙ্গবন্ধুর বুকসহ শরীরে গুলির চিহ্ন দেখি। ডান হাতের শাহাদাৎ আঙুলের উপরের অংশ নাই। দুই পায়ের গোড়ালির উপরে রগ কাটা ছিল।

এই অবস্থায় মেজর সাহেবগণ লাশ দাফন করার নির্দেশ দিলে আমি বলি যে, মুসলমানের লাশ গোসল জানাজ কাফন ইত্যাদি ছাড়া দাফন করা ঠিক হইবে না। ইহা শুনিয়া তাহারা কিছুটা নমনীয় হইয়া এইসব কাজ করার জন্য ১০ মিনিট সময় দিলেন। তখন আমি, রজব শেখ ও আবদুল হাই শেখ দৌড়াইয়া রেডক্রস হাসপাতালে গিয়া তিনটি সাদা শাড়ি ২টা সাবান আনিয়া মসজিদের ইমাম হালিম সাহেবকে ডাকিয়া আনি।

তারপর আমি নুরুল হক, ইমাম উদ্দিন গাজী, আবুদল মন্নান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো অনেকে ইমাম সাহেবের পরামর্শ মতে গোসল করাইয়া কাফন পরাই। তারপর জানাজায় দাঁড়াইলে চতুরদিক হইতে লোক আসার চেষ্টা করে। কিন্তু আর্মিদের নির্দেশে ঐসব লোক আসিতে দেওয়া হয় নাই। গোসল করার আগে আমি সুরতহাল করানোর চেষ্টা নেই। কিন্তু আর্মির ঐ দুইজন অফিসার বাধা দিবার কারণে সুরতহাল করিতে পারি নাই।

তারপর আমরা ২০/২৫ জন লোক জানাজা পড়িয়া বঙ্গবন্ধুকে দাফন করি।

তাহার পরণে একটা সাদা পাঞ্জাবি, একটা চেক লুঙি ছিল। কফিনে চশমা, একটা পাইপ, এক জোড়া স্যান্ডেল ছিল।

এই জিনিসগুলি তাঁহার আত্মীয়ের জিম্মায় রাখার জন্য ওসিকে নির্দেশ দেই। ও. সি. এইগুলি তাহার আত্মীয়ের জিম্মায় রাখে।

এরপর ঐ দুইজন অর্মি অফিসার একটা চিঠি দেখাইলেন যাহার নীচে খন্দকার মোশতাক আহামদ– প্রেসিডেন্ট অব বাংলাদেশ লেখা ছিল।

তারপর আর্মিদের দেওয়া একটি প্যাডে আমরা বঙ্গবন্ধুর লাশ বুঝিয়া পাইয়া দাফন করার সার্টিফিকেট দেই। সার্টিফিকেট আমি এবং ল' ইয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করি।

AMARBOI.COM

৬৪.

তাঁর মনে হয় তিনি এখন জেগে আছেন।

হাজার হাজার মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বজ্রকণ্ঠে তাঁদেরকে সম্বোধন করলেন, ভায়েরা আমার,

পরে তাঁর মনে হলো তিনি এখন কোনো জনসভায় নেই।

তিনি এখন বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে ভাষণ দেবেন। কিছুক্ষণ আগে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ হয়েছে।

<u>সংসদ বিতর্ক</u>

বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকের সরকারি বিবরণী

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

শনিবার, ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৭৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠক ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারি, সকাল ১০টা ১ মিনিটে স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিলের সভাপতিত্বে ঢাকাস্থ সংসদ ভবনে আরম্ভ হয়।)

সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) বিল, ১৯৭৫

শ্রী মনোরঞ্জন ধর : আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে একটি বিল (সংবিধান, চতুর্থ সংশোধনী বিল, ১৯৭৫) উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

জনাব স্পীকার : সংসদের সম্মুখে প্রশ্ন হল : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের কতিপয় বিধানের অধিকতর সংশোধনকল্পে একটি বিল উত্থাপনের অনুমতি দেয়া হোক। যাঁরা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা হাঁ বলুন।

(ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর)

যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা না বলুন।

(ধ্বনি ভোট গ্রহণের পর)

আমার মনে হয়, হাঁ ভোট জয়যুক্ত হয়েছে, হাঁ ভোট জয়যুক্ত হয়েছে, হাঁ ভোট জয়যুক্ত হয়েছে।

॥ 'না'– ভোটদানকারী সদস্য শূন্য॥

Mr. Speaker : Order, order, please! Result of Voting.

বিভক্তির পর গণনার ফলাফল : প্রস্তাবের পক্ষে 'হাঁ' ভোট ২৯৪, বিপক্ষে 'না' ভোট শূন্য।

হাঁ জয়যুক্ত হল এবং সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল, ১৯৭৫ সমস্ত clause, preamble, title ও enacting formula-সহ মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ভোটে গৃহীত হল।

সকাল এগারোটা কুড়ি মিনিট।

ভাষণ দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা–

"জনাব স্পীকার সাহেব, আজকে আমাদের সংবিধানের কিছু অংশ সংশোধন করতে হল।

আপনার মনে আছে যে, সংবিধান যখন পাস করা হয়, তখন আমি বলেছিলাম যে, এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, শোষণহীন সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয়, এই সংবিধান পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনাব স্পীকার সাহেব, আপনি জানেন যে, যুগ যুগ ধরে বাঙালি জাতি পরাধীন ছিল। দুশো বৎসরের ইংরেজ-শাসন, পঁচিশ বৎসরের পাকিস্তানি শাসন এবং শোষণ বাংলাকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছিলাম বাংলার মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। এ দেশের হাজার হাজার নেতা কর্মী ও জনসাধারণ শুধু কারাবরণ করেন নাই– তাঁদের অনেককে জীবন দান করতে হয়েছিল। .....

সংবিধানের এই সংশোধন কম দুঃখে করি নাই, স্পীকার সাহেব। যারা জীবনভর সংগ্রাম করছে– একথা যেন কেউ মনে না করে যে, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গেছে। No, জনগণ যা চেয়েছে, এখানে সেই System করা হয়েছে। তাতে পার্লামেন্টের মেম্বারগণ জনগণের দ্বারা ভোটে নির্বাচিত হবেন। যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন, তাঁকে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। জনগণের ভোটাধিকার আছে।

জনাব স্পীকার সাহেব, তবু আজকে আমরা পরিবর্তন করেছি সংবিধানকে। কারণ, একটা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা এ দেশে কায়েম করতে হবে, যেখানে মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারে, যেখানে মানুষ অত্যাচার, অবিচার হতে বাঁচতে পারে।

চেষ্টা নতুন। আজ আমি বলতে চাই, this is our Second Revolution। এই Revolution। আমাদের এই Revolution হবে দুখী মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্য। এর অর্থ অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। .....

আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশে নিশ্চয় এই তিন বছরের মধ্যে আমরা কিছু করেছি। আপনাদের কি কোন গভর্নমেন্ট ছিল? কেন্দ্রীয় সরকার ছিল? ছিল কি আপনাদের foreign office? ছিল কি আপনাদের defence office? ছিল কি আপনাদের planning? ছিল কি আপনাদের finance? ছিল কি আপনাদের customs? কী নিয়ে আমরা আরম্ভ করেছিলাম? We have now organized a national government- an effective national government. insha-allah. and better than many countries. I can challenge. ....

System পরিবর্তন করেই আমরা সফল হতে পারব না যদি আপনারা চেষ্টা না করেন। আপনারা যদি নিঃস্বার্থভাবে, যেভাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিলেন, যেমন নিঃস্বার্থভাবে পঁচিশ বৎসর সংগ্রাম করেছিলেন, সেইভাবে যদি সংগ্রাম না করেন অন্যায়-অবিচার-দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাহলে দেশগড়ার কাজে production- এর খুবই ক্ষতি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবে। .....

আজ আমি আপনাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। আমার পার্টি আছে এবং আপনারা পার্টির সদস্য। বহু দুঃখের দিন আমরা কাটিয়েছি। সুখের মুখ আমরা দেখি নাই। এই ক্ষমতায় যে আমরা আছি– এই ক্ষমতা সুখের নয়। এ বড় কষ্টের, বড় কন্টকাকীর্ণ এই ক্ষমতা।

স্পীকার সাহেব, আপনাকে ধন্যবাদ দিই, সকলকে ধন্যবাদ দিই, সদস্যদের ধন্যবাদ দিই, স্টাফকে ধন্যবাদ দিই, কর্মচারিদের ধন্যবাদ দিই, সহকর্মীদের ধন্যবাদ দিই। আমি আপনাদের একজন। আপনাদের একজন হিসেবে আমি আপনাদের পাশে থাকব, আপনাদের কাছে থাকব, আপনাদের মধ্যে থাকব এবং আপনাদের নিয়েই কাজ করব। আমাদের সেই গভর্নমেন্ট থাকবে, মন্ত্রী থাকবে– সব থাকবে, কাজ-কর্ম করবে। কোন অসুবিধার কারণ নাই। তবে কথা হল এই– সবচেয়ে বড় কাজ আমাদের, we have to work sincerely and honestly for the emancipation of the poor people of this country. This is our aim, ইনশাল্লাহ্।

আমি আপনাদের আবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।"

জয় বাংলা!

[অতঃপর প্রথম জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়]

সময় বেলা ১[illegible]৪ মিনিট।

AMARBOI.COM

একসময় থেমে যায় তাঁর কণ্ঠস্বর। কিন্তু তিনি জেগেই আছেন। কারণ সময়ের হিসেব তাঁর জীবন থেকে ফুরিয়ে গেছে। তিনি এখন সময়ের উর্ধ্বের মানুষ।

শুনতে পান রেহানার কণ্ঠস্বর।

আব্বা আপনি সবসময় এত রাত করে বাড়িতে ফেরেন যে ভালোলাগে না। আপনি পলিটিক্স করেন কেন?

তিনি ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুই এমন করে কথা বলিস কেন? আমার কাছে তুইও যা সাড়ে সাতকোটি মানুষও তা।

না আব্বা, আমি আপনাকে কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে পারবো না।

দুপদাপ পা ফেলে চলে যাওয়া মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তিনি বিষণ্ন বোধ করেছিলেন।

কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হাসিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আব্বা, আমরাতো আপনাকে খুব কম কাছে পাই। সেজন্য রেহানার এই অভিমান।

আমি বুঝি মা। কিন্তু আমার দেশের মানুষ আমার কাছে সন্তানের মতো। আমি তোমাদেরকে যেভাবে ভালোবাসি অন্যদেরও সেভাবে ভালোবাসতে চাই।

আব্বা আপনি দুঃখ পাবেন না। আমরাতো দেখেছি দেশের মানুষের জন্য আপনার কত ভালোবাসা। ঝড়-তুফানের রাতে আপনি জেগে থাকতেন। তসবিহ নিয়ে ছুটাছুটি করতেন। বলতেন, আল্লাহ আমার দেশ গরিব। দেশের গরিব মানুষকে তুমি রহম করো। আমরা আপনাকে ঘুমাতে বললে বলতেন, তোরা বুঝিসনা, আজ কেউ বাঁচবে না।

তিনি একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলেছিলেন, বুড়োকালে আমি গ্রামে থাকবো। তুমি আমাকে দেখাশোনা করবে মা। আমি তোমার কাছে থাকবো।

হাসিনা উচ্ছ্বসিত স্বরে বাবাকে আশ্বস্ত করেছিলেন, হ্যাঁ, আপনি আমার কাছে থাকবেন। আম্মাও আমার কাছে থাকবেন। আমি আপনাদেরকে আদরে আর যত্নে রাখবো। ভাববো, আপনারা আমার কাছে দু'জন ছোট্ট মানুষ।

ছাদে বসে বাবার মাথার পাকা চুল বেছে দিতেন রেহানা। বাবা তার মাথাটা মেয়ের কোলে ছেড়ে দিয়ে পরম আনন্দে চোখ বুঁজে থাকতেন।

একদিন মাথার একটি কাটা দাগ দেখিয়ে বললেন, আমার লাশ তো তোরা পাবি না, পেলেও চিনতে পারবি না। এই কাটা দাগ দেখে যদি চিনতে পারিস।

তখন প্রবল শব্দে ঝনঝন করে ওঠে হেলিকপ্টার।

কথা বলছেন আবদুল হাই শেখ।

৬৫.

28. Abdul Hye Sk.(Rtd.).
P. W. -28
জবানবন্দি লিখিবার ধারা
দায়রা মামলা নং-৩১৯/৯৭
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্দাজি– ৪৩ বয়স্ক আবদুল হাই শেখ-এর জবানবন্দি সন ১৮৭৩ খৃ: ১০ আইনের বিধানমত শপথ বা প্রতিজ্ঞাপূর্বক আমি উপস্থিত জনাব কাজী গোলাম রসুল, জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকার সমক্ষে অদ্য সন ১৯৯৭ সালের ২৩/১০ তারিখে গৃহীত হইল।

আমার নাম: আবদুল হাই শেখ, বয়স ৪৩ বছর, আমার পিতার নাম : মৃত আবদুল ওয়াদুদ শেখ, গ্রাম : টুঙ্গিপাড়া, থানা : টুঙ্গিপাড়া, জেলা : গোপালগঞ্জ।

আমি কৃষি কাজ করি। ১৯৭৫ সনে টুঙ্গিপাড়া শেখ সায়রা খাতুন রেডক্রস হাসপাতালে ওয়ার্ড বয় হিসাবে চাকুরি করিতাম।

ঐ সনের ১৫ই আগস্ট সকাল ৮টার সময় আমি হাসপাতালে ডিউটিতে যাই। তখন রেডিওতে শুনিতে পাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হইয়াছে।

পরের দিন ১৬ই আগস্ট পুলিশের কাছ হইতে খবর পাই বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়া আনা হইতেছে। দুপুর বেলা অনুমান ২টার সময় টুঙ্গিপাড়া থানার সামনে একটি হেলিকপ্টার আসে। তখন আমিসহ ইলিয়াস হোসেন, হাসপাতালের ইদ্রিস কাজী, আরো কয়েকজন লোকসহ আমরা থানার কাছে যাই। পুলিশের হাবিলদার এসহাক, সি. আই. শেখ আবদুর রহমান, এস. ডি. পি. ও. গোপালগঞ্জ, ওসি গোপালগঞ্জ আরো কয়েকজন অফিসারসহ থানার কাছে যাই। হেলিকপ্টার না নামিয়া উপর দিয়া ঘুরাঘুরি করে। হেলিকপ্টারের জানালা দিয়া হাতের ইশারায় লোকজনকে সরিয়া যাইতে বলে। সি.আই সাহেব বাঁশি বাজাইয়া আমাদের দূরে সরাইয়া দেয়। তখন হেলিকপ্টার থানার মাঠে নামিলে আর্মির লোকজন লাফাইয়া লাফাইয়া মাঠে পড়িয়া পজিশন নেয়। তারপর হাতের ইশারায় তাহারা আমাদেরকে ডাকে। সি. আই. ওসি সহ আমরা তাহাদের কাছে গেলে তাহারা হেলিকপ্টার হইতে লাশের বাক্স নামাইতে বলে। আমরা হেলিকপ্টার হইতে লাশের বাক্স নীচে নামাই। এস.ডি.পি.ও. সিআই, ওসি ও আর্মির লোকজনসহ আমরা বঙ্গবন্ধুর লাশের বাক্স তাহার বাড়ির গোরস্থানে নিয়া রাখি।

বাক্স খুলিয়া দেখি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ। তখন আর্মির লোকজন 'যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায়' লাশ মাটি দিতে আমাদেরকে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা যাহারা উপস্থিত ছিলাম তাহারা বলি, মুসলমানের লাশ বিনা গোসলে বিনা জানাজায় দাফন করা যায় না। তখন আর্মির লোকেরা গোসল এবং জানাজার জন্য ১০ মিনিট সময় দেয়। তখন আমি রজ্জব আলী সিআই সাহেব পাশেই রেডক্রস হাসপাতালে যাইয়া তিনখানা সাদা শাড়ি কাপড় লইয়া আসি। কাছের দোকান হইতে ৫৭০ দুইটা সাবান লইয়া আসি।

আবদুল মন্নাফ, ইমানুদ্দিন গাজী, নুরুল হক শেখ, কেরামত হাজী এরা বঙ্গবন্ধুকে গোসল দেয়। আমি এবং মৌলভী আব্দুল হালিম কাফনের কাপড় বানাই, গোসল শেষে তাহাদের সহযোগিতায় কাফন পরাই।

তখন বঙ্গবন্ধুর বুকে, পায়ে, হাতেসহ বিভিন্ন জয়গায় অনেক গুলির চিহ্ন ছিল এবং ডান হাতের শাহাদৎ আঙুলটি গুলিতে ছিড়িয়া যায়। তখন তাহার পরনে রক্তমাখা লুঙ্গি পাঞ্জাবী গেঞ্জি ও একটা তোয়ালে একটা কালো ফ্রেমের চশমা ও পাইপ ছিল। বঙ্গবন্ধুর জানাজা পড়ান মৌলভী আবদুল হালিম শেখ, আমরা উপস্থিত লোকজন জানাজায় শরিক হই।

বঙ্গবন্ধুর মা বাবার কবরের পশ্চিম পার্শ্বে তাহাকে কবরস্থ করা হয়।

XX-D. সকল স্টেট ডিফেন্স হইতে জেরা ঃ– ডিক্লাইন্ড।

XX-D. মেজর ফারুক রহমানের পক্ষে জেরা

বঙ্গবন্ধুর মা বাবার কবরের পশ্চিম পাশে তাহাকে কবর দেওয়া হয়।

কবরে নামানোর সময় ২১ বার তোপধ্বনি হয় নাই।

শরীয়ত মতো কাজ করার জন্য মৌলভী পাওয়া গিয়াছে।

পুলিশের সামনেই আমরা দাফনের কাজ করিয়াছি। বঙ্গবন্ধুর পরনের কাপড়-চোপড় আবদুল মান্নান শেখের কাছে আমরা রাখিয়া দেই। চশমা এবং পাইপ চোখে/হাতে ছিল না। দাফনের সময় বাহিরে হাজার হাজার লোক ছিল, আর্মিরা বাহিরের কোনো লোক আসিতে বাধা দেয়। ভিতরে যাহারা ছিল তাহারা জানাজা পড়ে। বাড়ির পাশে বাড়ির এরিয়ার ভিতরে জানাজা হয়।

টুঙ্গিপাড়া পুলিশের কাছে ১৬ই আগস্ট জানিতে পারি বঙ্গবন্ধুর লাশ আসিতেছে। যেখানে জানাজা হয় সেখানে আরো ২ হাজারের মত লোক জানাজায় অংশগ্রহণ করিতে পরিত। তবে সব লোক সংকুলান করা যাইত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সি.আই.ডি-র কাছে জবানবন্দি দিবার সময় চশমা ও পাইপের কথা বলিয়াছি কিনা স্মরণ নাই।

ইহা সত্য নহে যে, বাড়িটি ছোট বিধায় যত লোক আসিয়াছিল সবাইকে সংকুলান করা যাইত না বলিয়া নিরাপত্তার স্বার্থে সকলকে জানাজায় আসিতে দেওয়া হয় নাই।

৬৬.

আমি আবদুল মান্নান।

বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলার বন্ধু। তাঁর সঙ্গে খেলাধুলা করেছি, মাঠেঘাটে ঘুরেছি। টুঙ্গিপাড়া গাঁয়ে একসঙ্গে বড় হয়েছি। তিনি লেখাপড়া করেছেন। আমি বেশিদূর করতে পারিনি। তিনি স্কুলে থাকতেই অনেক কিছু করতেন। কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া করেছেন। বড় নেতা হয়েছেন। দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। আমি গ্রামের সাধারণ মানুষই থেকেছি। সারাদিন কাজ করে ভাতের চিন্তা করেছি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও ৩২ নম্বর রোডে তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। তিনি কাছে বসিয়ে আলাপ করেছেন। গাঁয়ের মানুষের কথা জিজ্ঞেস করতেন। গর্বে আমার বুক ভরে যেতো। ভাবতাম, দেশের এতবড় নেতা হয়েও তিনি গরিবদের ভোলেননি। যখন জিজ্ঞেস করতেন, আব্বাসের আব্বা কেমন আছে রে? এখনো খেজুরের রসের হাঁড়ি নামাতে পারে? তখন তাঁর চোখ বড় হয়ে যেতো, মনে হতো তাঁর চোখের সামনে টুঙ্গিপাড়া ছাড়া আর কিছু নাই। দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর মায়ার শেষ নাই। হায় আল্লাহ, এমন মানুষ কি এই পৃথিবীতে হয়। আমি দুই হাতে চোখের পানি মুছতাম। তিনি আমার পিঠের ওপর হাত রেখে চাপড় দিতেন।

ভাবী সাহেবাকে বলতেন, আমার এই বন্ধুকেতো ভাত খাওয়াতে হবে রেণু।

ভাবী সাহেব হাসতে হাসতে বলতেন, ভাততো খাবেনই মান্নান ভাই। আজ কই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত দিব।

হায় আল্লাহ, এখন এই দুনিয়ায় তাঁরা কেউ নাই। আকাশে হেলিকপ্টারের ভটভট শব্দ হচ্ছে। আমরা চোখ তুলে তাকাই। হেলিকপ্টারের শব্দ আমাদের পরিচিত। তিনি এই গাঁয়ে আগেও হেলিকপ্টারে করে এসেছেন। কিন্তু এমন খবর হয়ে আসেননি, যে খবর শুনে চারদিক থেকে দৌড়ে আসতে থাকে মানুষ। মানুষ।

সকাল থেকেই এর-ওর মুখে মুখে শুনতে পেয়েছি তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছে। আমার রেডিও নাই। আমি নিজে শুনিনি। বিশ্বাসও করতে পারিনি। ওকে কে মারবে? ওকে মারার মানুষ কি এই দেশে আছে? মিছা কথা, এই বলে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরের দিকে আমি নদীর ধারে মাটি কাটছিলাম। দেখি হেলিকপ্টার এগিয়ে আসছে। হেলিকপ্টার এসে থামলো। হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে কয়েকজন সেনা নেমে গ্রামের লোকজনের দিকে রাইফেল তাক করে বললো, কাছে এলে গুলি করা হবে। সবাই দূরে সরে যাও।

হেলিকপ্টার থেকে কাঠের বাক্স নামানো হয়। আমাদের কয়েকজনকে ডেকে বলে, এটা মুজিবের বাড়িতে নিয়ে চলো।

ওদের ধমকে আমরা চারজন লাশের বাক্স কাঁধে তুলে নেই। ওরা আমাদের পিঠের ওপর রাইফেল তাক করে রাখে। আমি মনে মনে আল্লাহকে ডাকি। আর বলি, আল্লাহ এ কেমন গজব নামলো আমাদের টুঙ্গিপাড়ায়? নাকি সারা ঢাকা শহরে এই একই অবস্থা? বুক ফেটে যায়। জীবনে কেমন করে কান্না সমলাতে হয় তাতো কনোদিন শিখিনি। জীবনের এতগুলো বছর কাঁদার সময় কেঁদেছি, হাসার সময় হেসেছি। মানুষের কষ্ট আছে, সুখ আছে। কিন্তু এ কেমন সময় নামলো টুঙ্গিপাড়ায় যে বুকের মধ্যে কান্না ঠেসে রাখতে হয়? আমার পা কাঁপে থরথর করে। আমি নিজেকে আপ্রাণ ধরে রাখার চেষ্টা করি। ভয় হয় হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাই। আল্লাহ আমার সহায় হোন। আমি শক্তি খুঁজে পাই।

লাশ দাফনের শেষে বঙ্গবন্ধুর রক্তমাখা কাপড়গুলো আমার জিম্মায় দেয়া হয়। তার লাশ ঢাকা ছিল বিছানার চাদর দিয়ে। সেইটার সঙ্গে পাই লুঙি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, রুমাল, তোয়ালে, পাইপ, তামাকের কৌটা আর স্যান্ডেল। আমি রক্তমাখা কাপড় ধোয়ার জন্য নদীর ধারে যাই।

কাপড় শুকিয়ে লুকিয়ে রাখি ঘরের চালের কোণায়। রাতে দেখি যে সারা ঘরে লাল পিঁপড়া। চারদিকে পিঁপড়া। হাজার হাজার পিঁপড়া কোথায় থেকে এসেছে আল্লাহ জানে। আমি তো ভয়ে কাঁপি। আমার বিছানায়, রক্তমাখা কাপড় ধোয়ার সময় আমি যে লুঙি পরেছিলাম সেই লুঙিতেও পিঁপড়ায় ভরে গেছে। আমার জীবনে এমন তাজ্জব ঘটনা আমি দেখিনি। রাতের বেলায়ই একটা সাবান জোগাড় করে ঘরের চালা থেকে কাপড়গুলো নামিয়ে কাঁচতে শুরু করি। ধুয়ে-শুকিয়ে লুকিয়ে রাখি। তারপর একদিন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ের কাছে লোক মারফত লন্ডনে পাঠাই।

আমার ছোটবেলার বন্ধু এবং আমার বড় বেলার বঙ্গবন্ধুর জন্য আমি একটা পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছি। রাতে ঘুমাতে পারি না। কত রাতে ঘুম ভেঙে যায় তার কথা মনে করে। রাত জেগে বসে থাকি। আকাশে চাঁদ দেখি। তারা দেখি। রাতজাগা পাখির ডাক শুনি। পায়ের কাছে পিঁপড়া এসে জড়ো হয়। আমি দুই হাতে আমার চোখের পানি মুছি। আর ভাবি, আমি কি দোষ করেছিলাম যে আল্লাহ আমাকে এমন গজবের দিন দিল? তাঁর মরণ কি মেনে নেয়া সহজ কথা? আমি তো জানি বাকী জীবন আমার কাঁদতে কাঁদতে যাবে। আমার চোখের পানি দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বাইগতি নদী হবে। আল্লাহ রে–।

আবদুল মান্নানের মৃদু অথচ তীব্র আর্তনাদ ছড়িয়ে যায় সবখানে। হঠাৎ করে নিজের বুকে হাত রেখে ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকায় আব্বাসের বাবা। পুকুরের ধারে বসে বিষণ্ন আক্কেলের মা কোনো এক অদৃশ্য শব্দ শোনার জন্য কান পাতে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, কে কাঁদে রে? এভাবে নদীর মাঝি মতলুব আলী জোরে জোরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে, বুকটা কেন এমন তড়পায়? যে যেখানে আছে সেখানে সবার বুকের ভেতর যেন কি ঘটে যায়। সবাই আকাশের দিকে তাকায়। চারদিক দেখে। কাছে দাঁড়িয়ে থাকা কারো হাত চেপে ধরে বলে, বুকটা পুড়ে যায় গো! পুড়ে যায়–।

আমি শেখ আবদুল হালিম। টুঙ্গিপাড়া জামে মসজিদের ইমাম।

আমি রেডিওতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার খবর শুনি। হত্যাকারীদের একজন বারবার ঘোষণা দিচ্ছিল সেই খবর। ওইসব খুনীর নাম আমি মনে রাখিনি। আকাশে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনে বাড়ির বাইরে আসি। ভাবলাম হেলিকপ্টারে বোধহয় বঙ্গবন্ধুর লাশ এসেছে। কিছুক্ষণ আগে কবর খোঁড়ার হুকুম এসেছে ঢাকা থেকে। সেই অনুযায়ী কবর খোঁড়া হয়েছে বলে জানি। লাশের কফিন বাক্স নামানোর পরপরই আমি বঙ্গবন্ধুর পৈত্রিক বাড়িতে চলে যাই। আমি জানতাম যদি তাঁর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় দাফন করার জন্য আনা হয় তবে আমাকেতো জানাজা পড়াতে হবে। আমি দায়িত্ব পালন করার চিন্তায় কবরের কাছে আসি। দেখতে পাই তাঁর আব্বা-আম্মার কবরের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছে। কফিনের বাক্সের পেছনে পেছনে মিলিটারি আসে। তারা বলে, কোনো সময় নষ্ট না করে লাশ পুঁতে ফেলো। যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় মাটি চাপা দিতে হবে।

আমি জিজ্ঞেস করি, কার লাশ পুঁতে ফেলতে হবে?

তারা রেগে ওঠে। ধমকের স্বরে বলে, কার লাশ আছে তা আপনাদের জানার দরকার নাই। আমরা যে হুকুম দিয়েছি তাই করুন। বেশি কথা বলবেন না।

আমি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দেশের এত বড় নেতাকে মেরে তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আমাদেরকে আর কি করবে? যা করার করুক। এই খুনিদের কথা শুনলে আল্লাহর কাছে মাফ পাবো না। গুনাহগার বান্দা হয়ে মরতে হবে আমাকে।

ততোক্ষণে তারা ওয়ারলেসে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একই ধমক, তোমরা তাড়াতাড়ি করো। আমাদের এক্ষুণি ঢাকা যেতে হবে। আমরা এখানে দেরি করতে পারবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ওদের কথা আমি শুনি না। অনড় হয়ে বলি, বাক্সে কার লাশ আছে?

ওরা রাগে গোঁ-গোঁ করে বলে, শেখ মুজিবের।

তিনি তো মুসলমান?

হ্যাঁ, মুসলমান।

মুসলমানের লাশ দাফন করার ধর্মীয় বিধান আছে।

আপনি বেশি কথা বলছেন।

আমি এভাবে লাশ দাফন হতে দেবো না। লাশের গোসল দিতে হবে, কাফনের কাপড় পরাতে হবে, জানাজা পড়তে হবে।

আপনি বেশি বাড়াবাড়ি করছেন।

গোসল-ফোসল হবে না। জানাজা-টানাজাও না।

এসব ছাড়া মুসলমানের লাশ দাফন হবে না।

দেখতে পাই সেনা-সদস্যরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তখন আমি আবার জিজ্ঞেস করি, বঙ্গবন্ধু কি শহীদ হয়েছেন? একমাত্র শহীদের লাশ এভাবে সমাহিত হয়।

ওরা চুপ করে থাকে। আমি গলা উঁচিয়ে বলি, মুসলমানের লাশ গোসল, জানাজা ছাড়া দাফন হতে দেবো না। আমরা বেঁচে থাকতে হবে না।

ওরা রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে আবার ওয়ারলেসে কথা বলে। তারপর বলে, আপনাদেরকে দশ মিনিট সময় দিলাম। তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

আমি আবদুল হাই শেখ।

পঁচাত্তর সালে আমি টুঙ্গিপাড়ায় ছিলাম। সায়রা খাতুন রেডক্রস হাসপতালের ওয়ার্ড বয় ছিলাম। মিলিটারি গোসল আর জানাজার জন্য সময় দিলে আমরা রেডক্রস হাসপাতাল থেকে তিনটা পাড়সহ সাদা শাড়ি নিয়ে আসি। সঙ্গে দুটি ৫৭০ কাপড় কাঁচা সাবান। বালতিভরে পুকুরের পানি নিয়ে আসি। পানি গরম করার সময় নাই। শাড়িগুলো পাড় ছিঁড়ে কাফনের কাপড় বানানো হয়। সব কাজ শেষ হলে মৌলভী সাহেব জানাজা পড়ান।

জানাজায় বেশি লোককে আসতে দেয়া হয় না। রাইফেল তাক করে তাদেরকে সরানো হয়। লোকেরা দূরে দাঁড়িয়েছিল। জানাজা শেষে তাড়াহুড়ো করে লাশ কবরে নামানো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৭.

আমি আপনার ডান হাতের তর্জনি বঙ্গবন্ধু।

যাঁরা আপনার মরদেহ দেখেছেন তাঁরা সবাই জানেন খুনীরা আপনার ডান হাতের শাহাদাৎ আঙুলটি উড়িয়ে দিয়েছিল। আবদুল হাই শেখ তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন, আপনার ডান হাতের শাহাদাৎ আঙুলটি গুলিতে ছিঁড়ে যায়। আমি তো জানি বঙ্গবন্ধু আপনার তর্জনির উপর ওদের রাগ ছিল। সীমাহীন ক্রোধ যাকে বলে।

এই নিয়ে আমার কোনো কষ্ট নাই বঙ্গবন্ধু। ঘাতকদের লক্ষ্য তো ওই আঙুলের দিকে থাকবেই। একাত্তরের ৭ মার্চে রমনা রেসকোর্স ময়দানে আপনি তর্জনি উঁচিয়ে এক অসাধারণ ভাষণ দিয়েছিলেন। শেষ করেছিলেন এই বলে, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

আমি ধন্য। রমনা রেসকোর্স ভর্তি বাঙালির সামনে আপনি আমাকে আকাশের দিকে উঁচু করে রেখেছিলেন। ৭ মার্চের পড়ন্ত বিকেলে সেদিন আপনার তর্জনিকে অভিবাদন জানিয়ে নত হয়ে এসেছিল আকাশ। সেদিন এক অবিশ্বাস্য বিকেল ছিল ঢাকা রেসকোর্সের উপরে।

না, আমি ভুল বলেছি বঙ্গবন্ধু। সেদিন শুধু রমনা রেসকোর্সের উপরে নয়, আপনার তর্জনি উঁচু হয়েছিল সাড়ে সাত কোটি বাঙালির সামনে। সারা দেশে। দেশজুড়ে। ওই তর্জনি স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

পতাকার মতো উড়েছিল। জাতীয় সঙ্গীতের মতো বেজেছিল।

জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গবন্ধু আজ আমার গর্ব হচ্ছে এই ভেবে যে আমি আপনার সাধারণ তর্জনি নই।

ঘাতকের নিশানা আমাকেও তাক করেছিল।

আমি আপনার শরীরে নেই তো কি হয়েছে, এ দেশের মাটিতে আছি। বঙ্গবন্ধু আমি আপনার সঙ্গেই আছি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য তৈরি হয়ে ওঠা আপনার এই তর্জনি গুলির আঘাতে যে ছিন্ন করা যায় না তা এ দেশের মানুষ জানে।

৬৮.

টুঙ্গিপাড়ার আকাশে নেমে আসে আশ্চর্য বিকেল। চারদিক শান্ত। সমাহিত। কবরস্থানের চারপাশে, কাছে বা দূরের মাঠে যারা বসে আছে তারা নিশ্চুপ। স্তব্ধ। মুখে কথা নেই। বুকে শোকের মাতম নেই। যেন এই স্থির সময়কে আবার প্রাণমুখর করে তুলতে তাদের বুকের ভেতরে প্রতিজ্ঞার বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে। এই সময় একটি অবিনাশী সময় হবে বলে প্রকৃতিতে তোলপাড় শুরু হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন রবীন্দ্রনাথ।

ডাকেন, প্রিয় মুজিব।

কবিগুরু আপনি? কোথায় বসতে দেই আপনাকে?

গোটা বাংলাদেশ তোমার সামনে। বসার জায়গারতো অভাব নেই। আমি এখন এখানে বসছি। তোমার পাশে। এই টুঙ্গিপাড়ায়।

কবিগুরু পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে আমি আমার দেশবাসীকে নিয়ে গর্ব করেছিলাম। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা অমিত সাহসী বাঙালিকে নিয়ে গর্ব করেছিলাম। বলেছিলাম, কবিগুরু দেখে যান আপনার বাঙালি মানুষ হয়েছে। আপনি আর বলতে পারবেন না যে, 'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী / রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।'

রবীন্দ্রনাথের হাসির মৃদু শব্দ ভেসে যায় মধুমতীর ওপর দিয়ে পদ্মায় কিংবা শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুরে। ভেসে যায় বাংলাদেশের সবখানে। তিনি মৃদু কণ্ঠে বলেন, আমি তোমার কথা মানছি মুজিব। তুমি বাঙালির পরিচয়কে সবচেয়ে গভীর করেছ। বাঙালি একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছে।

এবার বঙ্গবন্ধুর হাসি ভেসে যায় বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে পৃথিবীর সব মহাদেশে। সব সমুদ্র, সব নদী বয়ে নিয়ে যায় হাসির শব্দ।

প্রিয় মুজিব।

আমি জেগে আছি কবিগুরু।

আমি তোমাকে বলতে চাই, মৃত্যু কোনও সূত্রকে ছিন্ন করবার জন্য নয়, সূর্য, বায়ু, জল প্রভৃতি অন্যান্য শক্তির মতো সেও বাহন।'

আমি আপনার কথা বুঝেছি কবিগুরু।

তুমি মনে রেখো, 'এ সংসারে প্রাণচাঞ্চল্যের যে পঞ্চায়েত বসেছে মৃত্যুও সেই পঞ্চায়েতের একজন। মৃত্যু তার বিরুদ্ধে নয়।'

কবিগুরু আপনার কথা আমি মানি। আপনার কি মনে আছে পাকিস্তান সরকার আপনার গান প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল রেডিওতে?

হ্যাঁ আছে।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কারণে বন্দি আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত সভায় আমি বলেছিলাম, আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইব। রবীন্দ্রনাথের বই পড়ব।

আমি জানি মুজিব। আমার রচিত গান তুমি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছ। সেজন্য তোমাকে এই কথাই আমি বলতে এসেছি যে, 'বিপুল বিশ্বসংসারে বিস্তৃত করে মৃত্যুকে দেখলে বুঝি সে অবসান নয়। ....বিপুল বিশ্বসংসারের দিকে যখন তাকাই তখন দেখি তার জ্যোতি কোথাও ম্লান নয়।' প্রিয় মুজিব, আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে তোমার মৃত্যু বাংলাদেশের মানুষের সামনে জ্যোতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই জ্যোতি ওদেরকে পথ দেখাবে।

আপনার কথায় আমার বুক ভরে গেছে কবিগুরু।

আজ আমি তোমাকে আমার ভালোবাসা জানাতে এসেছি মুজিব। শান্তিনিকেতনের সবখানে ফুটে থাকা সব ফুল নিয়ে এসেছি তোমার জন্য।

আমি ধন্য কবিগুরু। আমি আপনার লেখা সেই অমর বাণীটি মান্য করি। আপনি আপনার শেষ লেখায় লিখেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।' মানুষই আমার কাছে প্রকৃত সত্য। মানুষই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের মৃদু হাসি বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে উড়ে যায় পৃথিবীর অন্য মহাদেশে।

ভিন্ন মহাদেশ থেকে উড়ে আসে অঁদ্রে মালরোর কণ্ঠস্বর। তিনি বলছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কোনো একনায়ক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। স্ট্যালিন, হিটলার বা মাও-সে-তুঙ এমন অর্জন ঘটাতে পারেননি। পেরেছেন গান্ধী আর শেখ মুজিবুর রহমান।

পৃথিবীর আর একটি মহাদেশের গায়িকার কণ্ঠ থেকে ভেসে আসছে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় গানের পংক্তি :

Love isn't love till you give it away
Love isn't love till it's free
The love in your heart
Wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away

You might think love is a treasure to keep
Feeling to cherish and hold
But love is a treasure for people to share
You keep it by letting it go

Love isn't love till you give it away
Love isn't love till it's free
The love in your heart
Wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away

Cause love can't survive
When it's hidden inside
And love was meant to be shared

Love isn't love till you give it away

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Love isn't love till it's free
The love in your heart
Wasn't put there to stay
Oh love isn't love till you give it away.

বঙ্গবন্ধুর ডায়রির পৃষ্ঠা থেকে তাঁর প্রিয় গান ছড়াতে থাকে টুঙ্গিপাড়ায়। পেরিয়ে যায় টুঙ্গিপাড়ার আকাশ। শিল্পী রেবা ম্যাকনটারের কণ্ঠস্বর নিয়ে যায় ভালোবাসার বাণী - বাট লাভ ইজ আ ট্রেজার ফর পিপল টু শেয়ার / ইউ কিপ ইট বাই লেটিং ইট গো।

গান এখন টুঙ্গিপাড়ার বাতাস ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে।

উড়ে আসে ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টের কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধুর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যখন দেখলেন পাকিস্তান কারাগারে আপনার কবর খোঁড়া হচ্ছে তখন আপনার কার কথা মনে হয়েছে? দেশের কথা না আপনার স্ত্রী-সন্তান-পরিজনের কথা?

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি প্রথমে আমার দেশের কথা ভেবেছিলাম। আমার প্রিয়জনদের চেয়েও আমার ভালোবাসা দেশের জন্য বেশি। আপনি তো দেখেছেন দেশের মানুষ আমাকে কত গভীরভাবে ভালোবাসে।

ডেভিড ফ্রস্ট বললেন, হ্যাঁ, বিষয়টি আমি দেখেছি। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত দেশবাসীর নেতা ছিলেন আপনি। আপনার প্রথম চিন্তা অবশ্যই দেশের জন্য। তারপর প্রিয়জনের চিন্তা।

বঙ্গবন্ধু উজ্জীবিত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, মানুষের প্রতিই আমার প্রথম ভালোবাসা। আমি তো জানি আমি অমর নই। আজ কিংবা কাল, কিংবা পরশু আমাকে মরে যেতে হবে। মানুষকে মৃত্যুবরণ করতেই হয়। সেজন্য আমার বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যু বরণ করবে সাহসের সঙ্গে।

হাজার হাজার মানুষ দেখতে পায় পটভূমিতে চিত্রিত হয়ে থাকে মানুষের জন্য ভালোবাসার অবিনাশী বাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্যসূত্র

১। Additional Paper Books of
Death Reference
No. 30 of 1998.
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
In The Supreme Court of Bangladesh
আপীল বিভাগ
(Appellate Division)

২। অসমাপ্ত আত্মজীবনী
শেখ মুজিবুর রহমান
দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
প্রকাশকাল ২০১২

৩। বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ বছরের দৈনন্দিন কর্মতালিকা ও কতিপয় দলিল
শাহরিয়ার ইকবাল
উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী উত্তরা
প্রকাশকাল ২০০০

৪। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫
সম্পাদনায় - শেখ হাসিনা এবং বেবী মওদুদ
প্রকাশক - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
ষষ্ঠ সংস্করণ: ৩১ জুলাই ২০১১

৫। বাঙালির তীর্থভূমি
রশিদ হায়দার
আগামী প্রকাশনী
প্রকাশকাল ১৯৯৯

৬। জনসমুদ্রে এক মহামানব
শেখ রেহানা
প্রকাশক - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
ফেব্রুয়ারি ২০১১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭। প্রথম আলো
১৫ আগস্ট নিহতদের লাশের অবস্থা ও দাফন
এক সামরিক কর্মকর্তার প্রতিবেদন
১৫ আগস্ট ২০০৩
৮। শেখ হাসিনা রচনা সমগ্র ১
মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০
৯। সেই অন্ধকার
সম্পাদনা - ম. হামিদ
প্রকাশক - মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭
১০। শেখ রাসেল
শেখ রেহানা, শেখ হাসিনা
প্রকাশক - জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
ফেব্রুয়ারি ২০১২
১১। বিজয় দিবসের পর বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ
আবদুল মতিন
প্রকাশক - র‍্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন - ঢাকা
সেপ্টেম্বর ২০০৯
১২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি
সম্পাদক - মোনায়েম সরকার
বাংলা একাডেমী
ফেব্রুয়ারি ২০০৮
১৩। শেখ মুজিব : বাংলাদেশের আরেক নাম
আতিউর রহমান
প্রকাশক - দীপ্তি প্রকাশনী
ফেব্রুয়ারি ২০০৯
১৪। ইউ. কে. চিং বীর বিক্রম
কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীর প্রতীক
প্রকাশক - শুধুই মুক্তিযুদ্ধ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
১৫। জাতির জনক তাঁর সারা জীবন
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
জুন ২০১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিনা হোসেন

১৬। বুলেটিন
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
ডিসেম্বর ২০০৯

১৭। দৈনিক সমকাল, ১৫ আগস্ট ২০০৬

১৮। প্রথম আলো, ৩ এপ্রিল ২০০৯

১৯। প্রথম আলো, ২৫ ডিসেম্বর ২০০৯

২০। প্রথম আলো, ১৫ আগস্ট ২০১২

২১। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ চৈত্র ১৪১১

২২। স্মরণে বঙ্গবন্ধু
ফারুক চৌধুরী
প্রকাশক - মাওলা ব্রাদার্স
এপ্রিল ২০০৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~